প্রসঙ্গ ঃ প্রবাদ, চাণক্য শ্লোক, খনার বচন, কবিরের দোহাঁ ও মীরার পদাবলী ঃ

"কথা কও কথা কও,
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে' কেন বসে চেয়ে রও ?
কথা কও কথা কও।"

আজকের মানুষ আবার নতুন করে পুরাতনকে আহ্বান জানাচ্ছে। সেই প্রাচীন যুগের ভাবনা চিন্তা আজ আবার নতুন করে আজকের অত্যাধুনিক মানব মনকে আন্দোলিত করেছে, আহ্লাদিত করেছে। পুরাতন বৎসরের জীর্ণপাতাগুলি আবার নবীনের নব হস্তাবলেপনে সবুজ ও সতেজ হয়ে উঠেছে। তাই আধুনিক পৃথিবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতাভিমানী—মানুষ পুরাতনকে আবার নতুন করে জানতে চাইছে। T. S. Eliot বলেছেন "Pastness of the Past" অতীত অধ্যায়গুলি সভ্যতার অগ্রগতিতে এক উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছে। তাই শত সহস্র বর্ষের কীটদষ্ট **রামায়ণ** আজ আধুনিক দূরদর্শনের জনপ্রিয়তার একমাত্র অবলম্বন। **"মহাভারতের"** কথা তাই আজও অমৃত সমান। তাই আজও মানুষ বিশ্বাস করে যাহা নাই মহাভারতে তাহা নাই ভারতে। হাজার হাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতার পীঠস্থান গুপ্তযুগে খনার বচন বা চাণক্য শ্লোকের ন্যায় যে সকল আপ্তবাক্য সৃষ্টি হয়েছে তা আজও অম্লান ও অপরিম্লান।

চাণক্য চরিত্র ভারতীয় সাহিত্যে, নাটকে বহু আলোচিত, বহু সমালোচিত।

চাণক্য পণ্ডিত, অভিমানী, কুটবুদ্ধিপরায়ণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ এবং প্রতিজ্ঞায় ও প্রতিহিংসায় অটল ও অবিচল। তাই চাণক্য শ্লোক আজও আমাদের জীবনের চলার পথে এক পাথেয়।

গুপ্তযুগে ভারতীয় সভ্যতা তার চরম উৎকর্ষতায় মণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অজন্তা, ইলোরার গুহাচিত্র ও ভাস্কর্য ছাড়াও গুপ্তযুগে সাহিত্য, শিল্প, জ্যোতিষ চর্চা এক নব দিগন্তের ইশারা পায়। খনার

বচনগুলি তো আমাদের বাঙ্গালী তথা ভারতীয় জীবনকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে।

খনার বচনগুলি—আজকে আবহাওয়া বিজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে সমাজবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি সকল দুরূহ বিষয়ের ইঙ্গিতবাহী। সব থেকে মজার কথা হাজার হাজার বছর পরেও খনাকথিত বচন আজও অভ্রান্ত। মানব জীবন অনন্তকাল ধরে সম্ভবতঃ মৌলিক ভাবে এক ও অপরিবর্তনীয়। তাই মৌর্য যুগে যা সত্য, গুপ্তযুগেও তা অভ্রান্ত। আবার আজকের দিনেও গ্রহান্তরগামী মানুষের নিকটও তা অবিচল ও অবিসংবাদিত ভাবে ধ্রুব-সত্য। দুর্জ্ঞেয় মানবমন সর্বকালে ও সর্বযুগে এক মহাবিস্ময়। তাই সর্বযুগে সর্বকালে—পণ্ডিতজন নানা ভাবে ছড়ায়, শ্লোকে, বচন ও প্রবাদ প্রবচনে জীবনের চরম সত্য চরম নিত্যকে সহজ ভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাই **কবিরের-দোহাঁ, মীরার পদাবলী** এ সকলই **চাণক্য শ্লোকের ন্যায়, খনার বচনের মত, প্রবাদ ও প্রবচনের মত** আজও ভাগ্যতাড়িত, ব্যথা জর্জর জড়া, ব্যাধি ও মৃত্যু তাড়িত মানব মনকে জীবনের চরম সত্য জ্ঞাপন করেছে।

তাই স্তব্ধ অতীতের নিদ্রাভঙ্গ করে মাঝে মাঝে চাণক্য শ্লোক, খনার বচন, কবিরের দোহাঁ, মীরার পদাবলীর পদধ্বনি আমাদের আজও সচকিত করে, চমৎকৃত করে।

তুষার কান্তি পাণ্ডে

ভূমিকা

গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে বসে. জানিনা কেন, আলিপুর চিড়িয়াখানার সৌন্দর্য 'সুন্দর' নামে বাঘটা মরে গেলে রসিক এক সাংবাদিক অনেক দুঃখে যা বলেছিলেন, আজ তা মনে হচ্ছে—'হ্যাঁ সুন্দর তাই মরে গেল। কারণ যা কিছু প্রকৃত সুন্দর, সবই এখন আমাদের চোখে দৃষ্টি কটু। শিব সুন্দরের মান নেই এখানে। আমাদের সেই সুন্দর আচার-ব্যবহার পোশাক-আশাক, ঐতিহ্য সংস্কৃতি, কাব্য-সাহিত্য—সবকিছু এখন

ডাষ্টবিনের তলায়। আমরা এখন নির্লজ্জ ভঙ্গীতে গলা ফাটিয়ে অশ্লীল **বিদ্যাসুন্দর** পালা গাইছি।'

সমাজের দিকে দিকে আজ অবক্ষয়, মানুষ হারিয়েছে আস্তিক্য **বোধ,** **সত্য**-শৌচ-দয়া-মায়া-তিতিক্ষার আদর্শ কাঁদছে নীরবে। এ হেন ক্লান্তিক্ষণে এই **গ্রন্থের** আত্মপ্রকাশ এ আশা নিয়ে—

জীবনের দীপে
আলোকের আশীর্বচন
আঁধারের অচৈতন্যে
সঞ্চিত করুক জাগরণ।'

ছিল একদিন, যখন **প্রবাদ** ঘুরে ফিরত লোকের মুখে মুখে। চলার পথে সেগুলি আলো দেখাত।

'খনার বচন' মূলতঃ গণনামূলক। বিংশ শতাব্দীর অন্তিম দশকে **কম্পিউটার** ঘেরা মানুষ যখন গ্রহান্তরে পাড়ি দিচ্ছে তখন **'খনার বচন'কে** কুসংস্কার আর প্রলাপ বলে দূরে ঠেলে দেওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু চাষ-বাসের ক্ষেত্রে খনার গণনা আজকের দিনেও অভ্রান্তরূপে কার্যকরী হতে দেখা গেছে। **খনার বচন** অনুসারে কাজ করলে কৃষকের মুখে হাসি ফুটবে, কুটীর তার ভরে উঠবে সোনালী ফসলে।

এ গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হলো **তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়** সংকলিত ও অনূদিত **'চাণক্য শ্লোক'**। বহু প্রচারিত ও প্রসারিত **চাণক্য** শ্লোকগুলি সংখ্যায় অপ্রতুল্য এবং এগুলির অনুবাদও মূলানুগ নয়। আমাদের এই গ্রন্থে সংকলিত **চাণক্য** শ্লোকের স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য পাঠক-পাঠিকার চোখে সহজেই ধরা পড়বে।

সুখ-সৌন্দর্যের চিত্রলেখা বর্ণোজ্জ্বল অতীতে **পিতৃ-পিতামহের** কণ্ঠে **'চাণক্য শ্লোক'** ধ্বনিত হতো। শ্লোকগুলি অনুসৃত হলে জীবন যে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে—অতিরঞ্জনের আশঙ্কা না করেই এমন মন্তব্য করা চলে।

অর্থশাস্ত্র চাণক্যের রচনা কিনা এ নিয়ে সম্প্রতি মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। 'অনেকেই এখন মনে করছেন অর্থশাস্ত্র **চাণক্যের** অনেক পরে

রচিত। এটি **কৌটিল্যের** সম্পাদিত। ...অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই **এখনও** পড়ানো হয় যে অর্থশাস্ত্র **চাণক্যের** লেখা এবং **চাণক্য** যেহেতু **মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের** মন্ত্রী ছিলেন সেই কারণে অর্থশাস্ত্রে **মৌর্যযুগের** প্রভাব রয়েছে। কিন্তু একথা ঠিক নয়। **অর্থশাস্ত্র ১৫০** খ্রিস্টাব্দে রচিত। এটির **সম্পাদনা করেছেন কৌটিল্য**। আর **চাণক্য** ছিলেন ৪০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের মানুষ।'

পরিশেষে সংকলিত হলো '**মীরার পদাবলী**'। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে পরমজ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ **স্বামীভূমানন্দ পরমহংস** এগুলি সংগ্রহ করে অনুবাদ করেছিলেন। গানগুলিতে **ঈশ্বরের** কাছে আত্মসমর্পণের সুর স্পন্দিত হয়েছে।

আশা করি এ **গ্রন্থটি** অপরিমেয় সদিচ্ছা সম্মিলিত হয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকার কাছে আদৃত হবে। এই গ্রন্থ রচনায় ও সম্পাদনায় **তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের** ঋণ অপরিশোধ্য।

এছাড়া আনুসঙ্গিক কাজে সহায়তা করেছেন অসিত সরকার, ভক্তিভূষণ সরকার ও শুভংকর ভট্টাচার্য।

তু. কা. পা.
ত. ব.

বিদ্বত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে॥

সূচীপত্র

মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৩০

: সংকলক মণ্ডলী :

তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষ কান্তি চক্রবর্ত্তী

অর্ঘ্য দাশ

স্বামী ভুমানন্দ পরমহংস
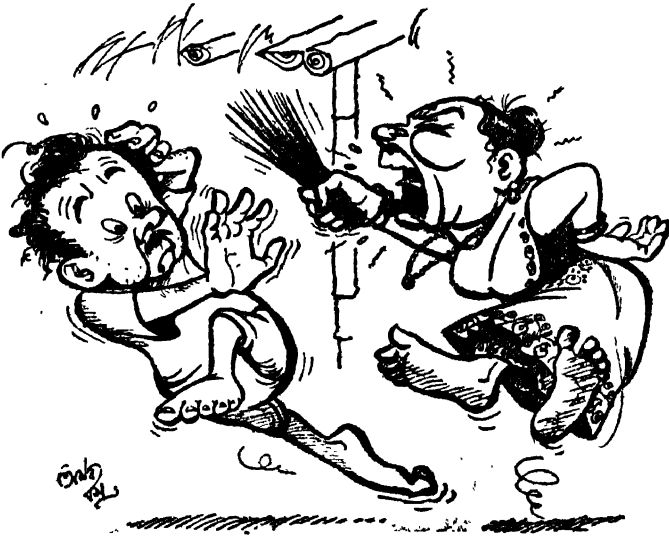
যার ঘরে স্ত্রী সবসময় অপ্রিয় কথা বলে তার বনেই যাওয়া উচিত। বরং বনেই সে একটু শান্তিতে থাকতে পারে।···ভার্য্যা চা প্রিয়বাদিনী। অরণ্য তেন গন্তব্যং···

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশানে চ য তিষ্ঠতি স বান্ধব

দুষ্ট লোক মিষ্ট কথা বললেও তাকে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়। 'দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্বিশ্বাসকারণম। মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম।'

বাংলা প্রবাদ প্রবচন

অতিরঞ্জনের আশংকা না করেই বলা চলে বাংলা প্রবাদ-প্রবচনগুলি সমাজ-সচেতনতা ও জীবন-রসরসিকতার অমৃত নির্ঝর। বাংলার লোকজীবন ও লোক-সংস্কৃতির মধ্যে প্রবাদ-প্রবচনগুলি ছড়িয়ে আছে। সাধারণ মানুষের বহুদর্শিতা থেকে এগুলি সৃষ্ট হয়েছে।

প্রবাদ-প্রবচনগুলি বেশির ভাগই মেয়েলি এবং মুখে মুখে ঘুরে ফেরে আর তাই বিবর্তনের ধারায় এগুলির মূল বা আদিমরূপ অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে।

তৎকালীন গ্রামীণ জীবনে, বিশেষ করে নারী-সমাজেই বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রবাদ-প্রবচনগুলি ব্যবহৃত হতো। আজও গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে এগুলি সমধিক প্রচলিত। অভিজাত শিক্ষিত পরিবারে প্রবাদ-প্রবচনের প্রকাশ খুব একটা বেশি দেখা যায় না—আর তাই দিনের পর দিন এগুলি হারিয়ে যাচ্ছে।

প্রবাদ-প্রবচনগুলিতে বিগত দিনের জীবন, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, বাস্তব-প্রীতি ও সমাজ-জীবনের সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। উইলিয়াম মর্টন, রেভারেন্ড জেমস্ লঙ এবং সুশীল কুমার দে বাংলার প্রবাদ-প্রবচনগুলি সম্বন্ধে সংগ্রহ করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন লেখকেরা এগুলিকে তাঁদের সাহিত্যে প্রয়োগ করেছেন। প্রবাদ-প্রবচনের ভাণ্ডারে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর ও পাবনা অঞ্চলের অবদান সবচেয়ে বেশি।

রবীন্দ্রনাথ ছেলে ভুলানো ছড়ার কথা বলতে গিয়ে বাংলা ছড়ার যথেষ্ট প্রশংসা করে গেছেন। বাংলা ছড়া বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের একটি অংশবিশেষ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য 'খনার বচন' বলে যে-সব বাক্য বা ছড়া প্রচলিত আছে সেগুলি প্রবাদের অনুরূপ, কিন্তু সবগুলি প্রবাদ বলে গণ্য হয়ে ওঠেনি।

পরিশেষে বলি, প্রবাদ-প্রবচনমালার মধ্যে একটি অক্ষয় রস ও গভীর তত্ত্ব লুকিয়ে আছে আর তাই এগুলি এখনও আমাদের মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

* অ *

১। অলক্ষ্মীর নিদ্রা বেশি, কাঙালের ক্ষুধা বেশি।

২। অল্প আগুনে শীত হরে, বেশি আগুনে পুড়িয়ে মারে।

৩। অল্প জলের তিত পুঁটি, তার এত ছট্‌ফটি।

৪। অল্প জলের মাছ।

৫। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

৬। অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর।

৭। অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ।

[কহেন ধর্মের সুত অশ্বত্থামা হইল হত ইতি গজ বলে শেষে—'কাশীরামদাস'।]

৮। অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।

৯। অস্থানে তুলসী, অপাত্রে রূপসী।

১০। অকাল কুষ্মাণ্ড।

[আমি কাল পত্র করেছি। সে পত্র ভেঙ্গে এই অকাল কুষ্মাণ্ডকে মেয়ে দেব।—গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান'।]

১১। অকালে খেয়েছ কচু, মনে রেখ কিছু কিছু।

১২। অকালের বাদলা।

১৩। অকুল পাথারে ভাসা।

১৪। অকুলে কুল পাওয়া।

১৫। অগস্ত্য যাত্রা।

[যে যাবে সে যাবে, হবে অগস্ত্য-গমন প্রায়—'রামবসু কবিওয়ালা'।]

১৬। অগুরু চন্দন ফেলে চায় শেওড়া কাঠ।
কোকিলের ধ্বনি ফেলে বানরের নাট॥

১৭। অগ্নি, ব্যাধি, ঋণ, তিনের রেখো না চিন্।

১৮। অঘটন ঘটায় বিধি।

১৯। অচেনা পথ আর জঙ্গল সমান।
অজানা জল আর জানা শ্মশান॥

(এগুলো হল ভয়ের কারণ।)

২০। অতি আশ সর্বনাশ। [অতি উচ্চ আশা সর্বনাশের কারণ।]

২১। অতি ক্ষুধা যার, হাড় কাঁটা তার।

২২। অতি চতুরের ভাত নেই, অতি সুন্দরীর ভাতার নেই।

২৩। অতি চালাকের গলায় দড়ি।
অতি বোকার পায়ে বেড়ি।

২৪। অতি দর্পে হত লঙ্কা।

[ভাল নয় অতিশয়। বৃদ্ধি হলেই পড়তে হয়। অতিশয় দর্পে রাবণ মলো—'দাশু রায়']

২৫। অতি পীরিত যেখানে, অতি বিচ্ছেদ সেখানে।

২৬। অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।

২৭। অতি বাড় বেড়ো না, ঝড়েতে উড়াবে।
অতি নিচু হয়ো না, ছাগলে মুড়াবে।

২৮ অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

২৯। অতি মন্থনে বিষ ওঠে। লেবু চটকালে তিতা হয়।

৩০। অতি মেঘে অনাবৃষ্টি।

৩১। অতি সাধ অতি বিষাদ।

৩২। অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বল।

৩৩। অধিক খেতে করে আশা, তার নাম বুদ্ধিনাশা।

৩৪। অনুরাগ বিনে গৌর আসবে কেনে।

৩৫। অনেক গর্জনে ফোঁটা বৃষ্টি।

৩৬। অনেক গভীর জলের মাছ।

৩৭। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

৩৮। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া।

[আমাকে অন্ধকারে ঢেলা মারিয়া বেড়াইতে হইবে—'আলালের ঘরের দুলাল'।]

৩৯। অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন।

[অন্ধের দিনরাত্রি নাই, ও তো কিছুই বুঝিতে পারিবে না, সুতরাং ওকে অবিশ্বাস নাই।—'দুর্গেশনন্দিনী'।]

৪০। অন্ধের নড়ি, কৃপণের কড়ি।

[বাছা, তোমার জননীর তুমি অন্ধের নড়ি।—'নবীন তপস্বিনী']

৪১। অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।

৪২। অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি।

৪৩। অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে।

['ভারতচন্দ্র']

৪৪। অন্ন বিনা ছন্নছাড়া।

৪৫। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

৪৬। অবাক করিল পাপে ভরা।

৪৭। অভাগা চোর যে বাড়ি যায়,
হয় কুকুর ডাকে নয় রাত পোহায়।

৪৮। অভাবে স্বভাব নষ্ট,
মুখ নষ্ট বরণে।
ঝরায় ক্ষেত নষ্ট,
স্ত্রী নষ্ট মারণে॥

৪৯। অভেদাত্মা হরিহর।

৫০। অমাবস্যার চাঁদ।

৫১। অমৃতে অরুচি।

৫২। অম্বল কম্বল, ডম্বল তিন শীতের সম্বল।

৫৩। অরণ্যে রোদন।

[অরণ্যে রোদন কিবা ফল—'ভারতচন্দ্র'।]

৫৪। অর্থই অনর্থ।

৫৫। অর্ধ চন্দ্র।

[আদর সুরু লাঠি জুতায় শেষে অর্ধ চন্দ্র—'দ্বিজেন্দ্র রায়'।]

৫৬। অরুচির অম্বল,
শীতের কম্বল।
বর্ষার ছাতি,
ভট্‌চাযার পাঁতি।

* আ *

৫৭। আউশেও যা পৌষেও তা।

৫৮। আকন্দে যদি মধু পাই, তবে কেন পর্বতে যাই।

৫৯। আকালে কি না খায়, বিবাদে কি না যায়।

৬০। আকাশ কুসুম।

[যদি পরমেশ্বরের কিছুমাত্র বিষয়জ্ঞান থাকতো, তা হলে সাধ করে ঘোড়ার ডিম ও আকাশ কুসুমের দলে গণ্য হতেন না।—'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'।]

৬১। আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া।

৬২। আকাশে ধুলো ছোঁড়ে, আপন চোখে এসে পড়ে।

৬৩। আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরা।

[তিনি আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে দিতে পারেন, হয়কে নয় করেন, নয়কে হয় করেন—হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা।]

৬৪। আকাশে যত ঝড় ওঠে, গোয়ালে তত গরু ছোটে।

৬৫। আখ আর সরষে, না পিষলে রস কিসে।

৬৬। আগাছার বড় বাড়।

৬৭। আগুন নিয়ে খেলা।

৬৮। আগুনে ঘি ঢালা।

৬৯। আগুনের ফুলকি।
যার চালে পড়বে তার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে।

৭০। আগুনে হাত দিলে।
ইচ্ছাতেও পোড়ে, অনিচ্ছাতেও পোড়ে।

৭১। আজের কাজী, পরে হাজী, পরে গাজী।

৭২। আগে ফাঁসি, পরে বিচার।
[ফাঁসির পর বিচার]

৭৩। আগে যায়, পরে যায়।

৭৪। আগে রামনাম, পাছে সব কাম।

৭৫। আগে সামলা ধাক্কা, পরে যাবি মক্কা।

৭৬। আঙুল ফুলে কলা গাছ।

[তাহারা কি ছিলেন, এখন বা কি হইয়াছেন, এ আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে -'কেরীর কথোপকথন'।]

৭৭। আচার ভ্রষ্ট, সদা কষ্ট।

৭৮। আচারে লক্ষ্মী, বিচারে পণ্ডিত।

৭৯। আছে কাজ, তো সকাল-সকাল সাজ।

৮০। আছে যথেষ্ট, নেই অদৃষ্ট।

৮১। আজ আমীর, কাল ফকির।

৮২। আজ নগদ, কাল ধার।

৮৩। আজ বুঝলি না, বুঝবি কাল,
পোঁদ চাপড়াবি, পাড়বি গাল।

৮৪। আজ মুচি কাল শুচি।

৮৫। আজ রাজা, কাল ভিখারী, ফুটানি করে দিন দুচারি।

৮৬। আটঘাট বাঁধা।

৮৭। আটা পেষা করা।

৮৮। আঠার মাসে বছর।

৮৯। আড় নয়নে বাঁকা ভুরু, সে জন হয় নাটের গুরু।

৯০। আড়াই দিনের বাদশাহী।

৯১। আতি চোর, পাতি চোর, হতে হাতে সিঁদেল চোর।

৯২। আঁতুড় আগলানো।

৯৩। আতুরে নিয়ম নাস্তি।

৯৪। আদরে আদরে বাঁদর।

৯৫। আদা আনতে মুড়ি ফুরোয়।

৯৬। আদা জল খেয়ে লাগা।

[আদা জল খাইয়া মহাশয়ের নিকট পড়িয়া আছি—'আলালের ঘরের দুলাল'।]

৯৭। আদায় কাঁচকলায় সম্বন্ধ।

৯৮। আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে কাজ কি।

[আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজে কি কাজ গো—'দাশু রায়'।]

৯৯। আদা শুকালেও ঝাল যায় না।

১০০। আদি অন্ত পাওয়া ভার।

১০১। আদুরে গোপাল।

১০২। আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো।

১০৩। আধা কইলে গাধাও বোঝে, সব কইলে কে না বোঝে।

১০৪। আঁধার ঘরের মানিক।

১০৫। আনাগোনা হাসি, ভাল নয় গো মাসী।

১০৬। আপন কোলে ঝোল টানে।

১০৭। আপন গাঁয়ে কুকুর সাজা।

১০৮। আপন ছিদ্র জানে না, পরের ছিদ্র খোঁজে।

১০৯। আপন ধন পরকে দিয়ে, মর এখন পাত কুড়িয়ে।

১১০। আপন বুদ্ধি ছিল ভাল, পর বুদ্ধিতে পাগল।
বাঁচাতে গিয়ে হাঁসের ডিম, গলায় পড়ল ছাগল।।

১১১। আপন বুদ্ধিতে ফকির হই, পর বুদ্ধিতে বাদশা নই

১১২। আপন ভাল পাগলেও বোঝে।

১১৩। আপন মান আপন ঠাঁই।

১১৪। আপন হাত জগন্নাথ, পরের হাত এঁটো পাত।

১১৫। আপনার আপনার কিছু নয়, জগৎ কেবল মায়াময়।

১১৬। আপনার চরকায় তেল দাও।

[তোমার নিজের চরকায় তেল দাও। 'নীলদর্পণ'—দীনবন্ধু মিত্র।]

১১৭। আপনারটা ষোল আনা, পরেরটা কিছু না।

১১৮। আপনার ঢাক আপনি বাজানো।

১১৯। আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারা।

[(ক) আপনি কুঠার মারি আপনার পায়—'কৃত্তিবাস'।

(খ) কচি কচি মেয়ে সাহেবেরে ধরে দিয়ে আপনার পায় আপনি কুড়ুল মারি।
—'নীলদর্পণ'।]

১২০। আপনার বগলে গন্ধ নেই। পরের বগলে গন্ধ।

১২১। আপনার মন দিয়ে পরের মন জানা। [বলুক আর না বলুক। আপনার মন দিয়ে পরের মন জানা যায়—'নবীন তপস্বিনী'।]

১২২। আপনার মাথা আপনি খায়।

১২৩। আপনার মান আপনি রাখি। কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি।

১২৪। আপনার মুখ আপনি দেখ।

১২৫। আপনি পাগল, ভাতার পাগল, পাগল তাঁর চেলা।
এক পাগলে রক্ষা নেই। তিন পাগলের মেলা। [এক ভূতে রক্ষা নাই, পাঁচ ভূতের মেলা—'ঈশ্বরগুপ্ত'।]

১২৬। আপনি শুতে ঠাঁই পায় না। শঙ্করাকে ডাকে—'প্রভাত মুখোপাধ্যায়'।]

১২৭। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

১২৮। আপনি ভাল তো জগৎ ভাল, তারি মান থাকে। আপনি মন্দ তো জগৎ মন্দ, কে তার মান রাখে [আপ ভলা তো জগ ভলা।]

১২৯। আপনি যেমন জগৎ তেমন।

১৩০। আপনি রাঁধি, আপনি কাঁদি, আপনার খাটাখাটি আপনি বাঁধি।

১৩১। আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা।

১৩২। আম, আমড়া, কুঁজড়া ধান—এ তিন নিয়ে বর্দ্ধমান।

১৩৩। আম শুকোলে আমসী, বয়স গেলে কাঁদতে বসি। [লোকে বলে—আম ফুরালে আমসি। বয়স ফুরালে কাঁদতে বসি।—'কুলীন সর্বস্ব'।]

১৩৪। আমার আমার যত কর চিনির বলদ বয়ে মর।

১৩৫ আমার পেটের ছাও, আমারে খেতে দাও।

১৩৬। আয় বুঝে ব্যয়।

১৩৭। আরশিতে মুখ দেখা।

১৩৮। আলগা পেলে সন্ন্যাসীও মাতে।

১৩৯। আলালের ঘরের দুলাল।

[আপনি জগদম্বার সম্বল। জগদম্বার আলালে ঘরের দুলাল—'নবীন তপস্বিনী'।]

১৪০। আলো চাল, বেঁধে কলা, খাও না ঠাকুর এই বেলা।
[আলোচাল আর কলা হলেই ঠাকুর সন্তুষ্ট।]

১৪১। আশায় আশায় জীবন গেল, সুদিন আর নাহি এল।

১৪২। আশায় মরে চাষা।

১৪৩। আশায় অর্দ্ধেক ফল।

১৪৪। আষাঢ় মাস, চাষার আশ।

১৪৫। আষাঢ়ের গল্প।

[ফুলমণি তখন এক আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিল—'দেবী চৌধুরাণী'।]

১৪৬। আষাঢ়ে পান চাষাড়ে খায়, গুয়াবনে পান গড়াগড়ি যায়।

১৪৭। আসতেও একা যেতেও একা, কার সঙ্গে কার দেখা।

১৪৮। আসতে যেতে গলা কাঁটা।

১৪৯। আস্তাকুঁড়ে চাঁদের আলো।

১৫০। আহাম্মক যে, হয় পিছনে কথা কয়।

১৫১। আহাম্মক এক, যে পরের মালে করে টেঁক।
আহাম্মক দুই, যে পরের চালে তোলে পুঁই।
আহাম্মক তিন, যে ঋণ করে দেয় ঋণ।
আহাম্মক চার, যে মধ্যস্থ হয়ে খায় মার।
আহাম্মক পাঁচ, যে পরের পুকুরে দেয় মাছ।
আহাম্মক ছয়, যে একের কথা আরে কয়।
আহাম্মক সাত, যে শ্বশুর বাড়ি খায় ভাত।
আহাম্মক আট, যে মাগকে পাঠায় হাট।
আহাম্মক নয়, যে ঘর থাকতে পরের ঘরে রয়।
আহাম্মক দশ, যে মাগীর কথায় বশ।

১৫২। আহার করবে ধীরে ধীরে। কোন দিক না চাবে ফিরে।

১৫৩। আহ্লাদী পুতুল।

১৫৪। আহ্লাদের প্রহ্লাদ।

১৫৫। ইচ্ছা আছে যার, পথ আছে তার।

১৫৬। ইট পড়লে পাটকেলটিও পড়ে।

১৫৭। ইতি করা। [পড়ল ঘুমের দফায় ইতি—'দ্বিজেন্দ্র রায়'।]

১৫৮। ইসরায় দিশাহারা।

* ঈ *

১৫৯। ঈদের চাঁদ।

১৬০। ঈশান কোণের মেঘে, ঝড় ওঠে বেগে।

* উ *

১৬১। উকিল আর গাড়ির চাকা, তেল চর্বি দিয়ে রাখা।

১৬২। উঁচু হবে তো নীচু হও।

১৬৩। উঁচু হলে ঝড়ে ভাঙবে, নীচু হলে ছাগলে খাবে।

১৬৪। উচ্ছে খাবে কচি, পটোলের খাবে বীচি।

১৬৫। উজানের কই।

[জীয়ন্ত মানুষ তারা গিলে বাছে বাছ, কৃষাণ যেমন ধরে উজোনের মাছ —'কবিকঙ্কণ'।]

১৬৬। উঠল বাই তো কটক যাই।

১৬৭। উড়কি ধানের মুড়কি আর সরু ধানের চিঁড়ে।

১৬৮। উড়নচণ্ডে। [উড়নচণ্ডে কাজে সমাজের নাম নিতে নেই—'লীলাবতী'।]

১৬৯। উড়ে এসে জুড়ে বসা। [উনি একেবারে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন কাকেও গ্রাহ্যির মধ্যে করেন না—'নব নাটক'।]

১৭০। উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।

[ওরে উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ এই অবস্থা ধরি সবে—ঈশ্বরগুপ্ত। ওড়া খই গোবিন্দায় নমঃ বেরিয়ে গেলেই আমাদের কেষ্ট নয়—'লীলাবতী'।]

১৭১। উত্তম মধ্যম দেওয়া। [এই হস্তিমূর্খ···ইহার মতের অন্যথা করিলে উত্তম মধ্যম হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা—'কুলীন কুলসর্বস্ব'।]

১৭২। উদ খেতে ক্ষুদ নেই, নেউলে বাজায় শিঙে।

১৭৩। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে। [উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে—'নবীন তপস্বিনী'।]

১৭৪। উপবাসী প্রাণ, করে আনচান।

১৭৫। উপরোধে ঢেঁকি গেলা। [উপরোধে ঢেঁকি গেলে, উপরোধে না হয় হরি বল্ল—গিরিশ ঘোষের 'নসীরাম'।]

১৭৬। উপুড় হস্ত করে না। [তোমারে ধরতে উপুড় হাত কভু দেখিনি ভূতনাথ—'দাশু রায়'।]

১৭৭। উপোসী ছারপোকা।

১৭৮। উভয় সংকট। [এ কুল রাখতে ও কুল হরে, পড়েছিলাম উভয় সংকটে—'দাশু রায়'।]

১৭৯। উলুবনে মুক্তা ছড়ান।

১৮০। উল্টা বুঝলি রাম।

১৮১। উনিশ বিশ। [মুখে মধু অন্তরে বিষ। তুমি উনিশ আমি বিশ—'দাশু রায়'।]

* উ *

১৮২। উন বর্ষায় দুনো শীত।

১৮৩। উন ভাতে দুনো বল। ভরা ভাতে রসাতল।

* ঋ *

১৮৪। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

* এ *

১৮৫। এই বেলা নাও ঘর ছেঁয়ে, আকাশে মেঘ দেখ চেয়ে।

১৮৬। এক আঁচড়ে চেনা যায়। [তুমি ব্রহ্মধর্ম যত বুঝেছ তা এক আঁচড়ে জানা গেছে—'সধবার একাদশী'।]

১৮৭। এক আঙুলে তুড়ি লাগে না।

১৮৮। এক এক গুলি দো দো চিড়িয়া।

১৮৯। এক কাসি বাজে না।

১৯০। এক কানকাটা শহরের বার দিয়ে যায়। দু' কানকাটা শহরের ভেতর দিয়ে যায়।

[দু কানকাটার গল্প শোন নি? তারা পথের মাঝখান দিয়ে চলে—শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্ন'।]

১৯১। এক কানে শোনে, অন্য কানে বেরোয়।

১৯২। এক কিল দিয়ে শ' কিল খায়।

ছুঁচ চুরি করতে কুড়ুল হারায়।

১৯৩। এক কুল ভাঙে ত এক কুল গড়ে।

১৯৪। একেই নাচুনি বুড়ি, তায় নাতনীর বিয়ে।

১৯৫। একে গুণ্ গুণ্, দুয়ে পাঠ। তিনে গোলমাল, চারে হাট।

১৯৬। একে ছেঁড়া কাঁথা, তায় শতভালি।

১৯৭। একে তো টমা, তায় তুষার ধুমো।

১৯৮। একে বউ নাচনী, তায় খেমটার বাজনি।

১৯৯। এক পয়সা নাই থলিতে, লাফিয়ে বেড়ায় গলিতে।

২০০। কই মাছের প্রাণ। অল্পেতে না যান। [আমাদের কৈ মাছের প্রাণ, মরেও আমাদের মরণ নেই—দ্বিজেন্দ্র রায়ের 'ত্র্যহস্পর্শ'।]

২০১। এক জন্ম নিলে, আর জন্মে মিলে।

২০২। এক জায়গায় থাকলে, হাঁড়িতে হাঁড়িতে ঠেকাঠেকি হয়।

২০৩। একটি ভাত টিপলে, হাঁড়ি শুদ্ধ ভাতের খবর মেলে।

২০৪। এক ডালে দুই পাখি, গায়ে গায়ে মাখামাখি।

২০৫। একদিন মদের জোরে, সাত দিন মাথা ঘোরে।

২০৬। এক দেয় বর ছেলে, আর দেয় ওর ছেলে।

২০৭। এক পশলা জল হল, নদী-নালা ভেসে গেল।

২০৮। এক পা জলে, এক পা স্থলে।

২০৯। এক পাঁঠা তিনবার কাটা।

২১০। এক পায়ে জুতো, খায় মুচির গুঁতো।

২১১। একবার যায় যোগী, দুবার যায় ভোগী, তিনবার যায় রোগী।

২১২। এক জুতোর তিন মান।
যার দিকে না চায় সেই করে রাগ।

২১৩। এক মনে থাকলে পরে, ঠাকুর আপনি আসে ঘরে।

[মন দিয়ে ঠাকুরকে ডাকলে ঠাকুরের দেখা পাওয়া যায়। এর জন্য মন্দিরে মন্দিরে ঘোরার দরকার হয় না।]

২১৪। এক মায়ের এক পুত খায়, দায় যেন যমের দূত।

২১৫। এক মুখে তিন কথা, শুনে লাগে মাথা ব্যথা।

২১৬। এক মুখে দুই কথা, হেপ্ ফেলে হেপ্ গেলা।
[দীনবন্ধু মিত্রের কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠে উল্লেখ।]

২১৭। এক মুরগী কবার জবাই।

২১৮। এক যাত্রায় পৃথক ফল।

২১৯। এক রঙি ছুঁড়ি, তার রকম দেখে মরি।

২২০। এক রসের রসিক।

২২১। এক রাত্রির দেখা। তুমি প্রাণসখা।

২২২। এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি
কেহ না রইল আর বংশে দিতে বাতি।

২২৩। এক শয্যার সাথী, সঙ্গে কাটাই রাতি।

২২৪। এক হাটে দুই দর।

২২৫। এক হাত গাছে, সাত হাত লাউ।

২২৬। এক হাত নড়ে না, দু' হাত নড়ে।

২২৭। এক হাত পায়, এক হাত মাথায়।

২২৮। এক হাত লওয়া।

২২৯। এক হাতে তালি বাজে না।

[এক হাতে কখনো কি বেজে থেকে থাকে তালি—'ঈশ্বর গুপ্ত'।]

২৩০। এক হেঁসেলে তিন রাঁধুনী, পুড়ে মরে তার ফেন গালুনী।

২৩১। একাই একশ।

২৩২। একা কাঁদি একা হাসি, গরম রেঁধে খাই বাসি।

২৩৩। একাদশে বৃহস্পতি।

[ইনস্পেক্টর মহলে একাদশে বৃহস্পতি —'হুতোম প্যাচার নক্সা'।]

২৩৪। একান্ন পাপও পাপ। বাহান্ন পাপও পাপ।

[ও একান্নও পাপ, বাহান্নও পাপ—'শ্রী বৎস চিন্তা'।—'গিরিশ ঘোষ'।]

২৩৫। এক রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর।

২৩৬। এ কি হলো জ্বালা। যমুনায় জল আনতে গেলে বাঁশী বাজায় কালা।

২৩৭। এ কুল ও কুল দু কুল গেল।

[তার এ কুল ও কুল দু কুল গেল, পাথারে পড়িল সে।—'চণ্ডীদাস।']

[আমার এ কুল ও কুল দুকুল গেল। —'রামপ্রসাদ।']

২৩৮। এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো।

২৩৯। একে কাটে ধারে, আরে কাটে ভারে।

২৪০। এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে।

অন্য গাঁয়ের মাথা ব্যথা।

২৪১। একে ছেঁড়া কাঁথা, তায় শততালি।

২৪২। একে তো নাচুনী কালী, তাতে মৃদঙ্গের তালি।

২৪৩। একে তো মধুপর্কের বাটি, তায় আবার কাত।

২৪৪। এক মন হলে সমুদ্র শুকায়।

২৪৫। একে বাধা, দুয়ে বিধি, তিনে হয় কার্যসিদ্ধি।

২৪৬। একে বাবা সত্যপীর, পরকে তরাবেন কোথা নিজেই অস্থির।

২৪৭। একে মনসা। তাই ধুনার গন্ধ।

[আমার একি দশা, একে মনসা, তাতে ধুনার গন্ধ—'দাশু রায়'।]

২৪৮। একে শনি, তায় রন্ধ্রগত।

[তোমার বেলা বই তো নয়। গ্রহদের স্বয়ং আমার রন্ধ্রগত—গিরিশ ঘোষের 'শ্রী বৎসচিন্তা']

২৪৯। এগুলে রাম, পেছুলে রাবণ।

২৫০। এঁচড়ে পাকা।

[দার্শনিকেরা ঈশ্বরের এঁচড়ে পাকা ছেলে—'রাজনারায়ণ বসু']

২৫১। এটা ধরি, না ওটা ধরি, হাতের পাঁচ ছাড়তে নারি।

২৫২। এত করে করি ঘর, তবু মিনসে বাসে পর।

২৫৩। এত টাকাই যদি ঋণ, আর এক টাকার ঘি কিন।

২৫৪। এত যদি ছিল মনে, তবে সাগর বাঁধলি কেনে।

২৫৫। এককাল ঠেকেছে তিনকাল গিয়ে।
তবু আবার করবে বিয়ে।

২৫৬। এক গাছের ছাল অন্য গাছে জোড়া লাগে না।

২৫৭। এক যায় আর চায়। চাইতে চাইতে পাতাল যায়।

২৫৮। এক পাগলে রক্ষা নেই, অতি পাগলের মেলা।

২৫৯। এক গুলিতে দুই বাঘ।

২৬০। এত সুখ যদি তোর কপালে তবে কেন তোর কাঁথা বগলে

২৬১। এক চাঁদে জগৎ আলো।

২৬২। এক চুমুকে সমুদ্র পান।

২৬৩। এক চোখে কাঁদা এক চোখে হাসা।

২৬৪। এক ছিলিমে যেমন তেমন, দু ছিলিমে মজা।
তিন ছিলিমে উজীর আমীর, চার ছিলিমে রাজা।

২৬৫। এক ছেলের মা, ভয়ে কাঁপে গা।

২৬৬। একজন ধরলে গান, সবাই তার ধরে তান।

২৬৭। একজনে রাখলে মন সুখ হয় বিলক্ষণ।

২৬৮। এ বলে—আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।

২৬৯। এমন করলে শেষে, রইতে দিলে না শেষে।

২৭০। এমন দিন হবে কবে, প্রাণবন্ধু কথা কবে।

২৭১। এমন ধন পেলে, নরকে যাই স্বর্গে ফেলে।

২৭২। একে মাস যায় তা, তায় বত্রিশে।

২৭৩। এমা, ও মাসী, তবে কেন উপবাসী।

২৭৪। এয়সা দিন নেহি রহেগা।

২৭৫। এর মুণ্ডু ওর ঘাড়ে।

২৭৬। এলো চুলে তেল দেয় না।

২৭৭। এস্পার কি ওস্পার।

[দেবেন্দ্র স্থির করিলেন। স্বয়ং হীরার বাড়ি গিয়া এস্পার কি ওস্পার যা হয় একটা করিয়া আসিবেন। —'বিষবৃক্ষ']

* ও *

২৭৮। ওঝা আনলাম মাকে ভাল করতে।
ওঝা চায় মাকে বিয়ে করতে॥

২৭৯। ওই ছুঁড়ি, তোর বিয়ে, নেকড়ায় আগুন দিয়ে।

[লোকে বলে—ওই ছুঁড়ি তোর বে, আমার মেয়েদের কপালে তাই ঘটেছে-'কুলীন সর্ব্বস্ব'।

২৮০। ওরে আমার ঘোল কড়া, ঘরে ভাত নেই বেগুনপোড়া।

২৮১। ওরে ওরে ভাইরে কেউ কারো নয় রে।

২৮২। ওল কচু মান, তিনই সমান।

২৮৩। ওল খেয়ে করেছি গোল। ঠাকুরঝি তুই তেঁতুল গোল।

২৮৪। ওলে আর ঘোলে। প্রত্যয় খেও না রমণীর বোলে।

২৮৫। ওষুধ ধরেছে।

* ক *

২৮৬। 'ক' অক্ষর গোমাংস।

[পেটে নাই বিদ্যার অংশ, ক অক্ষর গোমাংস—'দাশু রায়']

২৮৭। কইতে কইতে মুখ বাড়ে, খাইতে খাইতে পেট বাড়ে।

২৮৮। কখনো খেওনা ওলে আর ঘোলে।
কখনো ভুলো না ঢেমনার বোলে।

২৮৯। কাঁচ পাঁঠা, পাকা মেষ, দুইয়ের আনা, ঘোলের শেষ।

২৯০। কচুকাটা করব।

২৯১। কচুপোড়া খাওয়া।

[আরে খেলে কচুপোড়া, ভাল সময় ভাল পোড়া —'দাশু রায়']

২৯২। কচ্ছপ যখন জলে থাকে, ডেঙায় ডিমে নজর রাখে।

২৯৩। কড়ি দিয়ে চিনি নারী, নারী দিয়ে নর।

২৯৪। কত দুধে কত জল।

২৯৫। কত ধানে কত চাল।

২৯৬। কত রঙ্গ দেখালি, মাসী।

২৯৭। কত সন্ধ্যে ভাতার পায়, শোবার বেলায় গয়না চায়।

২৯৮। কথা দিয়ে কথা নেওয়া।

২৯৯। কথা বেচে খাওয়া।

৩০০। কথায় কথা বাড়ে, জলে বাড়ে ধান।
বাপের বাড়ি থাকলে মেয়ের বাড়ে অপমান ॥

৩০১। কথায় মন ভিজে, চিঁড়ে ভেজে না।

৩০২। কথার পিঠে কথা।

৩০৩। কথার মারপ্যাঁচ।

৩০৪। কথার মার বড় মার।

৩০৫। কনের বাপ বসে বসে চোখের জলে ভাসে।
বরের বাপ বসে আছে পাঁচশ টাকার আশে ॥

৩০৬। কপাল গুণে গোপাল মেলে।

৩০৭। কপাল ভাল তো সব ভাল।

৩০৮। কপালে আছে বাঁদী, সুখের লাগি কাঁদি।

৩০৯। কপালে নেইকো ঘি ঠক ঠকালে হবে কি।

৩১০। কপালের নাম গোপাল।

৩১১। কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না।

৩১২। কর যদি তাড়াতাড়ি, ভুল হবে বাড়াবাড়ি।

৩১৩। কলুকে না পাওয়া।

[কৈ আইন তার কাছে কলুকে পায় না কেন ? —'হুতোম প্যাঁচার নক্শা

৩১৪। কলাপোড়া খাও।

৩১৫। কলির অবতার।

৩১৬। কলির বউ ঘর ভাঙানী।

৩১৭। কলুর বলদ।

[মা, আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত—'রামপ্রসাদ।']

৩১৮। কষ্ট বিনা কেষ্ট মেলে না।

৩১৯। কাকস্য পরিবেদনা।

৩২০। কাকের মাংস কাকে খায় না।

৩২১। কাঙালের কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়।

৩২২। কাঁচা পয়সা।

৩২৩। কাঁচাখেকো দেবতা।

৩২৪। কাজীর বিচার।

৩২৫। কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজী।

৩২৬। কাঁটা যায় নুনের ছিটে।

[কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পোড়ার উপর পোড়া—'ঈশ্বর গুপ্ত'।

তুমি আর জ্বালান জ্বালিও না, তোমার আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে হবে না—'নবীন তপস্বিনী'।]

৩২৭। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

৩২৮। কাঁটা বিনা কমল নাই, কলঙ্ক বিনা চাঁদ নাই।

৩২৯। কাঁঠালের আমসত্ত্ব।

[জানে না পরম তত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ত্ব—'আজু গোঁসাই'।]

৩৩০। কান টানলে মাথা আসে।

[কান টানলে মাথা আসে। অবশ্য তার পেছনে যদি একটা মাথা থাকে——দ্বিজেন্দ্র রায়ের 'সাজাহান'।]

৩৩১। কানপাতলা মানুষ।

৩৩২। কানা মাছি।

৩৩৩। কার ঘাড়ে দুটো মাথা।

[কার ঘাড়ে দুটো মাথা। কর্ম করিবে—'ভারতচন্দ্র']

৩৩৪। কারণ বই কার্য নেই।

৩৩৫। কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ।

৩৩৬। কালনেমির লঙ্কা ভাগ।

৩৩৭। কাষ্ঠ হাসি।

[কষ্টের স্বভাব কাষ্ঠ হাসি—'দাশু রায়'।]

৩৩৮। কিল খেয়ে কিল চুরি।

৩৩৯। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো।

৩৪০। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

৩৪১। কিস্তি মাত।

৩৪২। কীর্তির্যস্য স জীবতি।

৩৪৩। কুঁড়ে ঘরে চাঁদের হাট।

৩৪৪। কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে, মা বড় ধন॥

৩৪৫। কুনো ব্যাঙ।

৩৪৬। কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনো নয়।

[কুপুত্র অনেক হয়। কুমাতা কখনো নয়—'দাশু রায়'।]

৩৪৭। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়।

[খুঁড়িতে খুঁড়িতে কেঁচো যদি উঠে সাপ। তবেই প্রাণের দফা একেবারে সাফ—'ঈশ্বর গুপ্ত'।]

৩৪৮। কেল্লা ফতে।

* খ *

৩৪৯। খড় কেটে বন উজাড়।

৩৫০। খড়ের আগুন, যেমন জ্বলে তেমনি নেভে।

[আমি নিতান্ত কোম্পানীর খয়ের খাঁ ভক্ত—'অমৃত বসুর একাকার'।]

৩৫১। খল যায় রসাতল।

৩৫২। খাই না খাই আছি ভালো, ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো।

৩৫৩। খাঁচায় পুরে খোঁচা মারা।

৩৫৪। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী।

৩৫৫। খাতায় নাম লেখানো।

৩৫৬। খাল কেটে কুমীর আনা।

৩৫৭। খুঁচিয়ে ঘা করা।

৩৫৮। খেতে খেতে লোভ বাড়ে, কাঁদতে কাঁদতে শোক বাড়ে।

৩৫৯। খেয়ার কড়ি।

৩৬০। খোদার উপর খোদকারী।

* গ *

৩৬১। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।

৩৬২। গতস্য শোচনা নাস্তি।

[গদাই লস্করি চালটুকু দেখছি অভ্যাস করা আছে—'অমৃত বসু'।]

৩৬৩। গরু মেরে জুতো দান।

৩৬৪। গল্পের গরু গাছে ওঠে।

৩৬৫। গলায় গলায় পীরিতি।

৩৬৬। গাঁ ছাড়ে না কুকুর। মাছ ছাড়ে না পুকুর।

৩৬৭। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া।

৩৬৮। গাঁ নেই তার সীমানা।

৩৬৯। গায়ে জ্বর আসা।

[টাকা দিতে হইলে গায়ে জ্বর আইসে—'আলালের ঘরের দুলাল'।]

৩৭০। গায়ে পড়ে ভাব।

৩৭১। গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান।

৩৭২। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

[সকলেই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল—'আলালের ঘরের দুলাল'।]

৩৭৩। গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।

৩৭৪। গুরু চণ্ডালী।

৩৭৫। গুরু মারা বিদ্যা।

[অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা। যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা—'সোনার তরী'।]

৩৭৬। গুরু লঘু। লঘু গুরু জ্ঞান।

[লঘু গুরু না মেনে না হয় পুণ্যশ্লোক—'ঘনরাম চক্রবর্তী''।]

৩৭৭। গুষ্টির পিণ্ডি।

[আর বুঝবে কি আমার গুষ্টির পিণ্ডি—'গিরিশ ঘোষ'।]

৩৭৮। গেঁয়ো যোগীর ভিক্ষা মেলে না।

[ঐ যে কথায় বলে, গাঁয়ের যোগী ভিক্ষা পায় না, এক্কানকার কোন ব্যাটা কি তাকে চিনতে পারলে—'বৈকুণ্ঠের উইল'।]

৩৭৯। গোকুলের ষাঁড়।

৩৮০। গোঁজামিল দেওয়া।

৩৮১। গোড়া কেটে আগায় জল।

৩৮২। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া।

৩৮৩। গোঁফ দেখলেই শিকারী বেড়াল চেনা যায়।

৩৮৪। ঘর জ্বালানে পর ভুলানে। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘে ডরায়।

৩৮৫। ঘরে নেই ভাত ধর্ম্মের উপবাস।

৩৮৬। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান।

৩৮৭। ঘটকালি করতে গিয়ে বিয়ে করে এল।

৩৮৮। ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গোৎসব ইতু পুজায় ঢাক।

৩৮৯। ঘর জামায়ের পোড়ার মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ।

৩৯০। ঘর জ্বালানে, পর ভুলানে।

৩৯১। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।

৩৯২। ঘর নেই দোর বাঁধে, মাগ নাই ছেলের জন্য কাঁদে।

৩৯৩। ঘর বাঁধবে ছাইবে না, ধার দিবে চাইবে না।

৩৯৪। ঘর মুখো বাঙালী, রণমুখো সিপাই।

৩৯৫। ঘরামীর ঘর ছেঁদা।

৩৯৬। ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন, বাহিরে কোঁচার পত্তন।

৩৯৭। ঘরে নাই ভাত, কোঁচা তিন হাত।

৩৯৮। ঘঁুটে পোড়ে, গোবর হাসে।

৩৯৯। ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি।

৪০০। ঘুম নেই যোগীর, আর রোগীর।

৪০১। ঘুষ পেলে আমলা তুষ্ট।

৪০২। ঘোড়া চিনি কানে, রাজা চিনি দানে, মেয়ে চিনি হাসে, পুরুষ চিনি কাসে।

৪০৩। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া।

৪০৪। ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া।

৪০৫। ঘোড়া থাকলে চাবুকের ভাবনা।

৪০৬। ঘোড়ার ঘাস কাটা।

৪০৭। ঘোড়ার ডিম।

৪০৮। ঘোড়ার পেট, গাধার পিঠ, খালি থাকে কদাচিৎ।

৪০৯। ঘোড়ার আড়ালে খেমটার নাচ।

৪১০। ঘোল, কুল, কলা—তিনে নষ্ট গলা।

* চ *

৪১১। চালুন বলে ছুঁচ ভাই তোর পোঁদে কেন গর্ত।

৪১২। চাচা আপন, চাচী পর—চাচীর মেয়ে বিয়ে কর।

৪১৩। চোখে সরষের ফুল দেখা।

৪১৪। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

৪১৫। চোরে কামারে দেখা নাই।

৪১৬। চোরে চোরে মাসতুত ভাই।

৪১৭। চোরের উপর বাটপাড়ি।

৪১৮। চোরের ওপরে রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া।

৪১৯। চোরের মন বোঁচকার দিকে।

৪২০। চোরের মার বড় গলা।

৪২১। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

৪২২। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।

৪২৩। চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।

৪২৪। চোদ্দ শাকের মধ্যে ওল পরমাণিক।

৪২৫। চিংড়ি মাছ খেয়ে রবিবার নষ্ট।

৪২৬। চুরি বিদ্যে মহাবিদ্যে যদি না পড়ি ধরা।

* ছ *

৪২৭। ছাই চাপা আগুন।
৪২৮। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।
৪২৯। ছাই পায় না, মুড়কি জলপান।
৪৩০। ছাগলে কিনা খায়, পাগলে কি না কয়।
৪৩১। ছায়াতে ভূত দেখা।
৪৩২। ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়।
৪৩৩। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ।
৪৩৪। ছুঁচোয় যদি আতর মাখে, তবু কি তার গন্ধ ঢাকে।
৪৩৫। চুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে।
৪৩৬। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।
৪৩৭। ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।
৪৩৮। ছেলে নষ্ট হাটে বৌ নষ্ট খাটে।
৪৩৯। ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারী।
৪৪০। ছেলের হাতের মোয়া।
৪৪১। ছোট মুখে বড়ো কথা।

* জ *

৪২৪। জাতপাত সব গেল।
৪৪৩। জগা খিচুড়ি।
৪৪৪। জম, জামাই, ভাগনা—তিন নয় আপনা।
৪৪৫। জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে।
৪৪৬। জল খেয়ে জলের বিচার।
৪৪৭। জল, জোলাপ, জুয়োচুরি তিন নিয়ে ডাক্তারি।
৪৪৮। জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ।
৪৪৯। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ।
৪৫০। জাতও গেল পেটও ভরল না।
৪৫১। জানিনি, পারিনি, নেইক ঘরে, এ তিনেক দেবতা হারে
৪৫২। জামাইয়ের জন্য মারে হাঁস, গুষ্টিসুদ্ধ খায় মাস।
৪৫৩। জিয়ন্ত মাছে পোকা পড়ানো।

৪৫৪। জিলিপির প্যাঁচ।

৪৫৫। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।

৪৫৬। জোর যার, মুলুক তার।

৪৫৭। জ্যোৎস্নাতে ফটিক ফোটে, চোরের মায়ের বুকটি ফোটে।

* ঝ *

৪৫৮। ঝড়ে কাক মলো, ফকিরের কেরামত বাড়লো।

৪৫৯। ঝড়ো কাক।

৪৬০। ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো।

৪৬১। ঝি জব্দ কিলে, বৌ জব্দ শিলে, পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে।

৪৬২। ঝোপ বুঝে কোপ মারা।

৪৬৩। টকের জ্বালায় দেশ ছাড়িলাম, তেঁতুল তলায় বাসা।

৪৬৪। টাকা তুমি যাচ্ছ কোথায়? পিরীত যথা। আসবে কবে? বিচ্ছেদ যবে।

৪৬৫। টাকা দিয়ে চিনি নারী, নারী দিয়ে নর।

৪৬৬। টেনে বুনতে কুলায়না।

৪৬৭। ঠক বাছতে গাঁ উজাড়।

৪৬৮। ঠাকুর ঘরে কে, না আমি তো কলা খাইনে।

৪৬৯। ঠুঁটো জগন্নাথ।

৪৭০। ঠেকে শিখে আর দেখে শিখে।

৪৭১। ঠেলার নাম বাবাজী।

* ড *

৪৭২। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না।

৪৭৩। ডানপিটের মরন গাছের আগায়।

৪৭৪। ডানা কাটা পরী।

৪৭৫। ডুবে ডুবে জল খায় শিবের বাপেও জানতে পারেনা।

৪৭৬। ডুমুরের ফুল।

* ঢ *

৪৭৭। ঢাকের কাঁড়িতে মনসা বিকানো।

৪৭৮। ঢাক ঢাক গুড় গুড়।

৪৭৯। ঢাল নেই তরওয়াল নেই নিধিরাম সর্দার।

৪৮০। ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

৪৮১। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

৪৮২। ঢোলের পিছে কাঁসি।

* ত *

৪৮৩। তাঁতী রাগে কাপড় ছেড়ে, আপনার ক্ষতি আপনি করে।

৪৮৪। তাল, তেঁতুল, মাদার—তিনে দেখায় আঁধার।

৪৮৫। তালপাতার সেপাই।

৪৮৬। তাল বাড়ে ঝোপে, খেজুর বাড়ে কোপে।

৪৮৭। তাস তামাক পাশা, তিন কর্মনাশা।

৪৮৮। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে।

৪৮৯। তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার।

৪৯০। তিলক কাটলেই বৈষ্ণব হয় না।

৪৯১। তীর্থের কাক।

৪৯২। তুঁষের আগুন।

৪৯৩। তুফানে ছেড় না হাল, নৌকো হবে বানচাল।

৪৯৪। তুমি ফের ডালে ডালে, আমি ফিরি পাতায় পাতায়।

৪৯৫। তেল দাও সিঁদুর দাও ভবি ভোলবার নয়।

৪৯৬। তেলে জলে মিশ খায় না।

৪৯৭। তেলা মাথায় ঢাল তেল।

৪৯৮। তোমার পীর সিন্নি খেয়েছে।

৪৯৯। তোমার আমার ভালোবাসা, যেন মুসলমানের মুরগী পোষা।

৫০০। থাকে যদি চূড়ো বাঁশী, মিলবে রাধা হেন কতো দাসী।

৫০১। থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।

৫০২। থোঁতা মুখ ভোঁতা।

৫০৩। দশচক্রে ভগবান ভূত।

৫০৪। দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

৫০৫। দশের লাঠি একের বোঝা।

৫০৬। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায় না।

৫০৭। দাতা কর্ণ।

৫০৮। দিনগত পাপক্ষয়।

৫০৯। দিনে ডাকাতি।

৫১০। দু' নৌকোয় পা দিয়ে চলা।

৫১১। দুই স্ত্রী যার, বড়ো দুঃখ তার।

৫১২। দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা।

৫১৩। দুধের সাধ ঘোলে মেটে।

৫১৪। দেবতার বেলায় লীলা খেলা, মানুষের বেলায় পাপ।

৫১৫। ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।

৫১৬। ধরি মাছ না ছুঁই পানি।

৫১৭। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে।

৫১৮। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

৫১৯। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

৫২০। ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।

৫২১। ধর্মের ষাঁড়।

৫২২। ধান ভানতে শিবের গীত।

৫২৩। ধান ফেলতে ভাঙা কুলো।

৫২৪। ধার করে কানে সোনা।

* ন *

৫২৫। নদী নারী শৃঙ্গধারী—এ তিনে না বিশ্বাস করি।

৫২৬। না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

৫২৭। নেই কাজ তো খই ভাজ।

৫২৮। নাই দিলে কুকুর মাথায় চড়ে।

৫২৯। নাই বললে সাপের বিষও থাকে না।

৫৩০। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

৫৩১। নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমানো।

৫৩২। নাচতে জানে না উঠান বাঁকা।

৫৩৩। নাচুন্তির লাজ নাই, দেখুন্তির লাজ।

৫৩৪। নানা মুনির নানা মত।

৫৩৫। না বিয়ায়ে কানায়ের মা।

৫৩৬। না মরতেই ভূত।

৫৩৭। নামে তালপুকুর ঘটি ডোবে না।

৫৩৮। নিম নিষিন্দা যেথা, মানুষ কি মরে সেথা ?

৫৩৯। নির্ধনের ধন, অথর্বের যৌবন।

৫৪০। নুন আনতে পান্তা ফুরায়।

৫৪১। নুন খাই যার, গুণ গাই তার।

৫৪২। নেঙটার নেই বাটপাড়ের ভয়।

* প *

৫৪৩। পড়শী না বঁড়শী।

৫৪৪। পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।

৫৪৫। পতি মলো ভালো হলো, দুই সতীনে পীরিত হলো।
৫৪৬। পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার।
৫৪৭। পরের ধনে পোদ্দারি।
৫৪৮। পরের পিঠে, বড়ো মিঠে।
৫৪৯। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া।
৫৫০। পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ।
৫৫১। পর্বতের মূষিক প্রসব।
৫৫২। পাঁকাল মাছের গায়ে লাগে না পাঁক।
৫৫৩। পাকা ধানে মই দেওয়া।
৫৫৪। পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কি না খায়।
৫৫৫। পাছায় গু চড়ু বড়ু করে আলোচালেরহবিষ্যি খায়।
৫৫৬। পান পান্তা ভক্ষণ, ঐ তো পুরুষের লক্ষণ, আমি অভাগী তপ্ত খাই খাই কোন্ দিন বা মরে যাই।
৫৫৭। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।
৫৫৮। পার হলে পাটনি শালা।
৫৫৯। পিণ্ডি পায় না কীর্তন গায়।
৫৬০। পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।
৫৬১। পীরিত যেখানে, বিচ্ছেদ সেখানে।
৫৬২। পুরানো চাল ভাতে বাড়ে।
৫৬৩। পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, দক্ষিণ ছেড়ে, উত্তর বেড়ে, বাড়ি করগে পোতা জুড়ে।
৫৬৪। পেট ভরলে আনন্দ, ভজ রামগোবিন্দ।
৫৬৫। পেট ভাল নয়, চাল ভাজা খায়।
৫ ৬। পেটে খিদে, মুখে লাজ।
৫৬৭। পেটে খেলে পিঠে সয়।
৫৬৮। পেটে ভাত নেই, ঠোঁটে আলতা।
৫৬৯। পেটের শত্রু মুড়ি, বাড়ির শত্রু বুড়ী।
৫৭০। পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী।
৫৭১। পোর নামে পোয়াতি ভোজন।

৫৭২। ফলের মধ্যে আম্রফল, সুন্দরী নারী আর গঙ্গাজল।
৫৭৩। ফাঁক পেলে সবাই চোর।

৫৭৪। ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়।

৫৭৫। ফুটুনির মামা, ভিতরে কপনি উপরে জামা।

৫৭৬। ফেল কড়ি মাখ তেল।

৫৭৭। ফোতা বাবুর গালগল্প সার।

* ব *

৫৭৮। বৌ জব্দ কিলে, ঝি জব্দ শিলে; পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে।

৫৭৯। বগলে কাস্তে দেশময় খোঁজে।

৫৮০। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।

৫৮১। বড়ো নাক, তার গোঁফের বাহার।

৫৮২। বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী।

৫৮৩। বর্ষাকালে নদী, বুড়ো হলে সতী।

৫৮৪। বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।

৫৮৫। বহু সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

৫৮৬। বাঁজি জানে না প্রসব বেদনা।

৫৮৭। বাঁদী পরের পা ধোয়াতে পারে, নিজের পা ধোয় না।

৫৮৮। বাঁশ তলায় বিয়ল গাই—সেই সম্পর্কে মামাত ভাই।

৫৮৯। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।

৫৯০। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

৫৯১। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

৫৯২। বাড়ির শত্রু কানা, পুকুরের শত্রু পানা।

৫৯৩। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস।

৫৯৪। বানরের গলায় মুক্তার মালা।

৫৯৫। বাপকা বেটা, সেপাই কা ঘোড়া, কুচ নেহি তো থোড়া থোড়া।

৫৯৬। বাপ গুণে পো, মা গুণে ঝি।

৫৯৭। বাপের জন্মে চড়িনি ডুলি, ভেঙে গেল মোর পাছার খুলি।

৫৯৮। বাপের জন্মে নাইকো চাষ, ধানকে বলে দুর্বাঘাস।

৫৯৯। বামন হয়ে চাঁদে হাত।

৬০০। বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর।

৬০১। বামুনের গরু খায় অল্প, নাচে বেশী দুধ দেয় কলসী কলসী।

৬০২। বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি।

৬০৩। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।
৬০৪। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।
৬০৫। বিড়াল তপস্বী।
৬০৬। বিড়ালের ভাগ্যে সিকা ছেঁড়া।
৬০৭। বিনা সম্বলে পথ চলতে নাই।
৬০৮। বিপদ একা আসে না।
৬০৯। বিপদে পড়ে রাম নাম।
৬১০। বিষদাঁত ভাঙা।
৬১১। বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা।
৬১২। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।
৬১৩। বুড়ো হলে সবাই সতী।
৬১৪। বুড়ো মেরে খুনের দায়।
৬১৫। বেগুন গাছে আঁকশি।
৬১৬। বেঙের আধুলি।
৬১৭। বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি
৬১৮। বেণুবনে মুক্তা ছড়ানো।
৬১৯। বেল পাকলে কাকের কি?
৬২০। বেশ্যার দুয়ারে টঙ্কা টঙ্কা, পুরুর বেলায় লবডঙ্কা।
৬২১। বৈদ্যের বড়ি, ছুঁলে কড়ি।
৬২২। বোঝার ওপর শাকের আঁটি।
৬২৩। বোবার শত্রু নেই।

৬২৪। ভগ্নগৃহে বাস দুঃখ বারো মাস।
৬২৫। ভদ্রলোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল।
৬২৬। ভাঁড়ে মা ভবানী।
৬২৭। ভাগের মা গঙ্গা পায় না।
৬২৮। ভাগের মড়া পড়ে, শকুনির টনক নড়ে।
৬২৯। ভাগ্যবানের বৌ মরে, অভাগার ঘোড়া মরে
৬৩০। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়।
৬৩১। ভাঙবে তবু মচকাবে না।
৬৩২। ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না।

৬৩৩। ভাত পায় না ভাতার চায়, থেকে থেকে আবার গয়না চায়।

৬৩৪। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব!

৬৩৫। ভাদ্র মাসের তাল।

৬৩৬। ভিটেয় ঘু ঘু চরানো।

৬৩৭। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।

৬৩৮। ভূতের বেগার খাটা।

৬৩৯। ভূতের মুখে রাম নাম।

ম

৬৪০। মাছের তেলে মাছ ভাজা।

৬৪১। মরদ বড়ো তেজী, বাঁশবনে হাগতে গেল—তেড়ে এল বেজী।

৬৪২। মগের মুল্লুক।

৬৪৩। মাগুর মাছের ঝোল, ভরা যুবতীর কোল, বল হরি বোল।

৬৪৪। মন্দ খবর মিথ্যে হয় না।

৬৪৫। ময়রার ছেলে মিষ্টি খায় না।

৬৪৬। মরণ কালে হরিনাম।

৬৪৭। ময়ূরের নৃত্য দেখে লেজ নাড়ে ছাতার পাখী।

৬৪৮। মরা মালঞ্চে ফুটল ফুল, টেকো মাথায় উঠলো চুল।

৬৪৯। মরা হাতী লাখ টাকা।

৬৫০। মশা মারতে কামান দাগা।

৬৫১। মাকড় মারলে ধোকড় হয়।

৬৫২। মা গুণে ঝি, গাই গুণে ঘি।

৬৫৩। মাছ ধুলে মিঠে, মাংস ধুলে শিঠে।

৬৫৪। মাছের তেলে মাছ ভাজা।

৬৫৫। মাছের কাঁটা গলায় বাধলে বিড়ালের পায়ে গড়।

৬ ৬। মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুঁই।

৬৫৭। মাঘের শীতে বাঘ পালায়।

৬৫৮। মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।

৬৫৯। মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার।

৬৬০। মারে হরি রাখে কে, রাখে হরি মারে কে?

৬৬১। মিঠে কথায় চিড়ে ভেজে না।

৬৬২। মিড় মিড়ে পিদিম আর লিড়বিড়ে বো।

৬৬৩। মিনসের কোলে ছেলে দিয়ে, মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে।

৬৬৪। মুখে রাম নাম বগলে ছুরি।

৬৬৫। মুনিরও মন টলে।

৬৬৬। মেও ধরে কে?

৬৬৭। মেয়ে মানুষের বাড়, কলাগাছের বাড়।

৬৬ । মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।

* য *

৬৬৯। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

৬৭০। যত গর্জে তত বর্ষে না।

৬৭১। যত দোষ নন্দ ঘোষ।

৬৭২। যত্নের মধু পিঁপড়েয় খায়।

৬৭৩। যত বড় মুখ নয়, তত বড়ো কথা।

৬৭৪। যশোদা কি ভাগ্যবতী পরের পুতে পুত্রবতী।

৬৭৫। যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, মরবে সীতা ঘুচবে দুঃখ।

৬৭৬। যেমন গাদন, তেমনি নাদন।

৬৭৭। যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ।

* র *

৬৭৮। রণমুখো সেপাই, ঘরমুখো বাঙালী।

৬৭৯। রতনে রতন চেনে, শুয়রে চেনে কচু।

৬৮০। রথ দেখা কলা বেচা।

৬৮১। রসের ঘরে গৌর নাচে।

৬৮২। রাঁধুনীর সাথে ভাব থাকলে ভোজনেতে সুখ।

৬৮৩। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খাগড়ার প্রাণ যায়।

৬৮৪। রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, স্ত্রীর দোষে স্বামীর কষ্ট।

* ল *

৬৮৫। লংকায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে রাঁড় হলো। / দেলকোর মাথায় দিয়ে হাত, কাঁদে প্রভু জগন্নাথ।

৬৮৬। ললাটের লিখন কে করে খণ্ডন।

৬৮৭। লাখ কথা নইলে বিয়ে হয় না।

৬৮৮। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

৬৮৯। লাজে বৌ ভাত খায় না, চালতা হেন গ্রাস।

৬৯০। লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়।

৬৯১। লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।

৬৯২। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

৬৯৩। শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া।

৬৯৪। শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাও তাই সয়।

৬৯৫। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।

৬৯৬। শুড়ীর সাক্ষী মাতাল।

৬৯৭। শুওরের গো।

৬৯৮। শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি।

৬৯৯। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।

৭০০। ষষ্ঠী রাগ করে তো, ছেলে ধরে খাবেন।

৭০১। সকল চুলে চামর হয় না।

৭০২। সব শিয়ালের এক রা।

৭০৩। সকলেই তো মেয়ে, কেউ যাচ্ছে পালকি চড়ে, কেউ রয়েছে চেয়ে।

৭০৪। সৎ সঙ্গে কাশীবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

৭০৫। সময়ে না দেয় চাষ, তার দুঃখ বারমাস।

৭০৬। সমুদ্রে শয্যা পেতেছি, শিশিরে কি ভয়!

৭০৭। সস্তার তিন অবস্থা।

৭০৮। সাগরও শুকায় না, পাপও শুকায় না।

৭০৯। সাজালে গুজলে নারী, আর লেপলে পুঁছলে বাড়ি।

৭১০। সাত কাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাবা।

৭১১। সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।

৭১২। সাধ যায় বৈষ্ণব হতে, পোঁদ ফাটে মোচ্ছব দিতে।

৭১৩। সাপ হয়ে কামড়ায়, রোজা হয়ে ঝাড়ে।

৭১৪। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।

৭১৫। সুখ চেয়ে স্বস্তি ভালো।

৭১৬। সেই তো বাবা মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি।

৭১৭। সর্বঘটে কাঁঠালি কলা।

৭১৮। স্যাকরার ঠুক ঠাক, কামারের এক ঘা।

৭১৯। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

৭২০। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না।

৭২১। স্বামী নাই পুত্র নাই / কপাল ভরা সিঁদুর / ধান নাই, চাল নাই/গোলা ভরা ইঁদুর।

* হ *

৭২২। হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী।

৭২৩। হবু ছেলের অন্নপ্রাশন।

৭২৪। হলুদ খেলে কি রাঙা।

৭২৫। হরি ঘোষের গোয়াল।

৭২৬। হরি বাঁচান প্রাণ, বৈদ্যের বাড়ে মান।

৭২৭। হাঁচি টিকটিকি বাধা-যে না মানে সে গাধা।

৭২৮। হাগার নাই বাঘার ভয়।

৭২৯। হাগুন্তির লাজ নাই, দেখুন্তির লাজ।

৭৩০। হাটের দর আর পেটের ছেলে লুকানো যায় না।

৭৩১। হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙা!

৭৩২। হাড়ে দূর্বা গজানো।
৭৩৩। হাতীর মিনমিন, ঘোড়ার দৌড়।
৭৩৪। হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল।
৭৩৫। হাতে কড়ি পায়ে বল, তবে যাই নীলাচল।
৭৩৬। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।
৭৩৭। হাতের পাঁচ।
৭৩৮। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।
৭৩৯। হাভাতের ঘটি হল, জল খেতে খেতে প্রাণ গেল।
৭৪০। হাম ছোড়া, লেকিন কমলি নেই ছোড়তা।
৭৪১। হায়রে আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া।
৭৪২। হালে পানি পায় না।
৭৪৩। হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা।
৭৪৪। হিতে বিপরীত।
৭৪৫। হিসেবের গোরু বাঘে খায় না।
৭৪৬। হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে যায়।
৭৪৭। হোক্ না কাঠের বেড়াল, ইঁদুর ধরতে পারলেই হলো।

* * *

বিভিন্ন গাছপালা চাষের সময়, চাষের পদ্ধতি ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে খনার মতামত
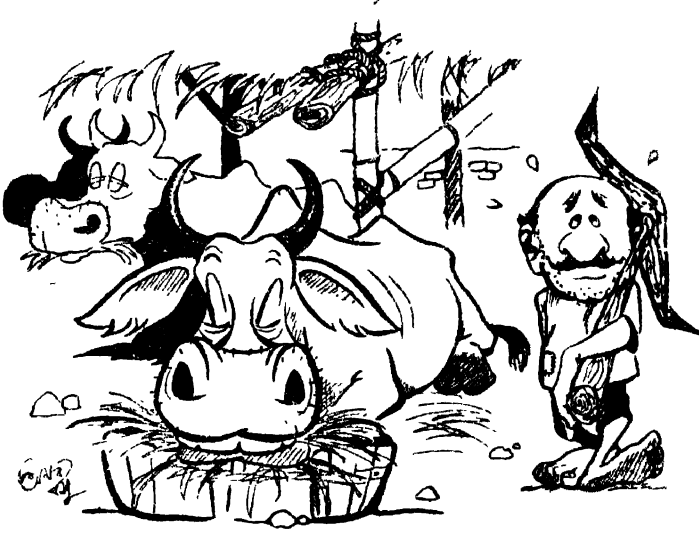
খনা বলে হাল নিয়ে মাঠে যবে করিবে গমন।
আগে দেখ চাষীভাই, যেন হয় শুভক্ষণ ॥
শুভক্ষণ দেখে সদা করিবে যাত্রা।
পথে যেন না হয় তখন অশুভ বার্তা ॥

মাঠে হাল চালাতে যেতে হলে, শুভদিন দেখে হাল নিয়ে মাঠে যাওয়া উচিত। রাস্তায় যদি কোন অশুভ সংবাদ শুনতে হয়, তাহলে মাঠে না গিয়ে বাড়ি ফিরে আসাই উচিত।

* * *

মাঠে গিয়ে আগে কারো দিক নিরূপণ।
পূর্বদিক হতে হল করহ চালন ॥

খনা বলে মোর কথা শুন মহাশয়।
ফসল ফলিবে অধিক নাহি সংশয়॥

মাঠে গিয়ে হাল চালান শুরু করার আগে দিক ঠিক করে নিতে হয়। তারপর পূব দিক থেকে চালাতে হয়। যে এই নিয়ম মতো হাল চালায়, সে বেশি ফসল পায়।

* * *

অমাবস্যা আর পূর্ণিমাতে যে বা ধরে হাল।
তার দুঃখ থাকে চিরকাল॥

অমাবস্যা আর পূর্ণিমার দিনে হাল ধরতে নেই। যে হাল ধরে তার দুঃখের শেষ থাকে না। সে নানাভাবে বিপদাপন্ন হয়।

* * *

বলদ থাকতে করে না চাষ, তার দুঃখ বারোমাস।

ঘরে বলদ থাকতেও যে খাটায় না, ঘরে বসিয়ে রাখে তার দুঃখের শেষ নেই। তার জমিতে চাষ আবাদ হয় না, ফলে অন্ন-বস্ত্রের অভাবে পড়তে হয়।

* * *

শ্রাবণে পুরো ভাদ্রে বারো, এর মধ্যে যতো পার।

এর অর্থ হলো পুরো শ্রাবণ মাস ও ভাদ্র মাসের বারো তারিখ পর্যন্ত ধান রোপণের উপযুক্ত সময়।

* * *

ষোল চাষে মুলো, তার আধা তুলো।
তার আধা ধান, বিনা চাষে পান॥

মুলার জন্য ষোলটি চাষ, তুলার জন্য আটটি চাষ, ধানের জন্য চারটি চাষের প্রয়োজন। তাতেই ভালো ফসল পাওয়া যায়। পানের জন্য চাষের দরকার হয় না।

* * *

কোল পাতলা ডাগর গুছি, লক্ষ্মী বলেন হেতায় আছি।

মোটা মোটা গুছি দিয়ে খুব ফাঁকা ফাঁকা করে ধান বুনলে বেশি ধান পাওয়া যায়।

* * *

আউশ ধানের চাষ, লাগে তিন মাস।

আউশ ধান অর্থাৎ আশু ধান্য। বর্ষাকালে এই ধান উৎপন্ন হয়। এই 'আশু'

শব্দটিকে ভুল করে অনেক সময় শীঘ্র অর্থে মনে করা হয়। সেজন্য যে ধান অতি শীঘ্র জন্মায় তাকে আশু ধান বা আউশ ধান বলে। খনার মতে এই ধান জন্মাতে তিন মাস সময় লাগে।

* * *

বাড়ির কাছে ধান গা, যার মার আছে ছা।
চিনিস বা না চিনিস, খুঁজে দেখে গরু কিনিস॥

বাড়ির কাছে জমি থাকলে, সবার আগে সেই জমিতে চাষ করা উচিত। তাতে চুরি হবার ভয় থাকে না। গরু কেনার উপায় জানা থাক বা না থাক, খুঁজে পেতে গরু কেনা উচিত।

* * *

আঁধার পরে চাঁদের কলা, কতক কালো কতক কলা।
উত্তরে উচা দক্ষিণে কাত, ধরায় ধরায় ধানের বাত।
চাল ধান দুই সস্তা, মিষ্টি হবে লোকের কথা।

কৃষ্ণপক্ষে যে চাঁদ ওঠে তার কিছু অংশ পরিষ্কার এবং বাকিটা অন্ধকারে কালো হয়ে থাকে। এই অবস্থায় প্রতিপদে বা দ্বিতীয়া তিথিতে যদি উত্তরে উঁচু আর দক্ষিণে নিচু থাকে, তাহলে সে বছর প্রচুর ধান হয়। ধান চাল দুই-ই প্রচুর সস্তায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। সস্তার বাজারে মানুষ সুখে থাকে। স্বাভাবিক ভাবে মানুষের প্রতি ব্যবহার সরল ও বন্ধুসুলভ হয়ে ওঠে।

* * *

বাধো আগে আলি, বোও তবে শালি।
না যদি ফল ফলে, গালি পেড় খনা বলে॥

জমিতে ভালভাবে আল বেঁধে শালি ধানের চাষ করলে ভালো ফসল পাওয়া যায়। এ কথা যদি সত্যি বলে প্রমাণিত না হয়, তা হলে খনাকে মিথ্যেবাদী বলে গালি দিও।

* * *

আষাঢ়ের পঞ্চদিনে রোপণ যে করে ধান।
বাড়ে তার কৃষিবল, কৃষিকার্যে হয় সফল॥

আষাঢ় মাসের প্রথম পাঁচ দিনের মধ্যে যে কৃষক ধান বপন করে সে কৃষিকাজে সফল হয়। প্রচুর ফল লাভ করে।

* * *

বাপ বেটায় চাষ চাই, তৎ অভাবে সোদর ভাই।

পরের সাহায্যে যে কৃষক চাষ করে তার লাভের আশা আদৌ থাকে না। বাবা ও ছেলে মিলে চাষের কাজে নামলে খুব ভালো হয়। সেটা সম্ভব না হলে সহোদর ভায়ের সাহায্য নেওয়া উচিত। অন্য কেউ তেমন আন্তরিকভাবে কাজ করবে না।

* * *

থোড় তিরিশে, ফুলো বিশে।
ঘোড়ামুখো তেরো জেনো, বুঝে সুঝে কাটো ধান্য॥

থোর জম্মানোর তিরিশ দিন পরে, ফুল বার হওয়ার কুড়ি দিন পরে, শিষ নত হওয়ার তেরো দিন পরে ধান কাটতে হয়। অন্যথায় লাভের আশা থাকে না।

* * *

শিষ দেখে বিশ দিন কাটতে দশ দিন।

যে দিন ধানের শিষ বের হবে, ঠিক তার কুড়ি দিন পর ধান কাটতে হবে। দশদিন ধরে কাটাই, মাড়াই কাজ শেষ করে ধান গোলায় তুলে রাখতে হবে।

* * *

অঘ্রাণে পাউটি, পৌষে ছেউটি।
মাঘে নাড়া, ফাল্গুনে ফাঁড়া॥

অঘ্রাণ মাসে ধান কাটলে ষোল আনা ধান পাওয়া যায়। পৌষে কাটলে ছআনা মাত্র

পাওয়া যায়। মাঘে কাটলে অবশিষ্টের পরিমাণ খুবই সামান্য। ফাল্গুনে কাটলে কিছুই থাকে না।

* * *

বৈশাখের প্রথম জলে আউশ ধান্য দ্বিগুণ ফলে।

বৈশাখের প্রথমে যদি ভালো বৃষ্টি হয়, তাহলে সে বছর আউশ ধান চাষ করলে দ্বিগুণ ফল পাওয়া যায়।

* * *

ধান ও পান চাষ সম্পর্কে

এক অঘ্রাণে ধান। তিন শ্রাবণে পান।
ডেকে খনা গান। রোদে ধান, ছায়ায় পান॥

যে জমিতে রোদ আছে সে জমিতে ধান চাষ করতে হয়। ছায়া জমিতে পান চাষ করতে হয়। এভাবে চাষ করলে বেশি ফল পাওয়া যায়।

* * *

পান পুঁতলে শ্রাবণে খেয়ে না ফুরোয় রাবণে।

শ্রাবণ মাসে পান চাষ করলে প্রচুর ফলন হয়। দুবেলা হরদম পান খেয়েও ফুরানো যায় না।

* *

* অন্যান্য ফল শস্য সম্পর্কে খনার বচন *

—কলাই চাষ—

ভাদ্দরের চারি, আশ্বিনের চারি, কলাই বুনি যতো পারি।

ভাদ্র মাসের শেষ চারদিন এবং আশ্বিন মাসের প্রথম চারদিন কলাই বোনার উপযুক্ত সময়।

* * *

—সরিষা চাষ—

খনা বলে চাষার পো।
শরতের শেষে সরিষা রো॥

খনার মতে শরৎকালের শেষে সরষে বুনলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

—মটর কলাই চাষ—

আশ্বিনের উনিশ, কার্তিকের উনিশ,
বাদ দিয়ে মটর কলাই বুনিস।

আশ্বিন মাসের উনিশ দিন বাদ দিয়ে, কার্তিক মাসের উনিশ দিন পর্যন্ত কলাই বোনা উচিত। তাতে চাষী ভালো ফলন পাবে বলে খনার বিশ্বাস।

* * *

—সরিষা ও মুগ—

সরিষা বুনে কলাই মুগ।
বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক॥

একই জমিতে সরষে ও মুগ কলাই বুনতে হয়। তাহলে একসঙ্গে দুটো ফলই পাওয়া যায়। দুটো ফল একসঙ্গে পেলে চাষীর লাভ হয় অনেক। খুশিতে আনন্দ করে বেড়াতে পারে।

* * *

—তুলা চাষ—

বৈশাখের প্রথম জলে, আশু ধান দ্বিগুণ ফলে।
শুন ভাই খনা বলে, তুলায় তুলা অধিক ফলে॥

খনা বলছেন বৈশাখ মাসের প্রথমে বৃষ্টি হলে আউশ ধান প্রচুর ফলে। আউশ ধানের পক্ষে বৈশাখের বৃষ্টি খুবই উপকারী। তেমনি তুলায় অর্থাৎ তুলা রাশি যে মাসের সমান, মানে কার্তিক মাসে যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে তুলা প্রচুর পরিমাণে ফলে। এক কথায় বলতে গেলে বৈশাখ মাসের বৃষ্টি আউশ ধানের পক্ষে উপকারী এবং কার্তিক মাসের বৃষ্টি তুলা চাষের পক্ষে উপকারী।

* * *

—চাষ আবাদ সম্পর্কে খনার নির্দেশ—

আউশের ভুঁই বেলে, পাটের ভুঁই এঁটেলে।

বেলে মাটিতে আউশ ধান খুব ভালো ফলে। পাট চাষের উপযুক্ত জমির মাটি এঁটেল হওয়া দরকার।

* * *

—তিল চাষ—

ফাল্গুনের আট চৈত্রের আট।
সেই তিল দায়ে কাট॥

ফাল্গুন মাসের শেষ আট দিন ও চৈত্র মাসের প্রথম আট দিন, মোট ষোল দিন তিল রোয়ার উপযুক্ত সময়।

*　　　*　　　*

—মান ও তিল চাষ—

কোদলে মান তিলে হাল। কাতেন ফাঁকা মাঘে কাল॥

মানের জমি কোদাল দিয়ে পাট করতে হয়। হাল চালালে কাজ হয় না। শ্বেত তিল আশ্বিন কার্তিকে বুনতে হয়। মাঘ ফাল্গুন কালো তিল চাষের উপযুক্ত সময়।

*　　　*　　　*

—লাউ ও লঙ্কার চাষ—

ছাইয়ে লাউ, উঠানে ঝাল।
কর বাপু চাষার ছাওয়াল॥

ছাই মেশানো মাটিতে লাউ গাছ ভালো হয়। গাছ একটু বড় হবার পর আবার তাতে ছাই দিতে পারলে ভালো হয়। বাড়ির উঠোনে লংকা চাষ করলে ফল ভালো পাওয়া যায়।

*　　　*　　　*

মাছের জলে লাউ বাড়ে, ধেনো জমিতে মাল বাড়ে।

লাউ গাছের পক্ষে মাছ ধোয়া জলই উপযুক্ত সার। ধানের জমিতে লংকা চাষ করলে প্রচুর লংকা পাওয়া যায়।

*　　　*　　　*

ভাদরে আশ্বিনে না রুয়ে ঝাল।
যে চাষা ঘুমিয়ে কাটায় কাল॥
পরেতে কার্তিক অঘ্রাণ মাসে।
যদি বুড়ো গাছ ক্ষেতে পুঁতে আসে॥

সে গাছ মরিবে ধরিবে ওলা।
পাবে না মাল চাষার পোলা॥

ভাদ্র আশ্বিন মাসে লঙ্কার চাষ করলে ফল ভালো হয়। তা না করে যদি আলস্যে সময় কাটিয়ে কার্তিক অঘ্রাণ মাসে চাষ করা হয়, তাহলে ধসা রোগে গাছ নষ্ট হয়ে যায়। লঙ্কা পাবার কোন আশাই থাকে না।

*   *

—কলার চাষ—

কি কর শ্বশুর খেটেখুটে।
ফাল্গুনে এঁটে পোঁত কেটে॥
বেড়ে যাবে ঝাড়কে ঝাড়।
কলা আনতে ভাঙবে ঘাড়॥

ফাল্গুন মাসে কলার চারা পুঁতে দিতে পারলে কলা গাছ হুড় হুড় করে বেড়ে যায়। ফলে কলার ফলন খুব ভালো হয়।

*   *   *

যদি পোঁত ফাল্গুনে কলা,
কলা হবে মাস ফসলা।

ফাল্গুন মাসে কলা গাছ পুঁতলে প্রতি মাসে কলা ফলে।

*   *   *

ভাদ্র মাসে রুয়ে কলা।
সবংশে মলো রাবণ শালা॥

ভাদ্র মাসে কলা গাছ বসালে ভালো ফলন পাওয়া যায় না। সে জন্য ঐ মাসে কলা চাষ না করাই ভালো।

*   *   *

নলোকান্তর গজেক বাই।
কলা রুয়ে খেয়ো ভাই॥
রুয়ে কলা না কোটা পাত।
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥

আট হাত অন্তর অন্তর কলাগাছ লাগাতে হয়। বড় হলে ঐ কলাগাছের পাতা

কোনদিন কাটবে না। তাহ'লে প্রচুর পরিমাণে ঐ গাছগুলিতে কলা পাওয়া যাবে। ঐ কলা বিক্রি করেই সংসারের অভাব দূর করা সম্ভব হয়ে পড়বে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: কলাগাছ সম্বন্ধে খনার আর একটা উক্তি এখানে দেখানো হলো।

* * *

কলা তলায় যাবিনে। ফল তার খাবিনে॥
লেগে যাবে ভূঁয়ে ভূঁয়ে। কলা যেন পড়বে শুয়ে॥

কলার মোচা না কাটাই ভালো। মোচা না কাটলে কলার ফলন খুব ভালো হয়।

* * *

সিংহ মীন বর্জে কলা খাবে আজ্যে।

কলাগাছ ভাদ্র ও চৈত্র মাস বাদ দিয়ে অন্যান্য মাসে পুঁততে হয়।

* * *

ডাক দিয়ে বলে রাবণ, কলা না লাগাব আষাঢ় শ্রাবণ।
তিনশত ষাট ঝাড় কলা রুয়ে, থাক গৃহস্থের ঘরে শুয়ে।
লাগিয়ে গাছ কেটো না পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥

আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে কলাগাছ লাগালে গাছ ও ফল কোনটাই ভালো হয় না। তিন শত ষাট ঝাড় কলাগাছ লাগিয়ে পাতা যদি না কাটা হয়, তা হলে সেই কলাগাছ থেকে প্রচুর ফল ফলবে। তাতে সারা বছরের ভাত কাপড়ের খরচ চলে যাবে।

* * *

সাত হাতে তিন বিঘেতে, কলা লাগাবে মায়ে পোতে।

সাত হাত অন্তর কলাগাছ পুঁততে হয়। মাটির নিচে দেড় হাত পরিমাণ গর্ত খুঁড়ে কলা গাছ লাগানো উচিত।

* *

—কুমড়া চাষ—

চাল ভরা কুমড়া পাতা লক্ষ্মী বলেন থাক তথা।

যার বাড়িতে চাল ভর্তি কুমড়া থাকে, তার কোন অভাবই থাকে না।

* * *

—লাউ ও শশা চাষ—

উজান ভরা লাউ শশা, ঘরে তার লক্ষ্মীর দশা।

যে চাষীর উঠোন লাউ শশায় ভরে থাকে তার কোন অভাব থাকে না।

*　　*　　*

—পটোল চাষ—

বুনলে পটোল ফাল্গুনে, ফল বাড়ে দ্বিগুণে।

ফাল্গুন মাসে যদি কোন চাষী পটল চাষ করে, তাহলে প্রচুর ফলন পেতে পারে। চাষীর প্রচুর লাভ হয়।

*　　*　　*

শোন ওরে চাষীর বেটা, মাটির মধ্যে বেলে যেটা।
তাতেই যদি বুনিস পটোল, হবেই হবে আশা সফল॥

খনা বলছেন, ওহে চাষী পুত্র শোন, বেলে মাটিতে যদি পটোল লাগানো হয়, তাহলে প্রচুর ফলন পাওয়া যায়। এর ফলে চাষীর মনের আশা পূরণ হয়। চাষী সুখের মুখ দেখে।

*　　*　　*

—ওল চাষ—

ফাল্গুনে না রুইলে ওল, হয় শেষে গণ্ডগোল।

ওল বসাবার শ্রেষ্ঠ সময় ফাল্গুন মাস। ফাল্গুন মাসে ওল না বসালে চাষ ভালো হয় না।

*　　*　　*

ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ। কিন্তু তাতে নাহি দুখ।

অন্য গাছের বা বাড়ির ছায়ায় ওল গাছ লাগালে, সেই ওলে মুখে চুলকায়। মুখ চুলকালেই যা একটু অসুবিধে। এছাড়া বিশেষ অসুবিধে নেই। কারণ ছায়ার ওল ফলে প্রচুর।

*　　*　　*

—বেগুন চাষ—

বলে গেছে বরাহের পো। দশটি মাসই বেগুন রো।
চৈত্র বৈশাখে দিবি বাদ। নইলে হবে সব বরবাদ॥

চৈত্র, বৈশাখ মাস বাদ দিয়ে বছরের বাকি দশ মাস বেগুন চাষ করা চলে। ঐ দু' মাসে বেগুন চাষ করলে চাষীর লাভের তুলনায় ক্ষতিই বেশি। তাই খনা ঐ দু' মাসে বেগুন চাষ করতে নিষেধ করেছেন।

* * *

ধরলে পোকা দিবি ছাই, এর চেয়ে ভালো উপায় নাই।

খনার মতে বেগুন গাছে যদি পোকা লাগে, তবে ছাই দেওয়াই ভালো। তাতে পোকা একেবারে নির্মূল হয়ে যায়। বেগুনে ফলন ধরতে আর কোন বাধা থাকে না।

* *

—আলুর চাষ—

বাঁশবনে বুনলে আলু, আলু হয় বেড়ালু।

বাঁশবনের পাশে আলুর চাষ করলে আলুর গাছ খুব তেজী হয় এবং আলুও খুব বড় হয়।

* * *

—ভুট্টা চাষ—

থাকে যদি টাকার গোঁ, চৈত্র মাসে ভুট্টা রো।

টাকা রোজগারের ইচ্ছে থাকলে চৈত্র মাসে ভুট্টার চাষ শুরু করো। ভালো ফলন পাবে। প্রচুর টাকা রোজগার হবে।

* *

—কচু চাষ—

নদীর ধারে পুঁতলে কচু, তা হয় তিন হাত উঁচু।

কচু গাছ নদীর ধারে পুঁততে হয়। তাহলে কচু বেশ বড় হয়। কচু গাছ বেশি বড় হওয়া মানেই লাভ বেশি।

* * *

কচুবনে যদি ছড়াস ছাই।
খনা বলে তার সংখ্যা নাই॥

প্রচুর পরিমাণে কচু (বেশি ফলন) পেতে হলে কচু বনে প্রচুর পরিমাণে উনুনের **ছাই** ছড়াতে হবে।

* *

—হলুদ চাষ—

তাশ পাশা দূরে থোও, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে হলুদ রোও।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে তাস পাশা খেলে সময় নষ্ট করো না। এই দুই মাসেই হলুদ রুয়ে ফেল। খনার বচনের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারবে।

* *

আষাঢ় শ্রাবণে নিড়াবে মাটি,
ভাদ্দরে নিড়ায়ে করগে খাঁটি।

হলুদ পুঁতে দিয়েই চুপ করে বসে থেকো না। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মাটি নিড়িয়ে দিয়ো। ভাদ্র মাসে আবার আগাছা পরিষ্কার করে দিও।

* * *

অন্য নিয়মে পুঁতলে হলদি,
ধরণী বলেন তাতে কি ফল দি।

এই নিয়ম ভিন্ন অন্য নিয়মে হলুদ চাষ করলে ফল পাওয়া যায় না।

*   *   *

—তামাক চাষ—

তামাক বুনো গুড়িয়ে মাটি, বীজ পোঁত গুটি গুটি।

তামাক যদি বুনতে হয় মাটি গুড়িয়ে ধুলোর মতো করে নিতে হয়। তারপর সেই মাটিতে বীজ দেওয়া উচিত।

*   *   *

ঘন করে পুঁতোনা, পৌষের অধিক রেখোনো।

তামাক কখনো ঘন করে বসাবে না। ঘন করে বসালে ফল ভালো হয় না। পৌষের পর আর তামাক রাখা উচিত নয়। রাখলে লাভের চেয়ে লোকসানের সম্ভাবনাই বেশি।

*   *   *

—নারকেল চাষ—

নারকেল গাছে নুন মাটি, শীঘ্র শীঘ্র বাঁধে আঁটি।

নারকেল গাছ নুন মাটি দিলে ফলন বাড়ে। তাড়াতাড়ি ডাবের মুচি দেখা দেয়।

*   *   *

দাতার নারকেল কৃপণের বাঁশ, কমে না বাড়ে বারোমাস।

দান ধ্যান করলে যেমন, যে দান ধ্যান করে তার অর্থ আমদানি বন্ধ হয় না, তেমনি মাঝে মাঝে নারকেল পেড়ে নিলে কোন ক্ষতি হয় না, বরং লাভই হয়। কৃপণ ব্যক্তি পয়সা বাঁচিয়ে যেমন নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করে, তেমনি বাঁশ কেটে না ফেলে বাঁচিয়ে রাখলে আখেরে লাভই হয়।

*   *   *

খনা বলে শুনে নাও, নারকেল মূলে চিটা দাও।
গাছ হয় তাজা মোটা, শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা॥

খনার পরামর্শ হলো, নারকেল গাছের মূলে খড়কুটো ইত্যাদি আগাছা দিলে ফল

ভালো পাওয়া যাবে। এই সারে গাছ তরতাজা হয়ে ওঠে এবং তাড়াতাড়ি ফল ভারে ভারী হয়ে ওঠে।

*　　　*　　　*

—নারকেল ও সুপারি চাষ—

নারকেল বারো সুপারি আট এর ঘন তখনই কাট।

নারকেল গাছ বারো হাত অন্তর লাগাতে হয়। সুপারি গাছ আট হাত অন্তর লাগাতে হয়। এর চেয়ে ঘন করে গাছ লাগালে সে গাছ কেটে ফেলা উচিত। কারণ তাতে ভালো ফল পাবার সম্ভাবনা খুবই কম।

*　　　*　　　*

গো নারকেল নেড়ে পো, আম টুটুবে কাঁঠাল ভো।

নারকেল ও সুপারির চারা একবার নাড়িয়ে পুঁততে পারলে ভালো হয়। তাতে গাছের শক্তি বাড়ে, ফল ভালো হয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আম গাছ বা কাঁঠাল গাছ নাড়িয়ে পুঁতলে তা ভুয়ো হয়। তাতে কোন কোষ জন্মায় না।

*　　　*　　　*

হাতে হাতে ছোঁয় না।
মরা ঝাটি বয় না॥
খনা বলে যখন যায়।
তখন কেন সয় না॥

নারকেল গাছ পুঁততে হলে দেখতে হবে এক গাছের পাতা অন্য গাছের পাতার সঙ্গে যেন ছোঁয়া না লাগে। 'মরা ঝাটি বয় না' অর্থাৎ শুকনো ঝাড় পাতা নারকেল গাছের একদম সহ্য হয় না। তাই নারকেল গাছকে সব সময় পরিষ্কার রাখতে হয় বা রাখা দরকার।

*　　　*　　　*

—সুপারি চাষ—

শোনরে বলি চাষার পো, সুপারি বাগে মান্দা রো।
মান্দার পাতা পড়লে গোড়ে, ফল বাড়ে চটপট করে॥

সুপারি বাগানে মান্দার গাছ পুঁতলে মান্দার পাতার সারে সুপারির ফলন ভালো হয়। গাছ সতেজ ও ফলবতী হয়ে ওঠে।

*　　　*　　　*

—সুপারি, বাঁশ, নারকেল, ওল ও মানের চাষ—

গুয়াতে গোবর বাঁশেতে মাটি।
অফলা নারকেলের শিকড় কাটি॥
গুলেতে কুটি মানেতে ছাই।
এইভাবে চাষ করোগে ভাই॥

সুপারিতে গোবর সার আর বাঁশে মাটি দিলে ভালো হয়। অফলা নারকেল গাছের শিকড় কেটে দিলে ফল ধরে। ওলের গোড়ায় খড়কুটি ও মাঠির গোড়ায় ছাই দিলে, ওল মান ভালো হয়।

*   *   *

—বাঁশ চাষ—

ফাগুনে আগুন চৈত্রে মাটি, বাঁশ বলে শীঘ্র শীঘ্র উঠি।

বাঁশ গাছের যেসব পাতা শুকিয়ে মাটিতে পড়ে সেগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিতে হয় ফাল্গুন মাসে। চৈত্র মাসে বাঁশের মূলে মাটি দিতে হয়! এভাবে বাঁশের যত্ন করতে পারলে বাঁশ তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে।

*   *   *

শোন রে বাপু চাষার ব্যাটা, বাঁশ ঝাড়ে দিও ধানের চিটা।
চিটা দিলে বাঁশের গোড়ে, দুই কুড়া ভুঁই বাড়বে ঘাড়ে॥

বাঁশ ঝাড়ে যদি ধানের কুটো সার হিসেবে দেওয়া যায়, তাহলে বাঁশ চড় চড় করে বেড়ে উঠবে, কারণ ওটাই বাঁশের উপযুক্ত সার।

*   *   *

—তাল চাষ—

এক পুরুষে রোয় তাল,
পর পুরুষে করে পাল।
তাল পড়ে যে সে খায়,
তিন পুরুষে ফল পায়।

বাবা তাল গাছ লাগালে ছেলের হাতে সেই গাছ বড় হয়। তাতেই তাল ধরে। সেই তাল পরবর্তী কয়েক পুরুষ ভোগ করে।

*   *   *

বারো বছরে ফলে তাল, যদি না লাগে গরুর লাল।

গরুর লালা লাগলে তাল গাছের পাতা নষ্ট হয়। সেজন্য বাচ্চা তালগাছ সাবধানে যত্ন করে রাখতে হয়। এভাবে যত্ন করে রাখলে বারো বছর পরে তালগাছে ফল পাওয়া যায়।

*　　　　*　　　　*

—আম কাঁঠাল চাষ—

হাত বিশেক করি ফাঁক, আম কাঁঠাল পুঁতে রাখ।
ঘন ঘন বসে না, ফল তাতে হবে না ॥

কুড়ি হাত অন্তর আম, কাঁঠাল গাছ লাগাতে হয়। গাছ ঘন করে পুঁতলে ফল হবে না।

*　　　　*　　　　*

অঘ্রাণে যদি না বৃষ্টি পড়ে, গাছে কাঁঠাল নাহি ধরে।

অঘ্রাণ মাসে বৃষ্টি না হলে কাঁঠালের ফলন ভালো হয় না।

*　　　　*　　　　*

—মূলা ও আখ চাষ—

খনা বলে শুন শুন, শরতের শেষে মূলা বুন ॥
মূলার ভুঁই তূলা, কুশরের ভুঁই ধুলো ॥

মুলা বোনার উপযুক্ত সময় শরৎকালের শেষ। মূলা চাষের জমি তুলোর মতো হালকা, ফুরফুরে হাওয়া দরকার। আখ বসাবার মাটি ধুলোর মতো হওয়া দরকার।

*　　　　*　　　　*

—রাই, সরষে কার্পাস ও পাট চাষ—

ঘন সরিষা পাতলা রাই, নেঙ্গে নেঙ্গে কাপাস যাই ॥
কাপাস বলে কোষ্টা ভাই, জ্ঞাপি পানি যেন না পাই ॥

সরষে অপেক্ষা রাই পাতলা করে বোনা দরকার। কার্পাস গাছ এমন ভাবে বুনতে হবে যাতে কার্পাস তুলতে হলে ডিঙিয়ে যাওয়া যায় এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার্পাস তোলা যায়। একই জমিতে কার্পাস ও পাট বুনতে নেই। কারণ কার্পাস গাছে চেষ্টার জল লাগলে গাছ নষ্ট হয়ে যায়।

*　　　　*　　　　*

মানুষ মরে যাতে, গাছলা সারে তাতে।
পচলা সরায় গাছলা সারে, গোঁধলা দিয়ে মানুষ মরে ॥

খনার কথা হলো, প্রকৃতির কি অদ্ভুত নিয়ম দেখ, গোবরের পচা দুর্গন্ধ নাকে গেলে মানুষের রোগ ধরে যায়। অথচ ঐ পচা গোবরই বিভিন্ন গাছের শক্তির উৎস।

* * *

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি, তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি।
ঘরে বসে পুছে বাত, তার ঘরে হা-ভাত ॥

যে লোক নিজে খেটে জমির শ্রমিকদের খাটাতে অভ্যস্ত সে পূর্ণ ফল লাভ করে। যে লোক নিজে না খাটলেও মাঠের শ্রমিকদের খাটায় ও নিজের কাজের তত্ত্বাবধান করে সে অর্ধেক লাভবান হয় আর যে লোক নিজে কাজ করে না, উপরন্তু কাজের তত্ত্বাবধান করতেও পারে না, তার পক্ষে সামান্যতম ফল লাভ করা সম্ভব হয় না।

* * *

দিনে রোদ রাতে জল, তাতে বাড়ে ধানে বল ॥

বর্ষাকালে অধিকাংশ দিন যদি দিনের বেলায় রোদ এবং রাতে বৃষ্টি হয়, তাহলে ধান গাছের তেজ খুব বাড়ে। ফলন ভালো হয়।

* * *

যে বার গুটিকাপাত সাগর তীরেতে।
সর্বদা মঙ্গল হয় কহে জোতিষেতে ॥
নানা শস্যে পূর্ণ এই বসুন্ধরা হয়।
খনা কহে মিহিরকে নাহিক সংশয় ॥

যে বছর সমুদ্র তীরে গুটিকাপাতা হয়, সে বছর ধরণী শস্যপূর্ণ হয়।

* * *

বুধ রাজা আর শুক্র মন্ত্রী যদি হয়।
শস্য হবে ক্ষেত্র ভরা নাহিক সংশয় ॥

খনার মতে যে বছর গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানে বুধের স্থান রাজা রূপে এবং শুক্রের স্থান মন্ত্রীরূপে, সে বছর পৃথিবী শস্যে পরিপূর্ণ হয়।

* * *

শোন রে মালী বলি তোরে, কলম রো শাওনের ধারে ॥

শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হলে সে সময় যদি কলমের চারা পোঁতা হয়, তাহলে সে কলম ভালো করে মাটিতে শেকড় চারায়। ঐ গাছে ভালো ফল ফলে।

*   *   *

যদি হয় চৈতে বৃষ্টি
তবে হয় ধানের সৃষ্টি।

চৈত্র মাসে ভালো বৃষ্টিপাত হলে তবে সেবার ধানের ফলন ভালো হয়।

*   *   *

শনি রাজা মঙ্গল পাত্র।
চষ খোঁড় কেবলমাত্র ॥

শনি রাজা ও মঙ্গল মন্ত্রী হলে ভালোমতো কৃষিকাজ করলেও ফসল ভালো জন্মায় না।

*   *   *

কার্তিকের উনো জলে।
দুনো ধান খনা বলে ॥

কার্তিক মাসে অল্প বৃষ্টি ধানের পক্ষে ভালো। তাহলে ফসলও বেশ ভালো হয় অর্থাৎ দুই গুণ ধান উৎপন্ন হয়ে থাকে।

*   *

আষাঢ়ে কাড়ান নামকে।
শ্রাবনে কাড়ান ধানকে ॥
ভাদরে কাড়ান শীষকে।
আশ্বিনে কাড়ান কিসকে ॥

আষাঢ় মাসে বৃষ্টির পর চাষের উপযুক্ত সময়ের পর যে সব চাষীর ধানগাছের চারা জন্মায় না বা হয় না—অথবা ধানীজমির কাজকর্মও শেষ করা হয়ে উঠে না;—সেই কারণে আষাঢ় মাসে ধান লাগালে অল্প ফলন হয়ে থাকে। বৃষ্টির পর শ্রাবণ মাসে ধান জমিতে লাগালে প্রচুর পরিমাণে ধান (ফলন) পাওয়া যায়। ভাদ্র মাসে ধান লাগালে কেবলমাত্র ধানের শীষই পাওয়া যায়। তাতে ধান (ফলন) হয় না। আশ্বিনে ধান লাগালে একদম ফলন পাওয়া যায় না।

*   *   *

প্রাকৃতিক ও অন্যান্য দুর্যোগ সম্পর্কে খনার বাণী

বাদ দিয়ে বর্ষা, খনার বচন ফসা।
শনি সাত মঙ্গল তিন, আর সব দিন দিন।

বর্ষার সময় বাদ দিয়ে অন্য সময় বৃষ্টি হলে, যদি শনিবার শুরু হয় তবে সাতদিন হয় এবং মঙ্গলবার শুরু হলে তিনদিন চলে। অন্য কোন দিনে বৃষ্টি শুরু হলে তা একদিন করে চলে।

* *

আমে ধান, তেঁতুলে বান।

যে বছর আমের ফলন বেশি হয়, সে বছর ধান ভালো হয়। তেঁতুলের ফলন বেশি হলে বন্যা হয়।

* * *

চৈত্রে কুয়া ভাদ্রে বান, নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান।

যে বছর চৈত্র মাসে কুয়াশা পড়ে এবং ভাদ্র মাসে বন্যা হয়, সে বছর প্রচুর লোকক্ষয় হয়ে থাকে।

* * *

পোষে গরমী বৈশাখে জাড়া।
প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া॥

যে বছর পোষ মাসে গরম ও বৈশাখে ঠান্ডা পড়ে, সে বছর প্রথম আষাঢ়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং শ্রাবণে অনাবৃষ্টি হয়ে থাকে।

* * *

পূর্বেতে উঠিলে কাঁড়, ভাঙা ডোবা একাকার।

বর্ষাকালে পূর্বদিকের আকাশে রামধনু দেখা গেলে প্রচুর বৃষ্টিপাতে খাল বিল সব জলে টৈ টুম্বুর হয়ে যায়।

* * *

পূর্ণ আষাঢ়ে দক্ষিণা বয়, সেই বৎসর বন্যা হয়।

সার। আষাঢ় মাস যদি দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস বইতে থাকে তাহলে সে বছর বন্যা হবেই হবে।

*   *   *

বামুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই যান।

পুরোহিত যেমন দক্ষিণা পেলেই বিদায় হন, তেমনি বাদল ও বানও দখিনা বাতাস পেলেই চলে যায়।

*   *   *

খনা বলে শুনহ বাণী, শ্রাবণ ভাদরে নাইক পানি।
দিনে জল রাতে তারা, এই দেখবে দুঃখের ধারা॥

শ্রাবণ মাসে যদি বৃষ্টি না হয় এবং দিনে বৃষ্টি ও রাতে আকাশ পরিষ্কার থাকে, তাহলে মানুষের দুঃখের আর শেষ থাকে না।

পশ্চিমে ধনু নিত্য খরা, পূর্বে ধনু বর্ষে ধারা।

খনা বলেন, পশ্চিম আকাশে রামধনু উঠলে খরা হয়ে থাকে। কিন্তু পূর্ব আকাশে রামধনু উঠলে অতি বৃষ্টি হয়ে থাকে।

*   *   *

ব্যাঙ ডাকে ঘন ঘন, শীঘ্র বর্ষা হবে জেনো।

ঘন ঘন ব্যাঙ ডাকলে বুঝতে হবে এবার বুঝি বর্ষা নামবে।

*   *   *

পৌষে কুয়া বৈশাখে ফল, যদিন কুয়া তদিন জল।

পৌষ মাসে যে কদিন কুয়াশা পড়ে, বৈশাখ মাসে ঠিক সে কদিনই বৃষ্টি হয়।

*   *   *

ভাদুরে মেঘ বিপরীতে বয়, সেদিনই বৃষ্টি হয়।

ভাদ্র মাসে যদি কোনদিন আকাশে মেঘ থাকে এবং বাতাস বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়, তাহলে সেদিন বৃষ্টি হবেই হবে।

*   *   *

চৈত্র কাঁপে থর থর, বৈশাখেতে ঝড়ে পাথর।
জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফোটে, তবেই জমবে বর্ষা বটে॥

যে বছর চৈত্র মাসে শীত থাকে, বৈশাখে শিলাবৃষ্টি হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে আকাশ পরিষ্কার থাকে, সে বছর প্রবল বৃষ্টিপাত হয়।

*   *   *

বৎসরের শুরুতে যদি ঈশান বয়, হবেই বর্ষা খনা কয়।

বছরের শুরুতে যদি ঈশান কোণ থেকে বাতাস বইতে শুরু করে তাহলে প্রবল বর্ষণের আশঙ্কা থাকে।

*   *   *

দূরে সভা নিকট জল, নিকট সভা রসাতল।

দূরে চাঁদের সভা বসলে খুব শীঘ্র বৃষ্টি হবে বুঝতে হবে। নিকটে চাঁদের সভা বসলে বুঝতে হবে বৃষ্টি হবে না।

*   *   *

খনা বলে শোন চাষা, কার্তিকে পূর্ণিমা কর আশা।
নির্মল মেঘ যদি রাত রবে, রবিশস্য তার ধরণী না সবে ॥

কার্তিক মাসে পূর্ণিমার রাতে আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে অর্থাৎ মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ হলে, রবিশস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

*　　　*　　　*

যদি বর্ষে অঘ্রাণে, রাজা যান মাগনে।

অঘ্রাণ মাসে বৃষ্টি হলে পোকামাকড়ে শস্য নষ্ট করে। রাজস্ব আদায় হয় না। রাজ্যের সর্বত্র অভাব দেখতে পাওয়া যায়।

*　　　*　　　*

যদি বর্ষে পৌষে, কড়ি হয় তুষে।

পৌষ মাসে বৃষ্টি হলে, তুষ বিক্রি করেই প্রচুর টাকা রোজগার হয়।

*　　　*　　　*

যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজা পুণ্য দেশ।

মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হলে প্রচুর রবিশস্য উৎপন্ন হয়। চাষার হাতে টাকা-পয়সা থাকে। মানুষের অভাব থাকে না। প্রজার সুখে থাকে রাজারও শান্তি বিঘ্নিত হয় না।

*　　　*　　　*

মাঘ মাসে বর্ষা দেবা, রাজা ছাড়ে প্রজার সেবা।

খনার এই বচনটি ও ওপরের বচনটির অর্থ এক। শব্দের ব্যবহার শুধু ভিন্ন।

*　　　*　　　*

যদি বর্ষে মকরে, ধান্য হবে টেকরে।

মাঘ মাসে বৃষ্টি হলে উঁচু জমিতেও প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়।

*　　　*　　　*

যদি বর্ষে ফাল্গুনে, চিনা কাউন দ্বিগুণে।

ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হলে চীনা বীজের ধান প্রচুর উৎপন্ন হয়।

*　　　*　　　*

যদি হয় চৈত্রে বৃষ্টি, তবে হয় ধানের সৃষ্টি।

চৈত্র মাসে বৃষ্টি হলে ধানের ফসল খুব ভালো হয়।

* * *

জ্যৈষ্ঠে শুকো, আষাঢ়ে ধারা।
শস্যের ভার না সহে ধরা॥

জ্যৈষ্ঠ মাস যদি শুকনো যায় এবং আষাঢ় মাসে যদি বর্ষা হয়, তাহলে শস্যের ফলন খুব ভালো হয়।

* * *

জ্যৈষ্ঠ মাসে আষাঢ়ে ভরে,
কাটিয়া মাটিয়া ঘর করে॥

জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি না হয়ে আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হলে ধানের ফলন খুব ভালো হয়।

* * *

কর্কট ছরকট, সিংহের শুখা, কন্যা কানে কান।
বিনা বায়ে তুলা বর্ষে, কোথা রাখবি ধান।

শ্রাবণ মাসে (কর্কট) যদি অতিবৃষ্টি হয়, ভাদ্র মাসে (সিংহ) শুখা হয়, আশ্বিনে (কন্যা) যথেষ্ট বৃষ্টি হয় এবং কার্তিকে (তুলা) বাতাস বওয়ার পরিবর্তে অল্প অল্প বৃষ্টি হয়, তাহলে প্রচুর পরিমাণে ধান জন্মায়।

* * *
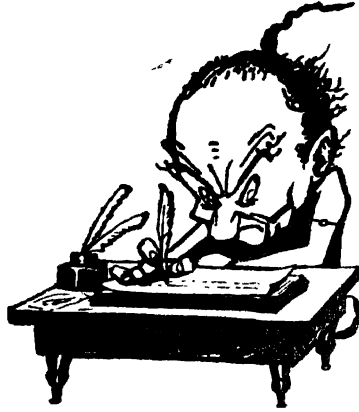
কি কর শ্বশুর লেখাজোখা, মেঘেই থাকে জলের রেখা।
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা, মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে ঘা।
চাষাকে বলো বাঁধতে আল, আজ না হয় হবে কাল॥

অতি বুদ্ধিমতী খনা তার শ্বশুরকে বলছে, শ্বশুরমশাই, মিছিমিছি গণনা করার প্রয়োজন নেই। মেঘ দেখলেই জলের লক্ষণ বুঝতে পারা যায়। যদি মেঘের আকৃতি 'কোদাল-কুড়ুলে' অর্থাৎ খানা খানা হয়, তাহলে বুঝতে হবে তাড়াতাড়ি বৃষ্টি হবে। অবশ্য এরই সঙ্গে মাঝে মাঝে হালকা বৃষ্টি হবারও প্রয়োজন আছে। প্রকৃতিতে এই লক্ষণ দেখেই কৃষকের উচিত চাষের কাজে হাত দেওয়া, জমিতে আল দেওয়া। আজ যদি বৃষ্টি না হয় তবে কাল হবেই হবে।

* *

আষাঢ় নবমী শুকুল পাখা, কি কর শ্বশুর লেখাজোখা।
যদি বর্ষে মুষলধারে, মধ্য সমুদ্রে বগা চরে।
বর্ষে যদি ছিটে ফোঁটা, পর্বতে হয় মীনের ঘটা।
যদি বর্ষে ঝিমি ঝিমি, শস্যের ভার না সহে মেদিনী।

আষাঢ় মাসের শুক্ল নবমীতে মুষলধারে বৃষ্টি হলে সে বছর অনাবৃষ্টিতে সমুদ্রও শুকিয়ে যায়। যদি সেদিন অল্প বৃষ্টি হয়, তাহলে ভীষণ বর্ষা হয় ও অসংখ্য মাছ জন্মায়। যদি ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি হয় তাহলে প্রচুর ফসল জন্মায়।

* * *

হেসে চাকি বসে পাটে।
শস্য সেবারে না হয় মোটে ॥

আষাঢ় মাসে যদি সূর্য সর্বদা আকাশে থাকে—বিদায় বেলায় হাসিমুখ করে অর্থাৎ সূর্য কিরণ দিয়ে বিদায় নেয় তবে সেই বৎসরে দেশে কোন ফসলের ফলন পাওয়া যাবে না।

*   *   *

বিবাহযোগ্যা নারীর শুভাশুভ লক্ষণ

ধূম্রবর্ণা অধিকাঙ্খী অথবা রোগিনী।
অলোমিকা কিম্বা হয় অধিক লোমিনী ॥
বাচালা অথবা হয় পিঙ্গল বরণী।
নক্ষত্র নামিকা কিম্বা বৃক্ষের নামিনী ॥
নদী পক্ষী অহি কিম্বা নামে অন্তগিরি।
ভীষণ নামিকা কিম্বা দূতী নামধারী ॥
এসব বিবাহযোগ্যা কদাচ না নয়।
জ্যোতিষ বচন অর্থে এইরূপ কয়।

যেসব কন্যার বর্ণ ধূম্রবর্ণ, যে কন্যা দীর্ঘাঙ্গী, লোম শূন্য বা অধিক লোমাবৃতা, বাচাল, পিঙ্গলবর্ণা, নক্ষত্রের নামে যার নাম, বৃক্ষ ও নদীর নামে যার নাম, যার নাম পাখি ও সাপের নামে রাখা হয়েছে, অন্তগিরি ও ভীষণা যার নাম, দূতী নামধারী—এই সব মেয়েদের বিয়ে করা উচিত নয়। কারণ এইসব লক্ষণযুক্তা মেয়েরা কুলক্ষণা বলে পরিচিত।

*   *   *

তার মধ্যে বিবাহ কর্তব্য হবে যেই।
জ্যোতিষ প্রমাণ মতে লিখিলাম এই ॥
গঙ্গা কি যমুনা বা গোমতী সরস্বতী।
বৃক্ষ নামেতে হয় তুলসী মালতী ॥

নক্ষত্র নামেতে হয় রেবতী অশ্বিনী।
অথবা রোহিনী হয় অশুভ নাশিনী॥

আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে নদী, বৃক্ষ ও নক্ষত্রের নামে যে নারীর নাম তাকে বিয়ে করা উচিত নয়। কিন্তু ঐসব নামের মধ্যে গঙ্গা, যমুনা, গোমতী, সরস্বতী এই কয়টি নদীর নাম; তুলসী ও মালতী এই দুটি বৃক্ষের নাম এবং রেবতী, অশ্বিনী ও রোহিনী এই তিনটি নক্ষত্রের নামে নাম হলে কোন দোষ হয় না। এই সব নামের মেয়েদের দ্বারা অশুভের বিনাশ হয়ে থাকে।

* * *

ট্যারা চক্ষু হয় চঞ্চল লোচনা।
দুঃশীলা অথবা হয় পিঙ্গলা বরণা॥
হাস্যকালে গণ্ডস্থলে কূপ হয় যার।
বন্ধকী জানিহ তারে কহিলাম সার॥

যে কন্যার চক্ষু দুটি ট্যারা ও চঞ্চল, সে কন্যা চরিত্রহীন ও পিঙ্গলবর্ণা এবং হাসলে যে কন্যার গালে টোল পড়ে সে অবশ্যই বন্ধ্যা হয়।

* * *

শ্যামাঙ্গী সুকেশী তনু লোমরাজি কান্তা।
সুভুরুশীলা কিম্বা সুগতি সুদন্তা॥
মধ্য ক্ষীণা যদি হয় পঙ্কজনয়নী।
কুলহীনা হইলেও বরেষ্টদায়িনী॥
কুদন্তা অথবা হয় অধিক ব্যাপিকা।
পিঙ্গল লোচনা অঙ্গ যদি সলোমিকা॥
মধ্য পুষ্টা যদি হয় রাজার বালিকা।
কুলে শ্রেষ্ঠা হৈলে তবু অবিষ্টদায়িকা॥

যে কন্যা শ্যামা, চুল সুন্দর, শরীরে অল্প লোম, মনোহারিণী ও সুন্দরকান্তি; ভুরু দুটি সুন্দর; যে কন্যা সুশীলা, সুন্দর গতিসম্পন্না, সুদর্শনা ও পদ্মের মতো চক্ষুবিশিষ্টা, যার কটি ক্ষীণ, সেই রমণী কুলহীনা হলেও শুভদায়ী হয়। সেজন্য এরূপ লক্ষণযুক্তা কন্যাকেই বিয়ে করা উচিত। যে কন্যা ধৃষ্টা, দন্তশ্রী হীনা, পিঙ্গল চক্ষুবিশিষ্ট, যার পদদ্বয় ও অঙ্গযষ্টি লোমে আবৃত, সে কন্যা কুলগুণে উচ্চ হলেও বিবাহের যোগ্য নয়। তাকে কুলক্ষণা বলেই জানতে হবে।

* * *

গ্রহ সঞ্চারের ফল

রবি

জন্মস্থ হইলে রবি শত্রু বৃদ্ধি করে।
দ্বিতীয়ে হইলে বন্ধু বিচ্ছেদ তৎপরে।
চতুর্থে ক্রমিক দুঃখ তৃতীয়ে যে আয়।
পঞ্চমে থাকিলে রবি মিত্র হানি কয়॥
ষষ্ঠে ধনলাভ হয়, অনিষ্ট সপ্তমে।
অষ্টমেতে অপমান শোক যে নবমে॥
দশমে প্রাধান্য আর হয় কার্যসিদ্ধি।
একাদশে রবিকরে সৌভাগ্যের বৃদ্ধি।
দ্বাদশেতে বধ আর বন্ধনের ভয়।
রবির সঞ্চার ফল জ্যোতিষেতে কয়॥

রবি জন্মস্থ থাকলে শত্রু বৃদ্ধি হয়, দ্বিতীয়ে থাকলে বন্ধু বিচ্ছেদ, তৃতীয় ঘরে থাকলে আয়, চতুর্থ ঘরে থাকলে দুঃখ, পঞ্চমে মিত্রহানি হয়, ষষ্ঠ ঘরে থাকলে ধনলাভ ও কার্যসিদ্ধি হয়, সপ্তমে থাকলে অনিষ্ট, অষ্টমে অপমান, নবমে হয় শোক, দশমে প্রাধান্য ও কার্যসিদ্ধি হয়, একাদশে সৌভাগ্য এবং দ্বাদশ ঘরে থাকলে মৃত্যু ও বন্ধন ভয় থাকে।

* * *

চন্দ্র

মিষ্টান্ন ভোজন চন্দ্র জন্মস্থ থাকিলে
ক্লেশ দেন শশধর দ্বিতীয় হইলে॥
তৃতীয়েতে শত্রুনাশ করে শশধর।
চতুর্থে চন্দ্রের ফলে পীড়য়ে উদর।
পঞ্চমে সৌভাগ্য ষষ্ঠে লাভ ধন ধান্য।
সপ্তমেতে বধ আর স্ত্রী লাভের জন্য॥

অষ্টমেতে চক্ষুর পীড়া নবমেতে ত্রাস।
দশমে কার্যসিদ্ধি না করে নৈরাশ॥
একাদশে নাম কিংবা হয় সুখোদয়।
দ্বাদশে শশধরে সদা করে ভয়॥

জন্মস্থানে চন্দ্র হলে মিষ্টান্ন ভোজন হয়। সেভাবে দ্বিতীয়ে থাকলে দুঃখ, তৃতীয় ঘরে থাকলে শত্রুনাশ, চতুর্থে উদরপীড়া, পঞ্চম ঘরে থাকলে সৌভাগ্যপ্রাপ্তি, ষষ্ঠে ধনধান্য লাভ, সপ্তমে হয় স্ত্রী লাভ ও বুধ অষ্টমে চোখের রোগ হয়ে থাকে, নবমেতে ভয়, দশম ঘরে কার্যসিদ্ধি, একাদশে মান বা সুখ এবং দ্বাদশে থাকলে ভয় হয়ে থাকে।

*　　*　　*

মঙ্গল

শুনহ সকল　　ক্ষোণী পুত্রফল
　জ্যোতিষেতে যাহা কয়।
জন্মস্থ রাশিতে　　যদি ক্ষিতি সুতে
　থাকিলে শত্রুর ভয়॥
দ্বিতীয়ে থাকিলে　　ধনক্ষয় বলে
　তৃতীয়ে কার্যের সিদ্ধি।
ক্ষিতিজ চতুর্থে　　জ্যোতিষের মতে
　থাকিলে শত্রুর বৃদ্ধি॥
পঞ্চমে মরণ　　ষষ্ঠে বৃদ্ধি ধন
　সপ্তমেতে শোক করে।
থাকে অষ্টমেতে　　অস্ত্রাঘাত তাতে
　ব্যক্ত আছে চরাচরে॥
নবম মঙ্গলে　　কার্যহানি বলে
　ইহাতে নাহিক আন।
মহীজ দশেতে　　থাকিলে ইহাতে
　মাত্র সে সুখ্যাতি পান॥

একাদশে রয় ধরণী তনয়

নানা সুখ তাতে জানি।

দ্বাদশে মরণ এই বিবরণ

জ্যোতিষ প্রমাণে মানি॥

জন্মস্থ মঙ্গল থাকলে শত্রুভয়, দ্বিতীয়ে ধনক্ষয়, তৃতীয়ে কার্যসিদ্ধি হয়, চতুর্থে শত্রু বৃদ্ধি, পঞ্চমের ঘরে থাকলে মৃত্যু, ষষ্ঠে ধনলাভ, সপ্তমে শোক, অষ্টমে অস্ত্রাঘাত, নবমে কার্যহানি, দশম ঘরে সুখ্যাতি, একাদশে নানা সুখ এবং দ্বাদশে থাকলে মৃত্যু হয়ে থাকে।

* * *

বুধ

জন্মস্থ থাকিলে বুধ করায় বন্ধন।

শাস্ত্রে বলে দ্বিতীয়ে থাকিলে দেন ধন॥

অপমান তৃতীয়ে চতুর্থে কার্যসিদ্ধি।

পঞ্চমেতে দুঃখ হয় বুঝহ সুবুদ্ধি॥

ষষ্ঠে স্থান লাভ যে সপ্তমে পীড়া দেহে।

ধনলাভ করে বুধাষ্টমে যদি রহে॥

নবমে বৃহৎ পীড়া সুখ হয় দশে।

একাদশে ধন আর ধৈর্য যে দ্বাদশে॥

বুধ জন্মস্থ থাকলে বন্ধন, দ্বিতীয়ে থাকলে ধন, তৃতীয় গৃহে থাকলে অপমান, চতুর্থে কার্যসিদ্ধি, পঞ্চমে দুঃখ, ষষ্ঠে ভূমিলাভ, সপ্তমে থাকলে পীড়া, অষ্টমে ধনলাভ, নবমে থাকলে ভীষণ পীড়া, দশমে থাকলে সুখ, একাদশে অর্থ এবং দ্বাদশে থাকলে ধৈর্যসম্পন্ন হয়।

* *

বৃহস্পতি

বৃহস্পতি জন্মস্থ থাকিলে হয় ভয়।

দ্বিতীয়ে অতুলৈশ্বর্য তৃতীয়ে ক্লেশ কয়॥

বুদ্ধিনাশ করে গুরু চতুর্থে থাকিলে।
পঞ্চমে পরম সুখ জ্যোতিষেতে বলে॥
অশুভদায়ক ষষ্ঠে যদি রহে গুরু।
সপ্তমেতে রাজপূজা এ ফল সুচারু॥
সুরাচার্য অষ্টমে অশেষ ধন নাশ।
নবমেতে ধন বৃদ্ধি আছয়ে নির্যাস॥
বৃহস্পতি দশমে প্রণয়ভঙ্গ কয়।
একাদশে স্থান, মান, ধনলাভ হয়॥
পীড়া করে দ্বাদশে গুরুতে সুনিশ্চয়।
গুরু ফলাফল এই জ্যোতিষেতে কয়॥

জন্মস্থ বৃহস্পতি থাকলে ভয়, দ্বিতীয়ে অতুল ঐশ্বর্য, তৃতীয়ে ক্লেশ, চতুর্থে বুদ্ধিনাশ হয়, পঞ্চমে মহাসুখ, ষষ্ঠে অশুভ, সপ্তমে রাজপূজা লাভ হয়, অষ্টমে বহু ধন ক্ষয় হয়, নবমে থাকলে ধনবৃদ্ধি, দশমে প্রণয় ভঙ্গ, একাদশে মান ও ধনলাভ এবং দ্বাদশে থাকলে পীড়া হয়ে থাকে।

*

শুক্র

জন্মস্থ হইলে শুক্র শত্রু করে ক্ষয়।
ধনলাভ দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে সুখ হয়॥
ধনভোগ চতুর্থে পঞ্চমে লাভ পুত্র।
ভৃগুর নন্দন করে ষষ্ঠে বৃদ্ধি শত্রু॥
সপ্তমেতে শোক কার্যসিদ্ধি যে অষ্টমে।
নানা বস্ত্র লাভ করে থাকিলে নবমে॥
অশুভ ভার্গব হয় দশমে থাকিলে।
একাদশে অধিকন্তু ধন লাভ বলে॥
দ্বাদশেতে ভৃগু করে পরমায়ু বৃদ্ধি।
ভার্গবের ফলাফল এই শাস্ত্রসিদ্ধি॥

শুক্র জন্মস্থ থাকলে শত্রুক্ষয় হয়, দ্বিতীয় গৃহে থাকলে ধনলাভ, তৃতীয়ে সুখ,

চতুর্থে থাকলে ধনভোগ, পঞ্চমে পুত্রলাভ হয়, ষষ্ঠ শত্রু বৃদ্ধি, সপ্তমে শোক হয়ে থাকে, অষ্টমে কার্যসিদ্ধি, নবমে নানা বস্ত্র লাভ হয়, দশমে থাকলে অশুভ, একাদশে ধনলাভ এবং দ্বাদশে পরমায়ু বেড়ে থাকে।

*　　　*　　　*

শনি

জন্মস্থ রাশিতে বাস　　　শনি করে বিত্তনাশ
মানসের কষ্ট সে দ্বিতীয়ে।
তৃতীয়ে শনির ভাব　　　শত্রুনাশ ধনলাভ
ফলাফল দেখহে বুঝিয়ে॥
চতুর্থে শত্রুর বৃদ্ধি　　　পাঁচে হয় পুত্র বৃদ্ধি
ষষ্ঠে সর্বকার্যে সিদ্ধি কয়।
বহু দোষ সপ্তে কহে　　　অষ্টমেতে পীড়া দেহে
নবমেতে করে অর্থ ক্ষয়॥
সুখ্যাতি দশমে শনি　　　প্রমাণেতে অনুমানি
নিগূঢ়ার্থ জ্যোতিষ বচন॥
একাদশে বহু ধন　　　লাভ হয় শাস্ত্রে কন
দ্বাদশেতে অনর্থ ঘটন॥

জন্মস্থ শনি থাকলে বিত্তনাশ হয়, দ্বিতীয়ে থাকলে মনঃকষ্ট, তৃতীয় গৃহে থাকলে শত্রুনাশ ও ধর্মলাভ হয়, চতুর্থে শত্রু বৃদ্ধি, পঞ্চমে পুত্র, সম্পত্তি, ষষ্ঠে থাকলে সব কাজে সিদ্ধি, সপ্তমে বহু দোষ, অষ্টমে পীড়া, নবমে থাকলে অর্থক্ষয়, দশমে সুখ্যাতি, একাদশে বহু ধনলাভ, দ্বাদশে থাকলে অনর্থ ঘটে থাকে।

*　　　*　　　*

রবিবার দোষে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির লক্ষণ

পাঁচ রবি মাসে পায়, ঝরায় কিংবা খরায় যায়।

বছরের কোন মাসে পাঁচটি রবিবার পড়লে সে বছর অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হবেই।

*　　　*　　　*

যাত্রাকাল সম্পর্কে

শূন্য কলসী শুকনা না, শুকনা ডালে ডাকে কা।
যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা, এক পা যেওনা বাপা ॥
খনা বলে এও বেলি, যদি সামনে না দেখি তেলি ॥

কোথাও যাবার সময় যদি শূন্য কলসি, শুকনো নৌকা দেখ, কাকের ডাক শোন বা মাকুন্দ ধোপা এবং তেলি দর্শন করো তাহলে অমঙ্গল আছে জানতে হবে।

ভরা হতে শূন্য ভালো যদি ভরতে যায়।
আগে হতে পিছে ভালো যদি ডাকে মায় ॥

মরা হতে জ্যান্ত ভালো যদি মরতে যায়।
বাঁয়ে হতে ডাইনে ভালো যদি ফিরে চায় ॥

বাঁধা হতে খোলা ভালো মাথা তুলে চায়।
হাসা হতে কাঁদা ভালো যদি কাঁদে বাঁয়।

আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে কোথাও যাবার সময় শূন্য কলসি দেখলে অমঙ্গল হয়। কিন্তু কোন মহিলাকে যদি শূন্য কলসি নিয়ে জল আনতে দেখা যায়, তাহলে সেই শূন্য কলসি দেখলে অমঙ্গল হয় না। যাবার সময় পেছন থেকে কেউ ডাকলে যদিও অমঙ্গল হয়, কিন্তু মা ডাকলে অমঙ্গল না হয়ে মঙ্গলই হয়ে থাকে। যাবার সময় মৃত-দেহ দর্শন অমঙ্গল ঠিকই কিন্তু কোন মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃতদেহ দর্শন অমঙ্গল নয়, যাবার সময় বাঁদিকে শেয়াল দেখতে পাওয়া গেলে ফল ভালো হয়। কিন্তু শেয়াল যদি ডান দিকে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে দেখে তাহলে সে ডান দিকে থাকলেও কোন ক্ষতি হয় না। যাতায়াতের সময় যদি ছাড়া গরু দেখা যায় তাহলে ক্ষতি অবশ্যই হবে। কিন্তু সেই গরু যদি চলতে চলতে মুখ তুলে দেখে তাহলে কোন ক্ষতি হয় না। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় কান্নার শব্দ শুনলে অমঙ্গল হয়ে থাকে, কিন্তু কান্নার শব্দ যদি বাঁদিকে শোনা যায় তাহলে ফল অবশ্যই ভালো হবে।

* * *

বারদোষে চৈত্র মাসের ফল

মধু মাসে প্রথম দিবসে হয় যে সেবার।
রবি চোষে মঙ্গলে বর্ষে দুর্ভিক্ষ হয় বুধবার ॥
সোম শুক্র গুরুবার। পৃথিবী না সহে শস্যের ভার ॥
পাঁচ শনি পায় মীনে। শকুনি মাংস না খায় ঘৃণে ॥

চৈত্র মাসের প্রথম তারিখ যদি রবিবার হয়, তাহলে সে বছর অনাবৃষ্টি ঘটে থাকে। আর যদি মঙ্গলবার চৈত্র মাসের প্রথম দিন হয় তাহলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। মাসের প্রথম দিন বুধবার হলে দুর্ভিক্ষ হয়ে থাকে। মাসের প্রথম দিন সোম, শুক্র বা বৃহস্পতিবার হলে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়। চৈত্র মাসে পাঁচটি শনিবার পড়লে মড়কের সম্ভাবনা হয়ে থাকে।

* * *

শনির অবস্থান ভেদে চৈত্র মাসের ফল

মধুমাসের ত্রয়োদশ দিনে যদি রয় শনি
খনা বলে সে বৎসর হবে শস্য হানি ॥

চৈত্র মাসের ত্রয়োদশ দিন যদি শনি অবস্থিত থাকে, তাহলে সে বছর শস্য হানির আশঙ্কা থাকে।

* * *

উপবাসের দিন

শয়ন উত্থান পাশ মোড়া। তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া।
দুই ছেলের জন্ম-তিথি। অষ্টমী নবমী দুটি॥
পাগলের চৌদ্দ পাগলীর আট। এই নিয়ে কাল কাট।
ইহাও যদি না করতে পারিস। ভগার খাদে ডুবে মরিস॥

উপবাস করতে হলে শয়ন একাদশী, উত্থান একাদশী, পার্শ্ব একাদশী, **ভীম** একাদশী, রামনবমী, জন্মাষ্টমী, শিব চতুর্দশী ও মহাষ্টমী প্রভৃতি দিনে উপবাস করা উচিত। অন্যথায় গঙ্গাস্নান করা উচিত।

*　　　*　　　*

ভূমিকম্প ও অতিবন্যা

খনা বলে শুন শুন ওগো পতির পিতা।
ভাদ্র মাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুমাতা।
রাজ্যনাশ, গোনাশ, হয় অগাধ বান॥
হাতে কাঠা গৃহী ফেরে কিনতে না পায় ধান॥

যে বছর ভাদ্র মাসে বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প হয়, সে বছর খুবই ক্ষতি হয়ে থাকে। হামারি, দুর্ভিক্ষ, গোনাশ এতো বেশি হয়ে থাকে যে মানুষেরা দ্বারে দ্বারে ঘুরেও এক মুঠো ভিক্ষে পায় না।

*　　　*　　　*

ফাল্গুন মাসের ফল গণনা

ফাল্গুনে রোহিনী নক্ষত্র যদি থাকে ভাই।
আগামী বৎসর গণে গণে পাই।
সপ্তমী অষ্টমীতে হয় ধান।
নবমীতে বন্যা দশমীতে নির্মূল পাতান।

ফাল্গুন মাসের সপ্তমী, অষ্টমী তিথিতে যদি রোহিনী নক্ষত্র অবস্থান করে তাহলে

প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। নবমী পড়লে বন্যা হয়। দশমী পড়লে মহা সর্বনাশ হয়ে থাকে।

*　　　　*　　　　*

জন্মতিথি প্রকরণ

জন্মবর্ষ মুক্তা যদি জন্মমাসে যস্য ধ্রুবং জন্মতিথি ভবেচ্চ।
ভবন্তি তদ্বৎসমমেব যাবন্নৈরাজ সম্মান সুখানি তস্য॥

জাতকের যে বছর জন্মমাস, জন্মতিথি, জন্মনক্ষত্র যুক্ত হয়, সে বছর জাতক সুখ ও সম্মান পেয়ে থাকে। সে বছর সে রোগহীন অবস্থায় দিন যাপন করে থাকে।

*　　　　*　　　　*

কৃতান্তকুজে রৌবারে যস্য জন্ম দিনং ভবেৎ।
অবৃক্ষযোগ সম্প্রাপ্তৌ বিঘ্নস্তস্য পদে পদে॥
তস্য সর্বোষধি স্নানং গ্রহবি প্রসুরাচর্চনম্।
সৌরারয়োর্দিনে মুক্তা দেয়ানৃক্ষেতু কাঞ্চনম॥

যে বছর জন্ম তিথি শনি মঙ্গলবারে হয় এবং জন্ম নক্ষত্র পায় না সে বছর প্রতিটি কাজে বাধার মুখোমুখি হতে হয়। বাধার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে সর্বোষধি জলে স্নান, দেব পূজা ও গ্রহ পূজা করা একান্ত কর্তব্য। শনি ও মঙ্গলবারে জন্ম তিথির সঙ্গে যদি জন্ম নক্ষত্রের যোগ ঘটে তাহলে মুক্তদান এবং নক্ষত্র যোগ না হলে স্বর্ণ দান করা উচিত।

*　　　　*　　　　*

স্নানার্থ সর্বোষধি

মুরা মাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ম।
শঠি, চম্পক, মুখণ্ড সর্ব্বোষধিগণ স্মৃতঃ॥

মুরা মাংসী, জটামাংসী, বচ, কুড়, মুথা, শৈলজ, হরিদ্রা, শঠি, চম্পক, দারুহরিদ্রা প্রভৃতি সর্বোষধি।

*　　　　*　　　　*

জন্মতিথি ব্যবস্থা

যস্মদ্বয়ে জন্মতিথির্যাদি স্যাৎ পূজ্যা তদাজন্ম চ সংযুক্তা চ।

যদি দুটি দিনে জন্মতিথি পড়ে, তাহলে জন্ম নক্ষত্র যুক্ত দিনে জন্মতিথি পুজো করা উচিত। আর যদি দুটি দিনেই জন্ম নক্ষত্র যোগ না থাকে তাহলে পরদিন পুজো করা উচিত।

* * *

পরমায়ু গণনা

কিসের তিথি কিসের বার। জন্ম নক্ষত্র কর সার॥
কি কর শ্বশুর মতিহীন। পলকে আয়ু বার দিন॥

পুত্র বা কন্যা সন্তান যে নক্ষত্রে জন্মাবে তখন থেকে সেই নক্ষত্রের পরিমাণ যা অবশিষ্ট থাকে রাত দিন হিসেবে তার প্রতি পলে ধরে যতো মাস বা বছর হবে—শিশু ততোকাল জীবিত থাকবে।

* * *

নরা গজা বিশে শয়। তার অর্ধেক বাঁচে হয়॥
বাইশ বলদা তের ছাগলা। তার অর্ধেক বরা পাগলা॥

মানুষ এবং হাতি একশো কুড়ি বছর-এর অর্ধেক অর্থাৎ ষাট বছর বাঁচবে। বলদ বাঁচবে বাইশ বছর, তেরো বছর ছাগল এবং ছ বছর পর্যন্ত শূকর জীবিত থাকে।

* * *

জন্মলগ্নে শুভাশুভ নিরূপণ

সূর্য কুজে রাহু মিলে। গাছের দড়ি বন্ধন গলে॥
যদি রাখে ত্রিদশনাথ। তবু সে খায় নিচের ভাত॥

যে লগ্নে জন্ম, সেই লগ্নের সঙ্গে সূর্য ও মঙ্গল ও রাহু মিলিত থাকলে সেই লোকটি গলায় দড়ি দিয়ে মারা যাবে। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তাকে রক্ষা করলেও নিচ জাতির ভাত খেয়ে তাকে জীবন যাপন করতে হবে।

* * *

খনা বরাহেরে বলে কোন লগ্ন দেখ।
লগ্নের সপ্তম ঘরে কোন গ্রহ দেখ ॥
আছে শনি সপ্তম ঘরে। অবশ্য তাহারে খোঁড়া করে ॥
রবি থাকিলে ভ্রমায় ভূখণ্ড। চন্দ্র থাকে ধরে নবদণ্ড ॥
মঙ্গল থাকিলে করে খণ্ড খণ্ড। অস্ত্রাঘাতে যায় তার মুণ্ড ॥
বুধ থাকে বিষয় করায়। গুরু থাকে বহু ধন পায় ॥
লগ্নে আঁকা লগ্নে বাঁকা। লগ্নে থাকে ভানু তনুজা ॥
লগ্নের সপ্তম অষ্টমে থাকে পাপ। মনে জননী পীড়ে বাপ ॥

যার জন্মের লগ্নে শনি সপ্তম ঘরে অবস্থিত থাকে সেই ব্যক্তি খোঁড়া হয়ে থাকে। সেই ভাবে সপ্তম ঘরে রবির অবস্থান হলে সেই ব্যক্তি নানা দেশে উদাসীন হয়ে ভ্রমণ করতে থাকে। চন্দ্র সপ্তম ঘরে থাকলে সেই ব্যক্তি রাজদণ্ড ধারণ করতে সক্ষম হয়। আর যদি সপ্তম ঘরে মঙ্গল থাকেন, তাহলে সেই ব্যক্তির অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হবেই। জন্মলগ্নের সপ্তমে বুধ অবস্থান করলে, সেই ব্যক্তি বহু ধন উপার্জনে সক্ষম হয়ে থাকে। যদি লগ্নের সপ্তম ঘরে গুরু বা শুক্র অবস্থিত থাকে, তাহলে অপরের ধনলাভের সম্ভাবনা থাকে। লগ্নে শনি অবস্থান করলে কখনো ভালো কখনো মন্দ ফল লাভ হয়। রাহু বা কেতু ইত্যাদি পাপ গ্রহ যদি লগ্নের সপ্তমে বা অষ্টমে অবস্থান করে তাহলে ঐ ব্যক্তির মা মারা যায় এবং বাবা রোগাক্রান্ত হতে থাকে।

* * *

অগ্র পশ্চাৎ মরণ গণনা

অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা।
নামে নামে করি সমতা ॥
তিন দিয়ে হবে আর।
তাহে মরা বাঁচা জ্ঞান ॥
একে শূন্য মরে পতি।
দুই রহিলে মরে যুবতী ॥

স্বামী স্ত্রীর নামের অক্ষরগুলির সংখ্যাকে দ্বিগুণ করে যে কয়টি মাত্রা তার মধ্যে থাকবে, তার সংখ্যাকে চারগুণ করতে হয়। পরে তিন দিয়ে ঐ চতুর্গুণ সংখ্যাকে ভাগ করতে হয়। এবারে ভাগশেষ যদি এক অথবা শূন্য হয়, তাহলে স্বামীর মৃত্যু আগে হবে এবং ভাগশেষ দুই হলে স্ত্রীর মৃত্যু আগে হবে।

উদাহরণ : ধরা যাক স্বামীর নাম 'হীরুলাল' এবং স্ত্রীর নাম 'সত্যবতী'। হীরুলাল নামটিতে চারটি অক্ষর এবং সত্যবতী নামটিতে চারটি অক্ষর। মোট আটটি অক্ষর। একে দুই দিয়ে গুণ করলে হবে ষোল। 'হীরুলাল' নামটিতে আছে দুটি মাত্রা এবং 'সত্যবতী' নামটি দুটি মাত্রা। মোট মাত্রা চারটি। এই মোট মাত্রাকে চার দিয়ে গুণ করলে হবে ষোল। অক্ষর ও মাত্রার গুণফলকে একত্র করলে যোগফল হবে বত্রিশ। উক্ত যোগফলকে তিন দিয়ে ভাগ করলে অবশিষ্ট থাকবে দুই। এক্ষেত্রে তাহলে স্ত্রীর মৃত্যু আগে হবে।

* * *

গর্ভস্থ সন্তান গণনা

বানের পেটে দিয়ে বান। পেটের ছেলে গণে আন।
নামে মাসে করি এক। আটে হরে সন্তান দেখ
এক তিন থাকে বান। তবে নারীর পুত্র জান।
দুই চারি বা থাকে ছয়। অবশ্য তার কন্যা হয়।
থাকিলে শূন্য বা সাত। অবশ্য হয় গর্ভপাত।

বাণের পিঠে দিয়ে বাণের অর্থ হলো পাঁচের পিঠে পাঁচ অর্থাৎ পঞ্চান্ন সংখ্যা। এই সংখ্যার সঙ্গে যে গর্ভধারিণীর সন্তান গণনা করতে হবে তার নামের অক্ষর সংখ্যা এবং গর্ভ যতো মাসের সেই মাসের সংখ্যা নির্ভুলভাবে একত্রে যোগ করতে হবে। এই মোট সংখ্যাকে আট দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগের শেষে যদি পাঁচ অবশিষ্ট থাকে তাহলে পুত্র হবে এবং দুই চার বা ছয় অবশিষ্ট থাকলে কন্যা হবে। ভাগশেষ যদি শূন্য বা সাত অবশিষ্ট থাকে তাহলে গর্ভিনীর গর্ভপাত হবে।

* * *

অন্য মতে

যত মাসের গর্ভ নারীর নাম যত অক্ষর।
যত জনে শুনে তাহে অংক দিয়া এক কর ॥

সাতে হরি চন্দ্র নেত্র বান যদি রয়।
সমে পুত্র, পরে কন্যা জানিবে নিশ্চয়॥

গর্ভিনীর নামের অক্ষর সংখ্যার সঙ্গে যতো মাসের গর্ভ ততো মাস এবং গণনার সময় যতজন সেখানে উপস্থিত থাকবে ততোজন ও অতিরিক্ত দুই যোগ করতে হবে। এই যোগফলকে সাত দিয়ে ভাগ করলে এক তিন কিংবা পাঁচ ভাগশেষ থাকলে পুত্র হবে। ভাগশেষ অন্য সংখ্যা থাকলে কন্যা হবে।

অন্য মতে

গ্রাম গর্ভিনী ফলে যুতা। তিন দিয়ে হর পুতা॥
এক সুত, দুইয়ে সুতা। শূন্য থাকিলে গর্ভ মিথ্যা॥
একথা যদি মিথ্যা হয়। সে ছেলে তার বাপের নয়॥

যে গ্রামে গর্ভধারিণী নারীর বাস সেই গ্রামের নামের অক্ষরের সঙ্গে গর্ভিনীর নামের

অক্ষর সংখ্যা এবং প্রশ্নকর্তার পছন্দ অনুযায়ী কোন একটা ফলের নামের অক্ষর সংখ্যা যোগ করতে হবে। এই যোগফলের সমষ্টিকে তিন দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ যদি এক থাকে তাহলে পুত্র হবে, ভাগ শেষ দুই থাকলে কন্যা হবে এবং ভাগ শেষ শূন্য থাকলে গর্ভ নষ্ট হবে।

* * *

আরও একটি মত

নামে মাসে করি এক। তার দ্বিগুণ করে দেখ ॥
সাতে পুরি আটে হরি। সমে পুত্রে বিষমে নারী ॥

গর্ভিনীর নামের অক্ষর সংখ্যার সঙ্গে গর্ভ মাসের সংখ্যা যোগ করে সেই যোগফলকে দ্বিগুণ করতে হবে। দ্বিগুণ সংখ্যার সঙ্গে সাত যোগ করে যোগফলকে আট দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগ শেষ জোড় সংখ্যা হলে পুত্র হবে এবং বিজোড় সংখ্যা হলে কন্যা হবে।

* * *

জন্মনক্ষত্রে যাত্রা নিষিদ্ধ

জন্মেতে জন্মমাসে বা যে গচ্ছেদষ্টমে বিধৌ।
আয়ুক্ষয় মবাপ্নোতি ব্যাধিঞ্চ বধবন্ধনম।

জন্ম নক্ষত্রে জন্ম মাসে, অষ্টম চন্দ্রে যে মানুষ যাত্র করে তার আয়ু ক্ষয়, রোগ ভয় এবং তাকে নানা রকমের বাধার মুখোমুখি হতে হয়।

* * *

স্পন্দন দ্বারা ভাগ্য নিরূপণ

১। মাথা কাঁপলে রাজদ্বারে সম্মান লাভ হয়।
২। শরীরের ডান দিক নাচলে বা কাঁপলে সুখ এবং বাঁ দিক নাচলে লাভের সম্ভাবনা থাকে।
৩। কপাল কাঁপলে ঐশ্বর্য লাভের সম্ভাবনা থাকে।
৪। ডান চোখ নাচলে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় ও অর্থ প্রাপ্তি ঘটে।

৫। বাঁ চোখ নাচলে অর্থনাশ, রাজ ভয় ও বিরোধ বিতর্ক ঘটে থাকে।

৬। ডান দিকের চোখের নিচের অংশ কাঁপলে কষ্ট ভোগ করতে হয়।

৭। ডান দিকের চোখের ওপরের অংশ কাঁপলে সুখলাভ হয়।

৮। নাকের ডান দিক কাঁপলে জ্বর হয়।

৯। নাকের বাঁ দিক কাঁপলে অশুভ সংবাদ শুনতে হয়।

১০। পুরো নাক কাঁপলে কষ্টকর রোগ বা মৃত্যুর ভয় থাকে।

১১। ঠোঁট কাঁপলে ভর পেট আহার লাভ হয়।

১২। মুখের তালু কাঁপলে প্রচুর লাভ ও বিবাদ হয়ে থাকে।

১৩। বাঁ কান কাঁপলে মাথায় ব্যথা হয়।

১৪। ডান দিকের কান কাঁপলে স্ত্রীলাভ, বিদ্যালাভ ও আত্মীয় বৃদ্ধি হয়।

১৫। দুটি কান কাঁপলে মনের প্রশান্তি ও অর্থলাভ হয়ে থাকে।

১৬। বাঁ কাঁধ কাঁপলে অপমানিত হবার আশঙ্কা থাকে।

১৭। দুটি কাঁধ নড়লে মৃত্যু হয়ে থাকে।

১৮। ডান হাত কাঁপলে শক্তি বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

১৯। বাঁ হাত কাঁপলে বিরোধ হয়।

২০। ডান পা কাঁপলে দূর দেশে যাবার সুযোগ পাওয়া যায়।

২১। বাঁ পা কাঁপলে সুখভোগ হয়।

২২। চুল কাঁপলে চুল পড়ার ভয় থাকে।

২৩। গুহ্য নাচলে মাথা কাটা যায়।

২৪। নাভি নাচলে দুঃস্বপ্ন দেখতে হয়।

২৫। ঊরু নাচলে ভয় হয়।

২৬। কোমর নাচলে আমাশা হবার আশঙ্কা থাকে।

২৭। পিঠ নাচলে শূল রোগের আশঙ্কা থাকে।

২৮। ভগ নাচলে ঋণ ভার বইতে হতে পারে।

২৯। কপাল নাচলে রাজদ্বারে যাবার সুযোগ আসে।

৩০। নারীর পেট নাচলে সন্তান লাভের সূচনা হয়।

৩১। অঙ্গ নাচলে তিক্ত ভোজনের সম্ভাবনা।

৩২। বুক নাচলে গায়ে ব্যথা হয়।
৩৩। মাথা নাচলে মনের সন্তোষ ও বিদ্যা লাভ হয়ে থাকে।

* * *

শরীরে তিলের অবস্থান ভেদে বিচার

১। কপালের ডান দিকে নাকের ওপর তিল থাকলে দৈবধন ও যশলাভের সম্ভাবনা।
২। চোখের নিচে তিল অধ্যাবসায়ীর চিহ্ন।
৩। গর্ভস্থলে তিল আছে এমন মানুষ ধনবান হয় না।
৪। ঠোঁটের নিচে তিল থাকা বিলাসিতা ও প্রেমিক হওয়ার চিহ্ন।
৫। গলায় তিল বিবাহ সূত্রে ধনলাভের পরিচায়ক।
৬। বুকে তিল সুস্থ দেহ ও ভোগের পরিচায়ক।
৭। ডান দিকের পাঁজরায় তিল হীন বুদ্ধির চিহ্ন।
৮। পেটে তিল পেটুক তথা স্বার্থপরতা ও পরিচ্ছন্ন প্রিয়তার লক্ষণ।
৯। হৃদয়ের বিপরীত দিকে তিল নৃশংসতার পরিচায়ক।
১০। ডান হাতের তিল দৃঢ় দেহ, ধৈর্যশীলতার চিহ্ন।
১১। গলায় তিল ধৈর্যশীলতার, বিশ্বাস ও ভক্তির চিহ্ন।
১২। কপালের বাঁ দিকের তিল দুঃখী তথা অসৎ চরিত্রের লক্ষণ।
১৩। কপালের বাঁ দিকের তিল অপব্যায়, নিন্দা, অখ্যাতির পরিচায়ক।
১৪। নাকের ডান দিকের তিল দীর্ঘজীবন, ধনলাভ ও অধ্যাবসায়ের পরিচায়ক।
১৫। ভুরুর নিচের তিল জীবনব্যাপী দুঃখ দারিদ্র্যের পরিচায়ক।
১৬। নাকের বাঁ দিকের তিল নির্ধন, অপব্যয় ও মূর্খতার পরিচায়ক।
১৭। কানের ভেতরে তিল ভাগ্য ও যশের চিহ্ন।
১৮। বুকের মধ্যে লোমযুক্ত তিল বিদ্যা ও কবিত্বশক্তির চিহ্ন।

১৯। ডান পায়ের তিল জ্ঞানের পরিচায়ক।

২০। বাঁ দিকের গালে তিল দাম্পত্য প্রেমের সুখের চিহ্ন

। রাহু-কেতু ॥

রাহু কেতু জন্মস্থ হইলে ধনক্ষয়।
দ্বিতীয়ে প্রবাস বৃদ্ধি প্রমাণেতে কয়।
রাহু-কেতু তৃতীয়ে থাকিলে নানা লাভ।
চতুর্থেতে পীড়া দেন প্রমাণের ভাব ॥
মনঃ পীড়া দাতা হন থাকিলে পঞ্চমে।
ষষ্ঠে মহাসুখ অগ্নি ভয় যে সপ্তমে ॥
অষ্টমে মরণ ভয় লজ্জা যে নবমে।
সুখ্যাতির বৃদ্ধি হয় থাকিলে দশমে ॥
একাদশে থাকিলে হয় অশেষ সুখোদয়।
দ্বাদশেতে অতিকষ্ট জ্যোতিষেতে কয় ॥

জন্মস্থ যদি রাহু-কেতু থাকে তাহলে ধনক্ষয়, দ্বিতীয়ে থাকলে প্রবাস, তৃতীয়ে বহু লাভ, চতুর্থে পীড়া হয়, পঞ্চমে মনে কষ্ট হয়ে থাকে, ষষ্ঠে মহাসুখ, সপ্তমে আগুনের ভয় অষ্টমে মরণ ভয় হয়ে থাকে, নবমে লজ্জা, দশমে সুখ্যাতি বাড়ে, একাদশে প্রচুর সুখলাভ ও দ্বাদশে অত্যন্ত কষ্টভোগ করতে হয়।

* * *

আদ্য ঋতু বিষয়ে খনার বচন

॥ বারফল ॥

রবিতে বিধবা হয়, সোমে পতিব্রতা।
মঙ্গলেতে বেশ্যা, বুধে সৌভাগ্য সংযুতা ॥
বৃহস্পতিবারে পতি লক্ষ্মীযুক্তা হয়।
শুক্রবারে বহু পুত্র চিরজীবী হয় ॥
শনিবারে বন্ধ্যা হয় জ্যোতিষের মতে।
অতএব লিখি যাহা প্রায়শ্চিত্ত তাতে ॥
গো কাঞ্চন ভূমি কিংবা ধান্য দিবে দান।
দোষ শান্তি হয় ইথে এই তো বিধান ॥

কুমারী কন্যা যদি রবিবারে প্রথম ঋতুমতী হয় তাহলে তার বৈধব্য যোগ সূচিত হয়, সোমবারে আদ্য ঋতু হলে সে হয় পতিব্রতা। অনুরূপভাবে মঙ্গলে দেহোপজীবনী, বুধে সৌভাগ্যবতী, বৃহস্পতিতে লক্ষ্মীশ্রী মণ্ডিতা, শুক্রে চিরজীবী বহুপুত্রের জননী, শনিতে বন্ধ্যা হয়। তাই রবি মঙ্গল এবং শনিবারে প্রথমে রজঃস্বলা হলে দোষ কাটানোর জন্য গো-কাঞ্চন ভূমি কিংবা ধান্য দান করে প্রায়শ্চিত্ত করাই বিধেয়।

*   *

ত্রিপূর্বা ভরণী আদ্রা অশ্লেষাতে বিধবা।
মঘা শোক পুনর্বসু বন্ধকী জানিবা ॥
কৃত্তিকা অথবা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হইলে।
দরিদ্র নিশ্চয় ইহা জ্যোতিষেতে বলে ॥

আবার ত্রিপূর্বা ভরণী আদ্রা ও অশ্লেষাতে প্রথম রজ-দর্শন হলে বিধবা, মঘায় হলে শোকাতুরা; পুনর্বসুতে হলে বন্ধ্যাতা সুনিশ্চিত। অনুরূপভাবে কৃত্তিকা কিংবা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হলে দারিদ্র্যের সূচনা করে।

*   *   *

॥ জটুল তত্ত্ব ॥

মুখের বাঁ দিকে জটুল বা জড়ুল সুখ-শান্তির পরিচায়ক। মুখের ডানদিকে জড়ুল থাকলে সুযশ ও অপরিমেয় সুখলাভ। বাঁ কনুইয়ের ওপরে জড়ুল থাকলে দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হতে হয়; আর কনুইয়ের নীচে থাকলে ব্যস্তা হবার সম্ভাবনা। ডানদিকের কনুইয়ের ওপর জড়ুল থাকলে দুশ্চরিত্র হয়ে থাকে; আর কনুইয়ের নীচে থাকলে কামার্ত হয়ে থাকে। বাঁ দিকের বুকে জড়ুল থাকলে পরধন প্রাপ্তি; আর ডানদিকের বুকে থাকলে নির্বোধ ও পাপাসক্ত হয়ে থাকে। চোখে জড়ুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি শাণিত মণীষা এবং দান-প্রবণতার দ্যোতক। হাতের চেটোয় জড়ুল থাকলে তার কোনোদিন ঋণ হয় না এবং স্বদেশে সুখে দিন কাটে। পায়ের নীচে জড়ুল থাকলে অর্থক্ষয় হয়ে থাকে এবং অর্ধ-শিক্ষিতের গ্লানি বইতে হয়। মলদ্বারে জড়ুল থাকলে ব্যাধিগ্রস্ত ও অসুখী হতে হয়। জননেন্দ্রিয়তে জড়ুল থাকলে দুশ্চরিত্র ও রমণাভিলাষী হয়ে থাকে। উরুদেশে জড়ুল পরস্ত্রীর প্রতি লোভ চরিত্রহীনতার নির্দেশক। বাঁ পায়ের চেটোয় জড়ুল অজ্ঞতার নিদর্শন। ডান পায়ের চেটোয় জড়ুল বহু ভ্রমণশীলতার নির্দেশক। দুই কানের যে-কোনো একটিতে জড়ুল থাকলে প্রখর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ও প্রিয়ভাষী হয়ে থাকে। কোমরে বা মাজায় জড়ুল থাকলে ব্যাধিকাতর হয়ে থাকে। নিতম্বে জড়ুল কামুকতার নিদর্শন। পিঠে জড়ুল থাকলে ধীরোদাত্ত দাতা হয়ে থাকে। হাঁটুতে জড়ুল থাকলে তেজী, ভোগী ও পরোপকারী হয়ে থাকে।

* * *

॥ ধনযোগ ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ধনযোগং বিশেষতঃ।
পঞ্চমে তু ভৃগু ক্ষেত্রে তস্মিন্ শুক্রেন সংযুতে।
লাভে শনৈশ্চরযুতে বহু দ্রব্যস্য নায়কঃ॥

জন্মলগ্ন থেকে পঞ্চম স্থানে শুক্র যদি স্বীয় ক্ষেত্রে অবস্থান করে আর একাদশ স্থানে শনির অবস্থিতি জাতকের বৈভব সূচিত করে।

* * *

পঞ্চমে সোমক্ষেত্রে তস্মিন্ সৌম্যযুতো যদি।
লাভে চ চন্দ্রভৌমৌ তু বহুদ্রব্যস্য নায়কঃ॥

বুধের অবস্থিতি যদি পঞ্চম স্থানে আপন ক্ষেত্রে হয় এবং একাদশ স্থানে চন্দ্রমঙ্গল থাকে তাহলে জাতক ঐশ্বর্যবান এবং বহু দ্রব্যের নায়ক হবেন।

* * *

পঞ্চমে তু শনিক্ষেত্রে তস্মিন্ সূর্যযুতো যদি।
লাভে সোমাত্মজস্থেহ বহু দ্রব্যস্য নায়ক॥

পঞ্চমে শনির ক্ষেত্রে রবির অবস্থিতি এবং একাদশে বুধ অবস্থান করলে জাতক ধনী এবং বহু দ্রব্যের নায়ক হয়ে থাকে।

* * *

পঞ্চমে তু শনিক্ষেত্রে তস্মিন্ রবিযুতো যদি।
লাভেই মরেন্দ্র পূজ্যস্থেহ বহুদ্রর্ব্যস্য নায়কঃ॥

লগ্ন থেকে পঞ্চমে স্বীয় ক্ষেত্রে সূর্য এবং একাদশে গুরুর অবস্থিতি জাতকের ঐশ্বর্য এবং বহু দ্রব্যের নায়কত্বের নির্দেশক।

* * *

পঞ্চমে তু শনিক্ষেত্রে তস্মিন্ শনিযুতো যদি।
লাভে ভৌমেন সংযুতে বহু দ্রব্যস্য নায়কঃ॥

লগ্ন থেকে পঞ্চমে স্বীয় ক্ষেত্রে শনি এবং একাদশে মঙ্গল থাকলে জাতক ধনী এবং বহু দ্রব্যের নায়ক হয়ে থাকে।

* * *

পঞ্চমে তু গুরুক্ষেত্রে তস্মিন্ গুরুযুতো যদি।
লাভে তু চন্দ্রভৌমৌ চেদ্বহু দ্রব্যস্য নায়কঃ॥

লগ্ন থেকে পঞ্চমে স্বীয় ক্ষেত্রে গুরুর অবস্থিতি এবং একাদশে চন্দ্র আর মঙ্গলের অবস্থানে জাতক বহুদ্রব্য লাভ করেন।

* * *

ভানুক্ষেত্রগতে তস্মিন্ লগ্নে ভানুঃ স্থিতো যদি।
ভৌমেন গুরুণাযুক্তো দৃষ্ট বা স্বদযুতো ধনী॥

লগ্নে রবি স্বীয় ক্ষেত্রে এবং তাতে মঙ্গল ও গুরুর দৃষ্টি থাকলে জাতক বিত্তশালী হন।

*　　　*　　　*

চন্দ্রক্ষেত্রগতে লগ্নে তস্মিন্ চন্দ্রযুতো যদি।
জীব ভৌমযুতে যস্তু দৃষ্টে জাতো ধনী ভবেৎ॥

চন্দ্র স্বীয় ক্ষেত্রে যদি অবস্থান করে এবং সেই ক্ষেত্রে গুরু-মঙ্গলের যোগ দৃষ্ট হলে জাতক অবশ্যই ধনী হবেন।

*　　　*　　　*

ভৌমক্ষেত্রগতে লগ্নে তস্মিন্ ভৌমযুতো যদি।
সৌম শুক্রার্কজৈর্যুক্তে দৃষ্টে শ্রীমন্নরোভবেৎ॥

জন্মলগ্নে স্বীয় ক্ষেত্রে মঙ্গল, চন্দ্র, শুক্র অথবা শনির যোগযুক্ত হলে জাতক ধনী হন।

*　　　*　　　*

গুরুক্ষেত্রগতে লগ্নে তস্মিন্ গুরুযুতো যদি।
সৌমভৌমত দৃষ্টে জাত যস্তু ধনী নরঃ॥

জন্মলগ্নে স্বীয় ক্ষেত্রে গুরু, বুধ অথবা মঙ্গলের যোগযুক্ত হলে জাতক ধনী হন।

*　　　*　　　*

ভৃগুক্ষেত্রগতে লগ্নে তস্মিন্ ভৃগুযুতো যদি।
শনিযৌম্যযুতে দৃষ্টে জাতো যস্তু ধনী নরঃ॥

জন্মলগ্নে স্বীয় ক্ষেত্রে শুক্র, শনি অথবা বুধের যোগযুক্ত হলে জাতক ধনী হন।

*　　　*　　　*

॥ দারিদ্র্যযোগ ॥

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি দরিদ্রং দুঃখ কারণম্।
লগ্নাধিপে রিক্‌গতে রিপুফেশো লগ্নমাগতে॥

অতঃপর দুঃখকারক দারিদ্র্য যোগ বিষয় বলা হবে। **লগ্নাধিপ যদি দ্বাদশ ক্ষেত্রে থেকে মারকাধিপতি যোগযুক্ত হন তাহলে জাতক দরিদ্র হয়ে থাকেন।**

* * *

লগ্নাধিপে শত্রুপুহংগতেরা ষষ্ঠেশ্বরে লগ্নগতোঽপি বাচেৎ।
বিলগ্নলে মাকরনাথ দৃষ্টে জাতো ভবেন্নির্ধনকোঽপি বৈশ্যঃ॥

লগ্নাধিপতি ষষ্ঠ স্থানে অবস্থান করলে এবং মারকাধিপতির দৃষ্টিযুক্ত হলে জাতক দরিদ্র হন।

* * *

লগ্নেন্দু কেতুযুক্তৌ বা লগ্নেসো নির্ধনং গতে।
মারকেশযুতে দৃষ্টে রাজবংশোঽপি নির্ধনঃ॥

লগ্নে চন্দ্র আর কেতু থাকলে এবং অষ্টমে মারকাধিপতির অবস্থিতি জাতকের রাজ-বংশে জন্ম হলেও দারিদ্র্য সূচিত করে।

* * *

বিলগ্ননাথে হরিবিনাশ পপিক্ষ নাথেক যুক্তে যদি পাপ দৃষ্টে।
মন্ত্রাত্মজেনাপি যুতেঽপি দৃষ্টে শুভৈর্নদৃষ্টে স ভবে দ্দরিদ্রঃ॥

লগ্নাধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম এবং দ্বাদশাধিপতির সঙ্গে যুক্ত হলে এবং তাতে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকলে অথবা লগ্নাধিপতি পঞ্চমাধিশ্বর যুক্ত হয়ে কোনো শুভগ্রহের দৃষ্টি বর্জিত হলে জাতক অবশ্যই নির্ধন হবে।

* * *

মন্ত্রেশো ধর্মনাশ্চ ষষ্ঠে কর্মস্হিতৌ ক্রমাৎ।
দৃষ্টৌ চোরকেশন জাতঃ স্যান্নির্ধনো নরঃ॥

ষষ্ঠে পঞ্চমাধিপতি, দশমে নবমাধিপতি অবস্থান করতঃ মারকাধিপতি দৃষ্ট হলে জাতক নির্ধন হবে।

* * *

পাপগৃহে লগ্নগতে রাজ্য ধর্মাধিপৌ বিনা।
মারকেশযুতো দৃষ্টে জাতঃ স্যান্নির্ধনো নরঃ॥

লগ্নে পাপগ্রহ নবমাধিশ্বর ও দশমাধিশ্বর যুক্ত হয়ে মারকাধিপতির দৃষ্টিযুক্ত হলে জাত ব্যক্তি দরিদ্র হয়ে থাকে।

* * *

॥ ক্ষৌরাদি কর্ম ॥

যো জন্মমাসে ক্ষুর কর্ম যাত্রাং
বর্ণস্য বেধ কুরতে চামোহাৎ।
নুনং স রোগং ধনপুত্রনাশং।
প্রাপ্নোতি মূঢ়ো বর্ধবন্ধনানি ॥

জন্মমাসে ক্ষুরকর্ম, যাত্রা, কান বেঁধানো নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তি জন্মমাসে এসব করে থাকে সে নির্বোধ আর তাই তাকে রোগ, ধন, পুত্রনাশ এবং বধবন্ধন দুঃখ পেতে হয়।

*　　　　*　　　　*

প্রাচীমুখঃ সৌম্যমুখোঽপি ভূত্বা কুর্য্যানরঃ ক্ষৌরমনুৎরাটাস্থঃ ॥

ক্ষৌরকর্মের প্রশস্ত দিক হল পূর্ব বা উত্তর। উবু হয়ে বসে ক্ষৌরকর্ম অবিধেয়।

*　　　　*　　　　*

রবৌ দুঃখং, সুখং চন্দ্রে সুখং কুবেজ মৃত্যুর্বুধে বলম্।
মানহানিগুরোবারে শুক্রে সুতক্ষয়ে ভবেৎ।
শনৌ চ সর্ব্বদোষাঃ স্যুঃ ক্ষৌরমাত্র বিবর্জ্জয়েৎ ॥

রবিতে ক্ষৌরকর্ম করলে দুঃখ, সোমে সুখ, মঙ্গলে আয়ুক্ষয়, বুধে বল বৃদ্ধি, বৃহস্পতিতে মানহানি, শুক্রে সুতক্ষয় এবং শনিবারে অশুভ ফল লাভ হয়ে থাকে। তাই অশুভ দিবসে ক্ষৌরকর্ম বর্জনীয়।

*　　　　*　　　　*

॥ হাঁচি টিকটিকি ॥

শয়নে ভোজনে উপবেশনে বা দানে।
বিবাহে বিবাদে আর বস্ত্র পরিধানে ॥
এই সপ্ত কর্মে হাঁচি আদি সুশোভন।
অন্য কর্মে শুভ নাহি হয় কদাচন ॥

বৃদ্ধ শিশু অথবা কফের যে হাঁচি।
যত্নপূর্বকের হাঁচি কদাচ না বাছি ॥
গোধনের হাঁচি হয় মৃত্যুর কারণ।
জ্যোতিষ বচনে ইহা অবশ্য বারণ ॥

শয়নে, ভোজনে, উপবেশনে, দানে, বিবাহে, বিবাদে, বস্ত্র পরিধান কালে হাঁচি সুফলদায়ক বা শুভ। অন্য কর্মের সময় হাঁচি অমঙ্গলজনক। বৃদ্ধ, শিশুর হাঁচি, সর্দি হলে হাঁচি এবং যত্নপূর্বকের হাঁচি উপেক্ষণীয়। গোরুর হাঁচি মৃত্যুর কারণ অতএব এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

*　　　　*　　　　*

দিকের নির্ণয় করি বুঝহ সুবুদ্ধি।
ঊর্ধ্বভাগে হৈলে ধন ভোগ কার্যসিদ্ধি ॥
পূর্বদিকে অগ্নিকোণে হৈলে ভয় হয়।
দক্ষিণেতে অগ্নিভয় জানিহ নিশ্চয় ॥
নৈঋর্তে কলহলাভ পশ্চিমেতে ভাব।
বায়ুকোণে নব-বস্ত্র গন্ধ জয়লাভ ॥
উত্তরে টিকটিকি হাঁচি স্ত্রী-লাভ কারণ।
ঈশানে হৈলে মৃত্যু কে করে বারণ ॥

হাঁচি টিক্‌টিকির ফল জানতে হলে দিক্‌ নির্ণয় করতে হবে। ঊর্ধ্বভাগে হাঁচি টিকটিকির শব্দ হলে ধনভোগ এবং কার্যসিদ্ধি, পূর্বদিকে এবং অগ্নিকোণে ভয়, দক্ষিণেতে অগ্নিভয়, নৈঋর্ত অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিবাদ, পশ্চিমেতে ভাব, বায়ুকোণ অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম কোণে সৌরভিত নতুন বস্ত্র ও জয়লাভ, উত্তরে স্ত্রীলাভ এবং ঈশান কোণ অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব কোণে হলে মৃত্যু অবধারিত।

*　　　　*

॥ স্বপ্নতত্ত্ব ॥

শুক্ল ও প্রতিপদের স্বপ্ন সুখবর্দ্ধক।
দ্বিতীয়া, চতুর্থী, দশমী, একাদশীর স্বপ্ন নিষ্ফল।
তৃতীয়া এবং কৃষ্ণ চতুর্দশীর স্বপ্ন সুফলদায়ক।
পঞ্চমীর স্বপ্ন আংশিক সফল।

ষষ্ঠী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, কৃষ্ণ পঞ্চমীর স্বপ্ন অচিরে সিদ্ধ হয় না।
সপ্তমীর স্বপ্ন প্রকাশ না করলে সিদ্ধ হয়।
অষ্টমী, নবমী ও ত্রয়োদশীর স্বপ্ন খুব শীঘ্র সফল হয়।
দ্বাদশীর স্বপ্ন খুব কমই সিদ্ধ হয়।
কৃষ্ণ একাদশীর স্বপ্ন মন্দ ফল প্রদান করে।

* * *

।। মাসফল ।।

জ্যৈষ্ঠেতে বিধবা হয় আষাঢ়েতে ধনী।
মৃতাপত্যা শ্রাবণেতে ভাদ্রেতে রোগিনী ।।
আশ্বিনেতে মৃতাপত্যা হইবে কামিনী।
কার্ত্তিকেতে ঋতুমতী স্বকুলনাশিনী।
মার্গশীর্ষে ঋতুমতী হয় ধর্মশীলা ।।
পৌষেতে হইলে ঋতু রতিতে বিহ্বলা ।।
মাঘে পতিব্রতা নারী হইলে ঋতুমতী।
ফাল্গুনে হইলে ঋতু বহু পুত্রবতী ।।
মদোন্মাদিনী হয় চৈত্রেতে কামিনী।
বৈশাখেতে হইলে হয় সুপ্রিয়বাদিনী ।।

অতঃপর মাস অনুযায়ী আদ্য ঋতুর ফলাফল বর্ণনা করা হচ্ছে। জ্যৈষ্ঠে বৈধব্যযোগ, আষাঢ়েতে ধনিনীযোগ, শ্রাবণে ও আশ্বিনে মৃতবৎসা, ভাদ্রে ব্যাধিতা, কার্ত্তিকেতে কুলত্যাগিনী, অগ্রহায়ণে ধর্মশীলা, পৌষে কামাতুরা, মাঘে পতিব্রতা, ফাল্গুনে বহু পুত্রবতী, চৈত্রে মদোন্মাদিনী এবং বৈশাখে রজঃস্বলা হলে সুভাষিণী হয়ে থাকে।

* * *

কাক চরিত্র

কোন্ দিক থেকে কোন্ প্রহরে কাক কোন্ স্বরে ডাকছে জানতে পারলে কার্যসিদ্ধি সুনিশ্চিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্ত্যজ এই পাঁচ প্রকারের কাক আছে। কাকের বর্ণ এবং আকার অনুযায়ী জাতি নির্ণয় করতে হবে।

রং কালো, অত্যন্ত কর্কশ ডাক, চোখ দুটি দীর্ঘ এবং আকারে বড় হলে সেই কাক ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় জাতির কাকের স্বর তীক্ষ্ন, চোখ নীল কিংবা হরিতাভ পাটিল বর্ণের। বৈশ্য জাতির কাক নিত্য চঞ্চল, কৃশ, নীলচে কিংবা সাদা চোখ, গায়ের রং ফ্যাকাশে কিংবা নীল বর্ণ। শূদ্র জাতির কাক অনেকবার কা-কা করবে গায়ের রং ছাই ছাই, রোগা ও খসখসে। অন্ত্যজ জাতির কাকের স্বর অচঞ্চল, ধীর, গলা আর নখ চকচকে, গা আর চোখ সূক্ষ্ম।

মিশ্‌কালো ব্রাহ্মণ জাতীয় কাক অগ্রগণ্য। আর তারপরেই যার স্থান সেই কাকের হলো গলা কালো আর শরীর সাদা। গায়ে নানা রং—এমন কাক শুভাশুভ গণনায় বর্জনীয়।

ব্রাহ্মণ জাতীয় কাককে প্রশ্ন করলে সে যথার্থ উত্তর দেয়। ক্ষত্রিয় কাক ব্রাহ্মণ কাকের মতো সদুত্তর দিতে পারে না। অনেক প্রয়াস প্রযত্নে বৈশ্য কাকের কাছ থেকে উত্তর পাওয়া যায়। খাদ্যের লোভে শূদ্রজাতীয় কাক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ জাতীয় কাককে বাদ দিলে একমাত্র অন্ত্যজ শ্রেণীর কাকই ঠিকঠাক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে।

ব্রাহ্মণ জাতীয় কাকের উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই ফলবতী হয়। ক্ষত্রিয় জাতীয় কাকের ভবিষ্যৎবাণী ফলে তিনদিনে, বৈশ্যজাতীয় কাকের সাত দিনে, শূদ্রজাতীয় কাকের দশ দিনে আর অন্ত্যজ শ্রেণীর কাকের পনের দিনে।

কাকের স্বর স্থির ও অকর্কশ হলে এবং যদি চলার পথে বিপরীত দিক থেকে স্বর ধ্বনিত হতে থাকে তাহলে শুভ হয়। কাক কর্কশ স্বরে ডাকলে অমঙ্গল হয়।

সূর্যমুখো হয়ে কাক যদি কর্কশ স্বরে ডাকে তাহলে আপাত কার্যসিদ্ধি হলেও পরিণামে অমঙ্গলের সূচনা করে। আর কাক যদি সূর্যের দিকে মুখ করে স্থির সুস্বরে ডাকে তাহলে কার্যসিদ্ধি সুনিশ্চিত। সূর্যের দিকে চেয়ে ছায়াময় স্থানে উপবেশন করে কাক যদি শান্ত ডাক ডাকে তাহলে অশুভ বিনাশান্তে কার্যসিদ্ধি হয়ে থাকে। প্রথমে সূর্যের দিকে মুখ করে ডেকে ছায়ার দিকে মুখ করে বসে থাকলে প্রথমে ফল মঙ্গলদায়ক হলেও অন্তে অশুভের নির্দেশক।

সূর্যোদয় লগ্নে কাক যদি পূর্বদিকে নির্জন স্থানে বসে ডাকে তাহলে সেই জায়গার সত্বাধিকারী অরিজিৎ হয়ে থাকেন, তার বাসনা পূরিত হয় এবং তিনি রমণী লাভ করে থাকেন।

দক্ষিণ পূর্ব দিকে কোনো শোভন স্থানে উপবেশন করে যদি কাক ডাকে তাহলে শত্রু দমনে যুদ্ধে যেতে হয়।

সকালবেলায় দক্ষিণ দিকে বসে কাক যদি কর্কশ স্বরে ডাকে তাদের শোক, ব্যাধি, মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়। আর যদি মধুর স্বরে ডাকে তাহলে বিদ্যালাভ হয়, স্ত্রী আর অর্থ মেলে।

সকালবেলায় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে যদি কাক ডাকে তাহলে গর্হিত ব্যাপারের অংশীদার হতে হয়। দূতের আবির্ভাবও হয়ে থাকে এবং মোটামুটিভাবে কার্য সম্পাদিত হয়ে থাকে।

সকালবেলায় পশ্চিম দিক থেকে কাকের ডাক শুনলে বর্ষণ আসন্ন। বাড়িতে নারী-পুরুষের আগমন ঘটে, বস্ত্রলাভ হয় আর দাম্পত্য কলহ ঘটে থাকে। সকালবেলায় উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে কাক ডাকলে সেদিন ভালো খাদ্য জোটেনা, পরিচ্ছদ আর বাহন মেলে, বাড়িতে অতিথি আবির্ভাব হয়। বিদেশ যাত্রার সমূহ সম্ভাবনাও সূচিত হয়।

সকালে কাক যদি উত্তরদিকে বসে ডাকে, বিশেষ করে লোকের দিকে চেয়ে, তাহলে শোক, সাপের ভয় ও দারিদ্র্যে দুঃখ পেতে হয় কিন্তু হারানো টাকা-পয়সা করায়ত্ত হয় এবং মনের ইচ্ছা ফলবতী হয়।

সকালবেলায় উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে কাক ডাকলে ব্যধি নিরাময়ের জন্যে বাড়িতে কোনো অস্পৃশ্য রমণীর আবির্ভাব ঘটে এবং অচিরেই রোগের বিনাশ হয়ে থাকে এবং বাঞ্ছিত দ্রব্যলাভ হয়ে থাকে।

সকাল বেলায় মাথার ওপর থেকে কাক ডাকলে প্রিয় দ্রব্য মেলে, প্রভু প্রীত হন। দিনের প্রথম তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কাক যদি দক্ষিণ-পূর্বদিক থেকে ডাকতে থাকে তাহলে কামিনী সান্নিধ্যে সুখ লাভ এবং বাড়িতে প্রিয়জনের আবির্ভাব ঘটে থাকে। দিনের প্রথম তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কাক যদি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বসে ডাকে তাহলে প্রেয়সীর সঙ্গলাভ, মিষ্টান্ন ভোজন ও ইচ্ছাপূরণে জীবনের মূল্য যায় বেড়ে। ঐ সময়ের মধ্যে পশ্চিম দিক থেকে কাক ডাকলে কাঙ্ক্ষিত দ্রব্য মেলে এবং অচিরে বৃষ্টিপাত হয়।

দিনের প্রথম তিনঘণ্টা সময়ের মধ্যে কাক যদি উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে ডাকে তাহলে প্রসাদ মেলে, জনৈক পথচারীর সঙ্গে হার্দিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পক্ষান্তরে ঐ কাল পরিধিতে উত্তর দিক থেকে ডাকলে চোরের ভয়, শোক এবং শুভ সন্দেশ মেলে, অপ্রত্যাশিত অর্থলাভ হয়।

দিনের প্রথম তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কাক যদি উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে ডাকে, তাহলে প্রিয় মিলন, অগ্নি আতংক সূচিত হয় এবং বাড়িতে অনেকের আগমন ঘটে থাকে। দিনের

দ্বিতীয় তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কাক যদি পূর্বে উপবেশন করে ডাকে তাহলে পথচারীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ঘটে, চোরের ভয় এবং অন্যান্য ভয়, চিত্ত বিকার ও চাঞ্চল্যে ছটফট করতে হয়।

দিনের দ্বিতীয় তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কাক যদি দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ডাকে, তাহলে স্ত্রীসঙ্গ লাভ হয়, আত্মীয় বন্ধুর সমাগম হয়। ঐ সময়ের মধ্যে দক্ষিণ দিক থেকে ডাকলে বৃষ্টি হয়, ভীতি উৎপন্ন হয় এবং আত্মীয়-স্বজনের অবির্ভাব ঘটে। দিনের দ্বিতীয় তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের কোণের থেকে কাকের ডাক কানে এলে প্রাণভয়, রমণী ও সুস্বাদু আহার্য লাভ হয় সেই সঙ্গে আরোগ্যের উপশান্ত সন্তোষ উৎপন্ন হয়। আর পশ্চিম দিকে বসে কাক ডাকলে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয় এবং রমণীলাভ সুনিশ্চিত। দিনের দ্বিতীয় তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে কাকের ডাক কর্ণগোচর হলে, বাড়িতে চোর কিংবা দূত আসে, মাংস রান্না হয়। উত্তর দিক থেকে ডাকলে প্রিয় মিলন, কর্মে সাফল্য এবং চোরের ভয় সুনিশ্চিত।

দিনের দ্বিতীয় তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্ব দিক থেকে কাকের কর্কশ ডাক শোনা গেলে পুনরায় চোরের ভয়, দুঃসংবাদ প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। অপরদিকে সেই কাকের ডাকে রুক্ষতা না থাকলে মহাপুরুষের সান্নিধ্যে জীবনের মূল্য যায় বেড়ে। দিনের প্রথম তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ওপর থেকে কাক যদি মধুর রব করে তাহলে রাজ-পুরী প্রাপ্তি, মিষ্টান্ন লাভ আর কাকের স্বরে রুক্ষতা থাকলে চোরের ভয় সুনিশ্চিত।

দিনের তৃতীয় তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে যদি রুক্ষ স্বরে ডাকে তাহলে চোরের ভয় আর মিষ্ট ভাবে ডাকলে নৃপতুল্য ব্যক্তির সঙ্গে মিলন এবং শুভ কাজে সাফল্য অর্জন সুনিশ্চিত। দিনের তৃতীয় তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে কর্কশ শব্দে কাক ডাকলে দুঃসংবাদ কানে আসে ফলে যাত্রা ব্যহত হয়। আর মিষ্ট স্বরে ডাকলে জয়বার্তা আসে কানে। ফলে যাত্রা সুগম হয়।

দিনের তৃতীয় তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে দক্ষিণ দিক থেকে কাকের ডাক শুনতে পেলে অচিরেই অসুস্থ হবার সম্ভাবনা কিন্তু মহানুভব ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ এবং কার্য সিদ্ধিও সুনিশ্চিত।

দিনের তৃতীয় তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে যদি কাক ডাকে তাহলে আকাশ মেঘে ঢেকে যায়, মিষ্টি মেলে, শত্রুবিজয় হয়ে থাকে, বাড়িতে অন্তাজ শ্রেণীর কোনো ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, স্বামী দুসংবাদ প্রাপ্ত হন এবং কার্যে বাধা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

কাক পশ্চিম দিক থেকে মধুর স্বরে ডাকলে নষ্ট ঐশ্বর্য পুনরুদ্ধার, বাড়িতে মিত্রের আগমন এবং সংগ্রামী ব্যক্তির সমাগমে বিজয় সংবাদ ও অর্থপ্রাপ্তি ঘটে থাকে।

উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে কাক ডাকলে বুঝতে হবে দুঃসময় আসন্ন। রব মধুর হলে

অপহৃত দ্রব্য পুনরায় হস্তগত হয় এবং সুরূপা নারীর সান্নিধ্যে জীবন ধন্য হয় এবং যাত্রাও শুভ হয়।

দিনের তৃতীয় তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কাক যদি উত্তর দিক থেকে ডাকে তাহলে কার্যসিদ্ধি অর্থ প্রাপ্তি ও শুভ সংবাদ রাজসিক ভোজন, বৈশ্যামিলন এবং যাত্রা শুভ হয়ে থাকে।

দিনের তৃতীয় তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে যদি কাকের ডাক কানে আসে তাহলে সুস্বাদু আহার প্রাপ্তি এবং কার্যসিদ্ধি ঘটে থাকে। কাকের স্বর কর্কশ হলে ক্ষয়ক্ষতি অবধারিত। কাকটি ওপর দিক থেকে ডাকলে চাল, তিল আর পান মেলে। দিনের শেষ প্রহরে পূর্বদিক থেকে কাক ডাকলে ত্রাস ও ব্যাধির সঞ্চার হয়। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে কাকের ডাক কানে এলে প্রিয়জনের মৃত্যু হয়।

দিনের শেষ প্রহরে দক্ষিণ দিক থেকে কাকের ডাক শোনা গেলে চোর ও রিপু ভীতি, প্রিয় সমাগম ও ব্যাধির আক্রমণ অনিবার্য। আর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে ডাকলে ধীশক্তি লাভ এবং আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, চোরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব অবশ্যই ঘটে থাকে।

দিনের শেষ প্রহরে কাক যদি পশ্চিম দিক থেকে ডেকে ওঠে তাহলে বর্ষণ আসন্ন আর সেইসঙ্গে কোনো না কোনো নারীর সমাগম অবধারিত এবং রাজার কৃপালাভে অর্থ প্রাপ্তিও ঘটে থাকে!

দিনের শেষ প্রহরে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে কাক ডাকলে প্রিয়া সান্নিধ্যে জীবনের মূল্য বেড়ে যায় এবং বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ মেলে।

দিনের শেষ প্রহরে উত্তর দিক থেকে কাক ডাকলে অতিথির আবির্ভাব ঘটে, শুভ সংবাদ শ্রবণে মন প্রফুল্ল হয় সেইসঙ্গে পান-সুপারির উপঢৌকন মেলে, কোনো বৈশ্য-জাতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থপ্রাপ্তি ঘটে থাকে, অশ্বারোহণের সুযোগ মেলে কিন্তু ব্যাধি ও মৃত্যুর আশংকা থেকে যায়।

দিনের শেষ প্রহরে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে কাক ডাকলে আরোগ্যের আনন্দ সেইসঙ্গে শুভসংবাদ প্রাপ্তি॥

* * *

খনার জীবনী

সিংহলরাজ তনয়া খনার বিষয়ে আমরা যেটুকু জেনেছি তা কেবলমাত্র কিংবদন্তির সূত্র ধরেই। সাতিশয় পুণ্যক্ষণে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তিনি তাই 'ক্ষণা' বা 'খনা' নামে পরিচিতা।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের একটি রত্ন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহ। পুত্র মিহিরের জন্মপত্রিকা গণনা করে দেখলেন যে নবজাতকের আয়ু মাত্র এক বছর। অকাল মৃত্যু যাতে না দেখতে হয় সেজন্য একটি পাত্রে পুত্রকে রেখে তিনি সেটি জলে ভাসিয়ে দেন। পাত্রটি ভাসতে ভাসতে সিংহলে উপনীত হলো।

সিংহলরাজ রূপবান এবং সুলক্ষণযুক্ত শিশুটিকে নিজের ছেলের মতো করে মানুষ করতে লাগলেন। পরে সিংহলরাজের একটি পরমা সুন্দরী কন্যা হলো।

মিহির এবং খনা উভয়েই জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করেন এবং পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

গণনায় স্বীয় পরিচয় জেনে জন্মভূমি দর্শনের অভিপ্রায়ে অতঃপর মিহির খনা সহ উজ্জয়িনীতে আগমন করেন। মিহিরের সঙ্গে দুখানি জ্যোতিষগ্রন্থও ছিল।

আসন্নপ্রসবা একটি গোরুকে দেখে খনা কৌতূহলবশতঃ স্বামীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বলতো এই গাভী কী রঙের বৎস প্রসব করবে?' মিহির গণনা করে বললেন, 'সাদা'। কিন্তু গো বৎসটি কৃষ্ণবর্ণের হওয়ায় অপমানে লজ্জায় মিহির জ্যোতিষ শাস্ত্রের অমূল্য গ্রন্থ দুটি সমুদ্র বক্ষে নিক্ষেপ করেন।

জন্মের পর গাভীটি যখন বাছুরটির গা চেটে দিল তখন প্রতীয়মান হলো যে গো-বৎসটি শ্বেত বর্ণেরই বটে। গ্রন্থ দুটি উদ্ধারের জন্য মিহির জলে নামলেন কিন্তু ততক্ষণে বেশ কিছু পৃষ্ঠা ঢেউয়ে ভেসে গেছে।

উজ্জয়িনীতে এসে সস্ত্রীক মিহির পিতাকে আত্মপরিচয় দিলে বরাহ প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেন নি। পুনঃগণনায় তিনি দেখলেন যে মিহিরের আয়ু এক বছর। এমন সময় খনা বলে ওঠেন—

কিসের তিথি কিসের বার,
জন্ম নক্ষত্র কর আর।

কি কর শ্বশুর মতিহীন,
পলকে জীবন বার দিন ॥

পুত্রবধূর যুক্তিতে বরাহের ভুল ভাঙে। অতঃপর তিনি মিহির আর খনাকে নিয়ে পরমানন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। মিহিরও বিক্রমাদিত্যের সভায় স্থান পেল।

একদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য আকাশে কতগুলি তারা আছে জানতে চান। বরাহ-মিহির এই কঠিন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবার জন্যে একদিন সময় চাইলেন। এদিকে ভাবনায়-চিন্তায় পিতা-পুত্রকে মুহ্যমান দেখে খনা গণনা করে বলে দেন আকাশে তারার সংখ্যা কত।

খনার পরিচয় জানতে পেরে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁকে রাজসভায় আনতে বললেন। প্রতিষ্ঠা ও সম্মানহানির আশঙ্কায় পিতার আদেশে মিহির খনার জিহ্বা ছেদন করেন—খনারও মৃত্যু হয়।

আগাগোড়া ঘটনাটি সত্যের শুদ্ধিতে ভাস্বর এমন কথা বলা যায় না। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন হলেন ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ-মিহির এবং বররুচি। 'বরাহমিহির' শব্দটি এক বচনান্ত। কাজেই বরাহমিহির বলতে বরাহ এবং মিহিরকে বোঝায় না।

তাছাড়া প্রচলিত খনার বচনের ভাষা লক্ষ্য করলে এমন একটা ধারণা জন্মায় যে ঐ ভাষা আনুমানিক দুই শত বৎসর পূর্বের গ্রাম বাংলার ভাষা।

*   *   *

চাণক্য শ্লোক

নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সতসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্ ॥ ১ ॥

—**বিদ্যা** আমাদের চোখ খুলে সব দেখিয়ে দেয়, এর মতো চোখ আর নেই। বিদ্যার বলে অনেক কিছু অজানা বিষয় আমরা জানতে পারি। পৃথিবীতে যত রকমের তপস্যা আছে তার মধ্যে সত্যপালন শ্রেষ্ঠ তপস্যা। জমিজমা, ঘরবাড়ী, টাকা-পয়সা প্রভৃতির উপর যত টান থাকবে ততই মানুষের দুঃখ-কষ্টের বোঝা বাড়বে। কিন্তু যারা এইগুলি (জমিজমা, ঘরবাড়ী, টাকা-পয়সা) মন থেকে মুছে নিয়ে ত্যাগ করবে তারাই 'প্রকৃত সুখী'।

* * *

মাংসভক্ষৈঃ সুরাপানৈঃ মূর্খৈশ্ছাত্র বর্জিতঃ।
পশুভিঃ পুরুষাকারৈ র্ভ্রাম্যন্তি চ মেদিনী ॥ ২ ॥

—**মাংসাশী**, মদ্যপায়ী, শাস্ত্রবর্জিত মূর্খ পুরুষ—এরা পশুর তুল্য। এরা ধরণীর বোঝা। এরা সঙ্গী হিসাবে পরিত্যাজ্য।

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনানি
সমানি চৈতাদি নৃণাং পশুনাম্‌ ।
জ্ঞানী নরাণামধিকো বিশেষো
জ্ঞানেন হীনা পশুভিঃ সমান ॥ ৩ ॥

—আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন পশু এবং মানুষদের ভেতর সমভাবেই বিদ্যমান। কিন্তু মানুষ জ্ঞানী—আর এখানেই তার বিশিষ্টতা। জ্ঞানহীন ব্যক্তি পশুর সমান। অজ্ঞান ও মূর্খ ব্যক্তি পশুর সমান।

*　　　*　　　*

যেষাং ন বিদ্যা ন তপোর্ন দানং
ন চাশি শীলঃ ন গুনো ন ধর্মঃ।
তে মর্ত্যলোকে ভুবি ভার ভূতাং
মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি ॥ ৪ ॥

—যার বিদ্যা নেই, যে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সাধনায় বিরত, যে দানে পরাঙ্মুখ, যে চরিত্রহীন, যার গুণ ধর্ম কিছুই নেই—মর্ত্যলোক সে বোঝা স্বরূপ, সে মনুষ্যরূপী পশু।

*　　　*　　　*

ধর্মার্থকাম মোক্ষেষু যস্যৈকোঽপিন বিদ্যতে।
জন্ম জন্মানি মর্ত্যেষু মরণং তস্য কেবলম্‌ ॥ ৫ ॥

—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষে যার প্রবণতা নেই, জন্ম-জন্মান্তর ধরে মর্তলোকে সে কেবল মরতেই আসে; তার স্বর্গলাভ দুরাশা মাত্র।

*　　　*　　　*

গুণাঃ সর্বত্র পূজ্যন্তে ন মহত্ত্বেঽপি সম্পদঃ।
পূর্ণেন্দু কিং তথা বন্দ্যো নিষ্কলঙ্ক যথা কুলঃ ॥ ৬ ॥

—গুণ সর্বত্রই আদৃত হয়, প্রচুর সম্পদ থাকলেও মানুষের আদর হয় না—পূর্ণ-চন্দ্রকেও মানুষ ততটা প্রশংসা করে না, যতটা করে নিষ্কলঙ্ক কুলকে।

*　　　*　　　*

গুণং সর্বত্র তুল্যোঽপি সীদত্যেকো নিরাশ্রয়ঃ।
অনর্ঘ্যমণি মাণিক্যং হেমাশ্রয়মপেক্ষতে ॥ ৭ ॥

—গুণ যদি তার তুল্য মর্যাদা না পায়, তাহলে সুখ থেকে বঞ্চিত হয়। বহুমূল্য মাণিক্যের উপযুক্ত অর্থ প্রাপ্তির জন্য স্বর্ণের অপেক্ষা করতে হয়।

*　　　*　　　*

ধনহীনো ন চ হীনশ্চ ধনিক স সুনিশ্চয়ঃ।
বিদ্যারত্নেন হীনো যঃ স হীনঃ সর্ববস্তুষু ॥ ৮ ॥

—**ধনহীন** ব্যক্তিকে কখনও হীন জ্ঞান করবে না। বিদ্বান ধনীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তির বিদ্যারত্ন নেই, সেই সর্ববস্তুরহিত।

*　　　*　　　*

বালাশ্রয়াপি বিফলাপি সকণ্টকাপি
বক্রাপি পঙ্ক সহিতাপি দুরাসদাপি।
গন্ধেন বন্ধুরসি কেতকি সর্বজন্তো
রেকো গুণঃ খলু নিহন্তি সমস্ত দোষান্ ॥ ৯ ॥

—**সর্পের** আশ্রয়, ফলেও যার কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, সকণ্টক ও বক্র যার বৃক্ষ, যেখানে বিচরণ করা দুঃসাধ্য এমন পঙ্কে জন্মায় যে কেতকী, গন্ধে সেও সকলকে আকর্ষণ করে। একটি মাত্র গুণ সমস্ত দোষকে বিনষ্ট করে।

*　　　*　　　*

পরমোক্ত গুণো যস্তু নির্গুণোঽপি গুণো ভবেৎ।
ইন্দ্রোঽপি লঘুতাং যাতি স্বয়ং প্রখ্যাপিতৈর্গুণৈঃ ॥ ১০ ॥

—**নিজের** গুণের প্রশংসা করলে, গুণী হওয়া যায় না। ইন্দ্র যদি তাঁর নিজের প্রশংসা করেন, তবে তাঁর খ্যাতি বা সমস্ত গুণ নষ্ট হয়ে যায়।

*　　　*　　　*

দানার্থিনো মধুকরা যদি কর্ণতালৈ
দূরীকৃতা করিবরেণ মদান্ধবুদ্ধ্যা।
তস্যৈব গণ্ডযুগ মণ্ডন হানিরেব
ভৃঙ্গাঃ পুনর্বিক চ পদ্মবনে বসন্তি ॥ ১১ ॥

—**মদগন্ধে** আকৃষ্ট মৌমাছিকে মদগন্ধে প্রমত্ত হস্তী যদি কর্ণের আঘাতে বিতাড়িত করে, তবে তার গণ্ডযুগলের সৌন্দর্যের হানি হয়। মৌমাছি কিন্তু প্রস্ফুটিত পদ্মবনে বাস করে। [হাতির গুণের আকর্ষণে মৌমাছিরা এসেছে—মূর্খ হাতি তা বুঝতে না পেরে তাদের বিতাড়িত করছে।]

*　　　*　　　*

পঠন্তি চতুরো বেদান্ ধর্মশাস্ত্রান্যনেকশঃ।
আত্মানং নৈব জানন্তি দর্বী পাকরসং যথা ॥ ১২ ॥

—**অনেকেই** চতুর্বেদ এবং শাস্ত্রসমূহ পাঠ করে, কিন্তু তারা নিজেকে জানতে পারে না—হাতা যেমন অন্নের স্বাদ পায় না।

*　　　*　　　*

স্বর্গে স্থিতানামিহ জীবলোকে,
চত্বারি চিহ্নানি বসন্তি দেহে।
দানপ্রসঙ্গ মধুরা চ বাণী
দেবার্চনং ব্রাহ্মণ তর্পনঞ্চ ॥ ১৩ ॥

—যিনি দাতা, যাঁর বাণী মধুর, যিনি দেবার্চনা করেন এবং ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন করেন—এই চার প্রকার গুণ বিশিষ্ট মর্ত্যলোকের মানুষ স্বর্গলাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়।

*　　　　*　　　　*

খলানং কণ্টকানাং চ দ্বিবিধৈব প্রতিক্রিয়া।
উপনামুখভঙ্গো বা দূরে তৈব্য বিসর্জনম্ ॥ ১৪ ॥

—কপট কন্টকের তুল্য। জুতো পায়ে কাঁটাকে দমন করতে হয়, দুষ্টকেও সেই রকমভাবে নিগ্রহ করতে হয়, কিংবা তার থেকে দূরে থাকতে হয়।

*　　　　*　　　　*

সাধুমন্তে নিবর্তন্তে পুত্রঃ মিত্রাণি বান্ধবাঃ।
যে চ তৈঃ সহ গন্তরস্তদ্ধর্মাৎসুকৃতাংকুলম্ ॥ ১৫ ॥

—পুত্র, মিত্র, বান্ধব—এরা সকলেই সাধু ব্যক্তির কাছ থেকে দূরে থাকতে চায়। তাই এদের থেকে দূরে না থাকলে কুল অপবিত্র হয়।

*　　　　*　　　　*

বিত্তং দেহি গুণান্বিতেষু মতিমান্নান্যত্র দেহি ক্বচিৎ
প্রাপ্তং বারিনিধের্জলং ঘনচাং মাধুর্য্য যুক্তং সদা।
জীবাঃ স্থাবর জঙ্গমাশ্চ সকলা সংজীব্য ভূমণ্ডলং
ভূয়ঃ পশ্যঃ তদ্দৈব কোটিগুণিতং গচ্ছন্ত্যমোনিধিম্ ॥ ১৬ ॥

—হে বুদ্ধিমান, গুণান্বিত ব্যক্তিকে অর্থদান কর, নিগুর্ণকে নয়। গুণী ব্যক্তি প্রাপ্ত অর্থে সদ্ব্যবহার করেন। স্থাবর জঙ্গম সকল প্রকার জীব এবং পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করে, মধু বারি কোটি গুণিত হয়ে সমুদ্রে গমন করে।

*　　　　*　　　　*

অনাগত বিধাতা চ প্রত্যুপন্নমতিস্তথা।
দ্বাধেতি সুখমেধেতে যদ্ভবিষ্যো বিনশ্যতি ॥ ১৭ ॥

—যিনি অটলচিত্তে অনাগত ব্যাঘাত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন, তিনিই সুখের অধিকারী হন। আর যিনি ভাগ্যের অজুহাত দেখিয়ে, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন, তিনি বিনাশপ্রাপ্ত হন।

*　　　　*　　　　*

মূর্খস্তু পরিহর্তব্যঃ প্রত্যক্ষো দ্বিপদঃ পশুঃ।
ভিনত্তি বাক্য শূলেন অদৃশ্যং কণ্টকং যথা ॥ ১৮ ॥

—মূর্খ ব্যক্তি দ্বিপদ পশুর মতো। এই প্রকার মানুষকে পরিহার করে চলবে, কারণ অদৃশ্য কাঁটার মতোই এরা, মানুষকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করে।

* * *

বিপ্রাস্মিনগরে মহান্ কথয় কস্তাল দ্রুমণাংগণঃ
কো দাতা রজকো দদাতি বসনং প্রাতিগৃহীত্বা নিশি।
কো দক্ষঃ পরিবিত্তদারহরণং সর্বেঽপি দক্ষাঃ জনাঃ
কস্মাজ্জীবতি হে সখে বিষকৃমিন্যায়েন জীবাম্যহম্ ॥ ১৯ ॥

—হে মহান্ বিপ্র, যেমন কুৎসিত তালবৃক্ষের শ্রেণী আছে, যেখানে বস্ত্রদান করে রজক দাতা হয়, যেখানে মানুষ পরের চিত্ত হরণে দক্ষ—এই রকম নগরে হে বন্ধু, কৃমিকীটের মতো কি করে বাঁচব!

* * *

মুহূর্ত্তমপি জীবেচ্চ নরঃ শুক্লেন কর্মণা।
ন কল্পমপি কষ্টেন লোক দ্বয় বিরোধিনা ॥ ২০ ॥

—যে ব্যক্তি সৎকর্মের দ্বারা স্বল্পকাল মাত্র বাঁচে, তার জীবন সার্থক। যে ব্যক্তি নিজেও সুখ পায় না, অপরকেও সুখী করতে পারে না, সে ব্যক্তি দীর্ঘকাল বাঁচলেও তার জীবন ব্যর্থ।

* * *

অত্যন্তলেপঃ কটুতা চ বাণী
দরিদ্রতা চ স্বজনেষু বৈরম্।
নীচ প্রসঙ্গঃ কুলহীন সেবা
চিহ্নানি দেহে নরকস্থিতানাম্ ॥ ২১ ॥

—দুষ্ট ব্যক্তি অল্প ক্রুদ্ধ হয়, তার বাণীও কটু হয়, সে সর্বদা দারিদ্র্যে ভোগে, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি শত্রুর মতো আচরণ করে, দুষ্ট লোকের সঙ্গ করে, কুলহীনদের সেবা করে। এই প্রকার লোকের নরকে গতি হয়।

* * *

দহ্যমানাং সুতীব্রেন নীচাঃ পরযশোঽগ্নিনা।
অশক্তাস্তৎ পদং গন্তুং ততো নিন্দাং প্রকুর্বতে ॥ ২২ ॥

—নীচ ব্যক্তিরা পরের যশে অগ্নির মতো দগ্ধ হয়। তারা নিজেরা যশ অর্জনে অসমর্থ হয়ে, পরের নিন্দা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

* * *

অর্থাধীতাশ্চ যৈর্বেদস্তথা শূদ্রান্নভোজিনঃ !

তে দ্বিজাঃ কিং করিষ্যান্তি নির্বিষা ইব পন্নগা ।। ২৩ ।।

—যাঁরা অর্থলাভের উদ্দেশ্যে বেদ পাঠ করেন এবং শূদ্রান্নভোজী, সেই ব্রাহ্মণেরা নির্বিষ সর্পের মতো— তাঁরা কি করবেন !

* * *

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন-যৌবনম্ ।

চলাচলমিদং সর্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ।। ২৪ ।।

—মানুষের মন, অর্থ (অর্থাৎ টাকা-পয়সা), জীবন (অর্থাৎ মানুষ চিরজীবন বাঁচে না), এবং যৌবন এগুলি সবই অস্থির অর্থাৎ স্থায়ী নয় । কিন্তু গুণী ব্যক্তি চিরদিন থাকে এই পৃথিবীতে । এবং তাঁর সুনাম চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকে এই পৃথিবীর আনাচে কানাচে ।

* * *

মনস্যন্যদ্ বচস্যন্যদ্ কর্ম্মণ্যন্যদ্ দুরাত্মনাম্ !

মনস্যেকং বচস্যেকং কর্মণ্যেকং মহাত্মনাম্ ।। ২৫ ।।

—খল ব্যক্তির চিন্তা ভাবনায় এক রকম, কথায় অন্যরকম—কাজকর্মের ব্যাপারে তা সম্পূর্ণ উল্টো (অর্থাৎ তার কথার সঙ্গে কাজকর্মের দিনপঞ্জী কিছুই মেলে না) । কিন্তু সৎ ব্যক্তির মন, কথা এবং কাজকর্মের ভাব সব একই দেখতে পাওয়া যায় ।

* * *

সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্ শুনিস্ত্রীণি গর্দভাৎ

বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেত চত্বারী কুক্কুটাদপি ।। ২৬ ।।

—পশুরাজ সিংহের কাছে একটি বিষয়, বকের কাছে একটি বিষয়, কুকুরের কাছে ছয়টি বিষয়, গাধার কাছে তিনটি বিষয়, কাকের কাছে পাঁচটি বিষয়, মোরগের কাছ থেকে চারটি বিষয় সবারই শিক্ষা নেওয়া উচিত ।

* * *

হস্তৌ দানবর্জ্জিতৌ শ্রুতিং পুটৌ সারস্বত দ্রোহিণৌ

নেত্রে সাধু বিলোকরহিতে পাদৌন তীর্থগতৌ ।

অন্যায়ার্জিত বিত্তপূর্ণ মদরং গর্বেণ তুঙ্গং শিরো

রে রে জম্বুক, মুঞ্চ মুঞ্চ সহসা নীচং সুনিন্দং বপুঃ ।। ২৭ ।।

—যার হস্ত দানবর্জিত, কর্ণ সরস্বতী অর্থাৎ বিদ্যাদ্রোহী, নেত্র সাধু-সন্ন্যাসীর দর্শন রহিত, যার পদযুগল তীর্থভ্রমণে বিরত, যে অন্যায় পথে অর্জিত অর্থে উদর পূর্তি করে, যার মস্তক গর্বে উদ্ধত—ওরে শৃগাল, তোর এ সুনিন্দ বপু ত্যাগ কর ।

* * *

যেষাং শ্রীমদ্যশোদাসুত পদকমলে নাস্তি ভক্তির্নরাণাং

যেষাং মাভীর কন্যা প্রিয়গুণ কথনে নানরক্তা চ জিহ্বা ।

যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলা ললিতরস কথা সাদরো নৈব কর্ণৈ
ধিক্তাং ধিক্তাং ধিকেতান্ কথয়পি সততং কীর্তনস্থো মৃদঙ্গ ॥ ২৮ ॥

—**যশোদাসুত** অর্থাৎ কৃষ্ণের পদকমলে যার ভক্তি নেই, যার রসনা গোপকন্যা অর্থাৎ রাধিকার প্রিয়গুণ কথনে অনুরক্ত নয়, কৃষ্ণলীলার ললিত রস কথা শ্রবণে যার আসক্তি নেই—সংকীর্তনের মৃদঙ্গ এদের উদ্দেশ্যেই ধিক্তাং অর্থাৎ 'তাকে ধিক'—'ধিক তাকে'—এরূপ বোল তোলে।

* * *

ধর্মার্থ কামমোক্ষানাং যস্যৈকোঽপি ন বিদ্যতে।
অজাগল স্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকম্ ॥ ২৯ ॥

—**ধর্ম**-অর্থ-মোক্ষে যে পরাঙ্মুখ, ছাগলের গলায় উদ্ভূত স্তনের মতোই তার জন্ম নিরর্থক।

* * *

ন ধ্যাতং পদমীশ্চরস্য বিধিবৎ সংসার বিচ্ছিত্তয়ে
স্বর্গদ্বার কপাটপাটনপটুঃ ধর্মোঽপি নোপার্জিতঃ।
নারী পীনপয়োধর যুগলং স্বপ্নেঽপি নালিঙ্গিতং
মাতুঃ কেবলমেব যৌবনচ্ছেদ কুঠারোবয়ম্ ॥ ৩০ ॥

—**সংসার** থেকে বিচ্ছিন্ন বা মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে যে পরমেশ্বরের পরিচিন্তনে বীতস্পৃহ, স্বর্গদ্বার উন্মোচিত করে সেখানে প্রবেশ করার জন্য যে ধর্মোপার্জন করে না, যে স্বপ্নেও নারীর স্থূল স্তনযুগল মর্দন করে না—এরূপ সন্তান মাতার যৌবন ছেদক কুঠারের মতো।

* * *

তক্ষকস্য বিষং দন্তে মক্ষিকায়া মুখে বিষম্।
বৃশ্চিকস্য বিষং পুচ্ছে সর্বাঙ্গে দুর্জনে বিষম্ ॥ ৩১ ॥

—**তক্ষকের** বিষ তার দন্তে, মক্ষিকার বিষ তার মুখে, বৃশ্চিকের বিষ তার পক্ষে দুর্জনের বিষ তার সর্বাঙ্গে।

* * *

তৃপ্যন্তি ভোজনে বিপ্রা ময়ূরা ঘনগর্জিতে।
সাধবঃ পরসম্পত্তৌ খলাঃ পর বিপত্তিষু ॥ ৩২ ॥

—**ব্রাহ্মণের** ভোজনে তৃপ্ত হয়, মেঘ গর্জন করলে ময়ূরেরা আনন্দে নৃত্য করে, সাধুরা অপরের সম্পদ-প্রতিপত্তিতে সুখী হন, কপটাচারীরা অপরের দুরবস্থায় আনন্দিত হয়।

* * *

চাণক্য শ্লোক

বিদ্বত্ত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥ ১ ॥

—বিদ্বান এবং রাজা কখনই সমান নন, কেননা রাজা স্বদেশে পূজ্য আর বিদ্বান সর্বত্র পূজ্য। বিদ্বানের সহিত রাজার কোন তুলনা চলে না। বিদ্বান শ্রেয় এবং শ্রেষ্ঠ।

* * *

পণ্ডিতেষু গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাহি কেবলম্।
তস্মাৎ মূর্খসহস্রেভ্যঃ প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

—পণ্ডিত ব্যক্তি সব গুণের আকর, মূর্খদের দোষ ছাড়া আর কিছু নেই। আর তাই সহস্র মূর্খকে ছেড়ে, পণ্ডিতকেই লোকে অধিকতর মর্যাদা দিয়ে থাকে। পণ্ডিত সর্বত্র পূজ্য।

* * *

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥ ৩ ॥

—পরস্ত্রীকে যিনি মায়ের মতো দেখেন, পরের জিনিস যাঁর কাছে মাটির ঢেলার মতো, সর্বভূতে যাঁর নিজের তুল্য মমত্ব, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। নির্লোভ হওয়া পণ্ডিতের অন্যতম গুণ।

কিং কুলেন বিশালেন গুণহীনস্তু যো নরঃ।
অকুলীনোঽপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে ॥ ৪ ॥

—উচ্চকুলে জন্মে কি হবে, যদি গুণ না থাকে! অকুলীন ব্যক্তিও শাস্ত্রজ্ঞ হলে, দেবতাদের দ্বারা পূজিত হয়ে থাকেন। তাই উচ্চকুলে জন্ম হলেই হল না। গুণী হওয়া প্রয়োজন।

*　　　　*　　　　*

রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুল সম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ ॥ ৫ ॥

—যতই রূপযৌবনসম্পন্ন বিশালকুলসম্ভব হোক না কেন, বিদ্যাহীন ব্যক্তি নির্গন্ধ পলাশ ফুলের মতো। মূর্খ কথা বলিলেই সকলের নিকট হাস্যকর হয়ে ওঠে।

শর্ব্বরীভূষণং চন্দ্রো নারীনাং ভূষণং পতিঃ।
পৃথিবীভূষণং রাজা বিদ্যা সর্ব্বস্য ভূষণম্ ॥ ৬ ॥

—রাত্রির ভূষণ চন্দ্র, নারীর ভূষণ পতি, পৃথিবীর ভূষণ রাজা, বিদ্যা সকলের ভূষণ। বিদ্যা থাকলে আর কোন ভূষণ দরকার হয় না।

মাতা শত্রু পিতা বৈরী যেন বলো ন পাঠিতঃ।
ন শোভতে সভামধ্যে হংস মধ্যে বকো যথা ॥ ৭ ॥

—সন্তানের শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে যত্নশীল নয়, এমন পিতামাতা শত্রুতুল্য। পণ্ডিতদের সভায় সে মূর্খ সন্তান হাঁসেদের মাঝে বকের মতো শোভা পায় না।

*   *   *

বরমেকো গুণী পুত্রো নচ মূর্খশতান্যপি।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাঃ সহস্রশঃ ॥ ৮ ॥

শত মূর্খ পুত্র অপেক্ষা একমাত্র গুণীপুত্র কাম্য, কেননা এক চন্দ্র অন্ধকার দূর করে—সহস্র তারাও তা পারে না। গুণীপুত্র সকল সমস্যার সমাধান করে পিতার মুখ উজ্জ্বল করে।

*   *   *

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাস্যতে যদ্বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং তথা ॥ ৯ ॥

—একটি সুবৃক্ষে ফুল ফুটলে যেমন সমস্ত বন আমোদিত হয়, তেমনি একটি মাত্র সুসন্তান সমস্ত বংশকে ধন্য করে। একটি সূর্য যেমন আকাশ ও পৃথিবীকে আলোকিত করে। একটি সন্তান তেমনি একটি সমগ্র বংশকে উজ্জ্বল এবং গৌরবান্বিত করে।

*   *   *

একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা।
দহ্যতে যদ্বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং তথা ॥ ১০ ॥

—একটি কুবৃক্ষের কোটরাগ্নিতে যেমন সারা বন ভস্মীভূত হয়, তেমনি কুপুত্রের দ্বারা সমস্ত কুল ধ্বংস হয়। কুপুত্র কুলের কলঙ্ক স্বরূপ।

*   *   *

সভায়াং শোভতে মূর্খো লম্বসাটপটাবৃতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে ॥ ১১ ॥

—সভাতে যতক্ষণ পর্যন্ত না বলে, ততক্ষণই শোভন সজ্জায় শোভিত মূর্খ শোভা পায়। কথা বললে মূর্খের মূর্খামি প্রকাশিত হয়।

*   *   *

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যম মেধ্যাদপি কাঞ্চনম্।
নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥ ১২ ॥

—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিষ থেকেও অমৃত ছেঁকে নেবে, অস্থান-কুস্থান থেকেও সোনা খুঁজে নেবে, নীচ জাতির কাছ থেকেও বিদ্যা অর্জন করবে, দুষ্কুল থেকেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করবে। যদি তা রত্ন স্বরূপা হয়।
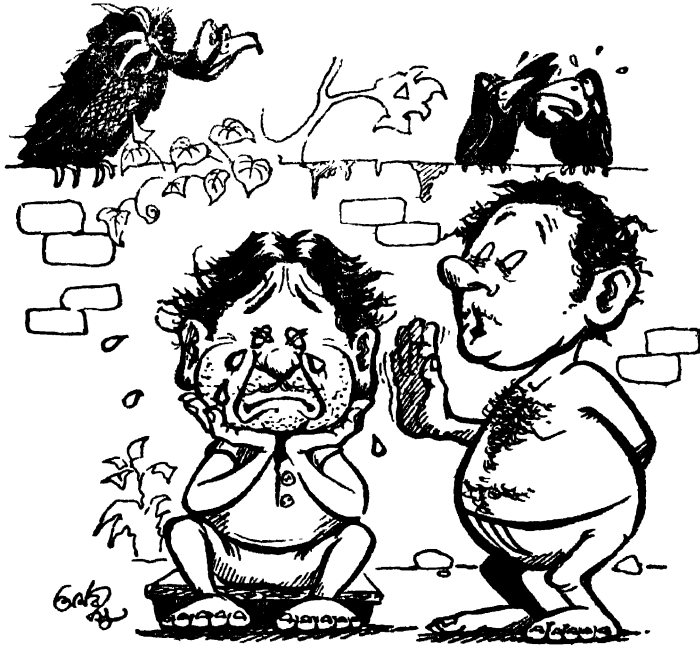
উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে :
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি সবান্ধবঃ। ১৩।।

- উৎসবে-অনুষ্ঠানে, অত্যাসক্তির বিষয়সমূহে, রাজদ্বারে, শ্মশানে, রাষ্ট্রবিপ্লবে শত্রুনিগ্রহে যে অংশীদার হয় সেই প্রকৃত বন্ধু।

পরোক্ষে কার্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্ ।। ১৪ ।।

—প্রত্যক্ষে প্রিয়ভাষী, পরোক্ষে সর্বনাশী বিষকুম্ভ পয়োমুখ এমন বন্ধু পরিত্যাজ্য।

* * *

ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ।। ১৫ ।।

—কেউ কারো মিত্র বা রিপু নয়, ব্যবহারেই একে অপরের বন্ধু বা শত্রু হয়
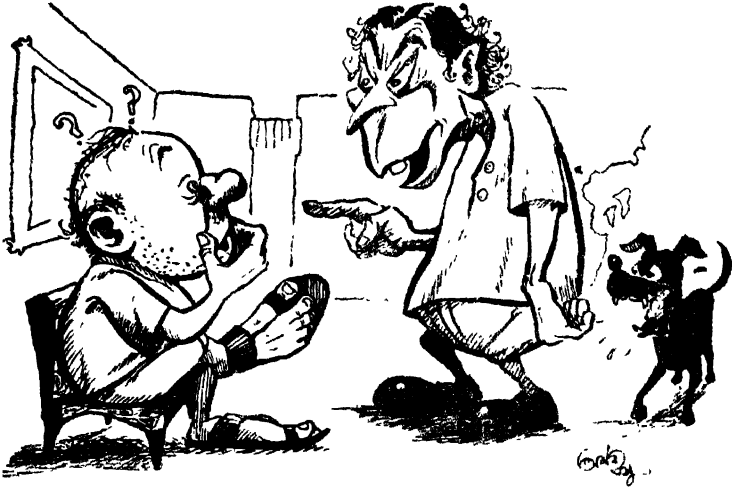
দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্ বিশ্বাসকারণম্ ।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্ ।। ১৬ ।।

দুর্জন প্রিয়বাদী হলেও তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, কেননা জিভে তার মধু, হৃদয় বিষেভরা। দুর্জ্জন মধুভাষী হলেও ক্ষতিকারক এবং সুযোগ সন্ধানী।

* * *

দুর্জ্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যয়ালংকৃতোঽপি সন্ ।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ংকরঃ ।। ১৭ ।।

—বিদ্যায় অলংকৃত হলেও দুর্জ্জনকে ত্যাগ করা উচিত। মণিতে ভূষিত সর্প কি ভয়ংকর নয়! দুর্জ্জন সর্বদা পরিত্যাজ্য।

* *

সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ ।
মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে ।। ১৮ ।।

—সর্প ক্রূর, দুষ্ট জনেরাও ক্রূর, কিন্তু সাপের চেয়েও দুষ্টেরা আর বেশি হিংসক, কেননা মন্ত্র এবং ঔষধে সাপ বশীভূত হয় কিন্তু দুর্জ্জনকে প্রতিহত করা অসম্ভব।

দুর্জনেন সমং বৈরং প্রীতিঞ্চাপি ন কারয়েৎ।
উষ্ণোদহতি চাঙ্গারঃ শীতঃ কৃষ্ণায়তে করম্ ॥ ১৯ ॥

—**দুর্জনের** সঙ্গে শত্রুতা কিংবা বন্ধুত্ব করা অনুচিত। উষ্ণ কয়লায় হাত দিলে হাত পোড়ে আর হাত পুড়লে জ্বালা করে। আবার শীতল হলেও স্পর্শ করলে হাত কালো হয়ে যায়।

* * *

আভিজাত্যং পরং পুংসাং জায়তে সাধুসঙ্গমাৎ।
নূনং ত্রিদশসংসর্গাৎ কুসুমং সুষমং ভবেৎ ॥ ২০ ॥

—**সাধুসঙ্গে** মানুষ অতীব আভিজাত্য লাভ করে। দেবতার সংসর্গে পুষ্প নিশ্চিতই আরও বেশি সৌন্দর্য লাভ করে।

* * *

অসতাং সঙ্গদোষেণ সাধবো যান্তি বিক্রিয়াম।
দুর্যোধন প্রসঙ্গেন ভীষ্মো গো-হরণে গতঃ ॥ ২১ ॥

—**অসৎ** সঙ্গে সাধুরাও বুদ্ধিভ্রষ্ট হন. দুর্যোধনের সঙ্গে ভীষ্মও গোহরণে গিয়েছিলেন।

* * *

শর্করা শতভারেণ নিম্ববৃক্ষ উপার্জ্জিত।
পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে ॥ ২২ ॥

—**শতভার** শর্করায় উৎপন্ন হলে. প্রত্যহ দুগ্ধ সিঞ্চন করিলেও নিম তিক্ততা বর্জন করে মিষ্ট হয় না।

* * *

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥ ২৩ ॥

—পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাই পরম তপ। পিতা প্রীত হলে, সকল দেবতাই সন্তুষ্ট হন।

* * *

ভূমের্গরীয়সী মাতা স্বর্গাদুচ্চতরঃ পিতা।
মাতরং পিতরং বিদ্ধি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্ ॥ ২৪ ॥

পৃথিবী থেকেও মাতা গরীয়সী, স্বর্গ থেকেও উচ্চতর হলেন পিতা। মাতাপিতা প্রত্যক্ষ দেবতা জানবে।

শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সুপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥ ৫ ॥

—যার মধুর বাণীতে কান জুড়ায়, সদাসর্বদা যে প্রিয় আচরণ করে, পিতৃ আজ্ঞা যে লঙ্ঘন করে না, কুলের শোধক সেই সুপুত্র ।

*   *   *

অনাজ্ঞপ্তোঽপি কুরুতে পিত্রোঃ কার্য্যং স উত্তমঃ ।
উক্তঃ করোতি যঃ পুত্রঃ স মধ্যম উদাহৃতঃ ।
উক্তোঽপি কুরুতে নৈব সঃ পুত্র মল উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

—যে পুত্র পিতার আজ্ঞার অপেক্ষা না করেই কার্য সমাধা করে, সে উত্তম পুত্র । যে পুত্র পিতার আদেশে কার্য সম্পাদন করে, সে মধ্যম পুত্রের উদাহরণরূপে উক্ত । যে পুত্র পিতার বাধ্য নয়, সে পুত্র মলরূপে পরিগণিত ।

*   *   *

কোঽর্থঃ পুত্রেন জাতেন যোন বিদ্বান্ ন ভক্তিমান্ ।
কানেন চক্ষুষা কিংবা চক্ষুঃপীড়ৈব কেবলম্ ॥ ২৭ ॥

—যে পুত্র বিদ্বান নয়, ভক্তিমান নয় এমন পুত্র থাকাও যা, না থাকাও তাই । কানা চোখ কেবল চক্ষুপীড়ারই নিদর্শন ।

*   *   *

একমপ্যক্ষরং যং তু গুরুঃ শিষ্যং প্রবোধয়েৎ ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা সোঽনৃণী ভবেৎ ॥ ২৮ ।

গুরু যদি শিষ্যকে একটি অক্ষরও শিখিয়ে থাকেন তাহলে জগতে এমন দ্রব্য বিরল যা দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে ! গুরু ঋণ অপরিশোধ্য ।

*   *   *

গুরোর্যত্র পরিবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে ।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ ॥ ২৯ ॥

—যেখানে গুরুজনের নিন্দা-অপবাদ হয় কানে আঙুল দিয়ে, সে স্থান পরিত্যাগ করে, অন্যত্র গমন করা উচিত ।

*   *   *

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্ ।
নাসমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্ব্বমায়তনং ত্যজেৎ ॥ ৩০ ॥

—বুদ্ধিমান ব্যক্তির এক পা স্থিত, অন্য পায়ে তিনি চলেন —অন্যস্থান ভালো-ভাবে সমীক্ষা না করে পূর্বস্থান ত্যাগ করা অবিধেয়।

* * *

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।
বঞ্চনং চাপমানং চ মতিমান্ প্রকাশয়েৎ ॥ ৩১ ॥

অর্থনাশ, মনস্তাপ, স্বগৃহের কলংক, বঞ্চনা ও অপমানিত হওয়ার ইতিবৃত্ত, বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রকাশ করা উচিত নয়!

* * *

ধনিকং শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ ॥ ৩২ ॥

—**ধনবান,** বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী, বৈদ্য যেখানে নেই সেখানে বাস করা উচিত নয়।

* * *

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানো ন বৃত্তি ন চ বান্ধবঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৩ ॥

যে দেশে সম্মান, জীবিকা অর্জনের পথ, বন্ধু, বিদ্যা আগমনের পথ নেই, সে দেশ বর্জন করা উচিত।

* * *

মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।
অন্যলক্ষিতকার্য্যস্য যতঃ সিদ্ধির্ন জায়তে ॥ ৩৪ ॥

যে কাজ করবে বলে স্থির করছ, কখনই প্রকাশ করবে না, কেননা অপরের লক্ষিত কার্য অন্য কেউ জেনে ফেললে সে কার্য সিদ্ধ হয় না।

* * *

ঋণশেষোঽগ্নিশেষশ্চ ব্যাধিশেষস্তু থৈবচ।
পুনশ্চ বর্দ্ধতে যস্মাৎ তস্মাচ্ছেষং চ কারয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

ঋণ, অগ্নি, এবং ব্যাধির শেষ রাখতে নেই। শেষ রাখলে পুনরায় তা বৃদ্ধি পায়।

* * *

অস্তি পুত্রো বশে যস্য ভৃত্যো ভার্য্যা তথৈবচ।
অভাবে সতি সন্তোষঃ স্বর্গস্থোঽসৌ মহীতলে ॥ ৩৬ ॥

পুত্র, ভৃত্য এবং ভার্য্যা যার বশে, অভাবেও তার চিত্তে সন্তোষ—পৃথিবী তার কাছে স্বর্গ তুল্য।
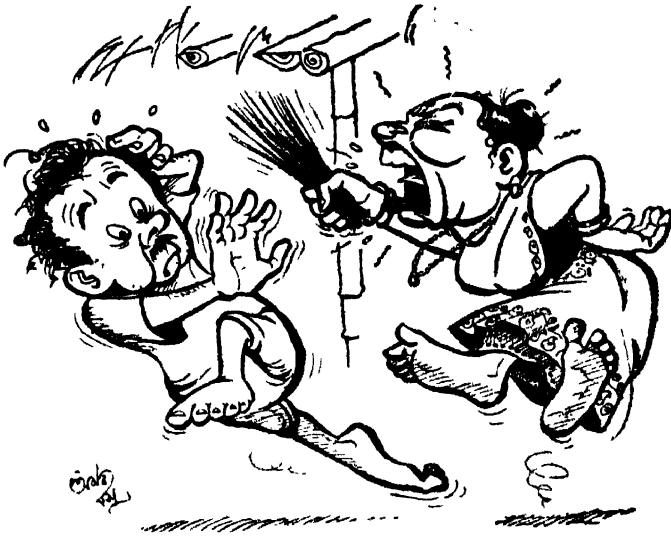
মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যাচাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহং ॥ ৩৭ ।

যার গৃহে মা নেই, স্ত্রী প্রিয়বাদিনী নয়, তার বনে যাওয়াই শ্রেয়ঃ, কেননা তার কাছে বনও যা, গৃহও তাই।

* * *

অর্থাগমো নিত্য মরোগিতা চ।
প্রিয়াচ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ ॥
বশ্যশ্চ পুত্রোহর্থকরী চ বিদ্যা।
ষড় জীবলোকেষু সুখযানি রাজন ॥ ৩৮ ॥

—নিত্য যার অর্থাগম হয়, যার রোগ নেই, ভার্য্যা যার প্রিয়বাদিনী, পুত্র যার বশীভূত, বিদ্যা যাকে অর্থ প্রদান করে, জীবলোকে এই ছয় তার সুখের নিদান।

* * *

ঈর্ষী ঘৃণী ত্বসন্তুষ্টঃক্রোধানো নিত্যাশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে দুঃখভাগিনঃ ॥ ৩৯ ॥

—হিংসক, ঘৃণ্য, অসন্তুষ্ট, কোপন স্বভাব, নিত্যাশঙ্কিত, পরভাগ্যোপজীবী—এই ছয় দুঃখী।

কোকিলানাং স্বরো রূপং নারীরূপং পতিব্রতাম্ ।
বিদ্যারূপং কুরূপনাং ক্ষমা রূপং তপস্বিনাম্ ॥ ৪০ ॥

কোকিলের স্বরই তার রূপ, নারীর রূপ তার পাতিব্রত্য, কুরূপের রূপ বিদ্যা আর তপস্বীদের রূপ ক্ষমা ।

* * *

অবিদ্যং জীবনং শূন্যং দিক্‌শূন্যা চেদবান্ধবা ।
পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা ॥ ৪১ ॥

—**বিদ্যা** নেই যার তার জীবন বৃথা, যার বন্ধু নেই তার সর্বদিক শূন্য, যে বাড়িতে পুত্র নেই সেগৃহ শূন্য আর দরিদ্রের সবই শূন্য ।

* * *

অতি দর্পে হতা লঙ্কা অতি মানেচ কৌরবাঃ
অতি দানে বলির্বদ্ধ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম ॥ ৪২ ॥

—**অতি** দর্পে লঙ্কার বিনাশ হলো, অতি মানে কৌরবেরা ধ্বংস হলো, অতি দানে বলী বন্দী হলো, সবকিছুতে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করলে ফল ভালো হয় না ।

* * *

শৈলে শৈলে না মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে
সাধবো নহি সর্ব্বত্র চন্দনো ন বনে বনে ॥ ৪৩ ॥

—**সব** পাহাড়ে মাণিক্য মেলে না, সব হাতির মাথায় মুক্ত মেলে না, সর্বত্র সাধুর সন্ধান মেলেনা, সব বনে চন্দন গাছ মেলে না ।

* * *

কুলীনৈঃ সহ সম্পর্কং পণ্ডিতৈঃ সহ মিত্রতাং ।
জ্ঞাতিভিশ্চ সমং মেলং কুর্ব্বানো ন বিনশ্যতি ॥ ৪৪ ॥

—**কুলীনের** সঙ্গে যার সম্পর্ক, পণ্ডিতের সঙ্গে যার মিত্রতা, জ্ঞাতিগণের সঙ্গে যে ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ, তার বিনাশের সম্ভাবনা নেই ।

* *

দুর্ব্বলস্য বলং রাজা বালানাং রোদনং বলম্ ।
বলং মূর্খস্য মৌনিত্বং চৌরাণামনৃতং বলম্ ॥ ৪৫ ॥

—**দুর্ব্বলের** বল রাজা, বালকের বল রোদন, মৌনতা মূর্খের বল, চোরের বল মিথ্যা ।

যোধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নস্যান্তি আধ্রুবং নষ্ট মেবহি ॥ ৪৬ ॥

—**নিশ্চিতকে** পরিত্যাগ করে যে অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়, সে অনিশ্চিতকে তো পায়ই না, নিশ্চিতকেও হারায়।

* * *

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ ॥ ৪৭ ॥

—**কেবলমাত্র** অভিলাষেই কার্যসিদ্ধি হয় না, কার্যসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন উদ্যম। সুপ্ত সিংহের মুখে হরিণ প্রবেশ করে না।

* * *

প্রভূতমল্পং কার্য্যং বা যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
সর্ব্বারম্ভেন তৎকুর্য্যাৎ সিংহাদেকং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৮ ॥

—**প্রভূতই** হোক আর অল্পই হোক যে কাজ কেউ করতে ইচ্ছা করে, আন্তরিক প্রয়াসে তার সে কাজ করা উচিত। সিংহের কাজ থেকে এটাই শিক্ষণীয়।

* * *

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বকবৎ পণ্ডিতো জনঃ।
দেশকালোপপন্নানি সর্ব্বকার্য্যানি সাধয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

—**পণ্ডিত** ব্যক্তি সব ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করে, বকের মতো প্রতীক্ষায় থেকে, দেশ কাল এবং স্বীয় শক্তি অনুযায়ী কর্মসম্পাদনে রত হবেন।

* * *

বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাত ব্যাঃ ষট্ শুনো গুণাঃ ॥ ৫০ ॥

—**বহুভোজী** হলেও স্বল্পে সন্তুষ্ট, প্রগাঢ় নিদ্রামগ্ন হলেও শীঘ্রই জেগে ওঠে, প্রভুভক্ত, শক্তির আধার—এই ছয়টি গুণ কুকুরের কাছ থেকে শিক্ষণীয়।

* * *

অবিশ্রামং বহেদ্ভারং শীতোষ্ণং চ ন বিন্দতি।
সসন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণিশিক্ষেত গর্দ্দভাৎ ॥ ৫১ ॥

—**অবিশ্রাম** ভার বহন করে, শীত গ্রীষ্মের বোধ পর্যন্ত যার নেই, সদাই সন্তুষ্ট -গর্দভের কাছ থেকে এই তিন গুণ শিক্ষণীয়।

* * *

যুদ্ধং চ প্রাতরুত্থানং ভোজনং সহ বন্ধুভিঃ ।
স্ত্রিয়মাপদ্গতাং রক্ষেৎ চতুঃ শিক্ষেত কুক্কুটাৎ ॥ ৫২ ॥

—যুদ্ধ, প্রাতে জাগরণ, বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে ভোজন, বিপন্ন স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করা—মোরগের কাছ থেকে এই চারটি গুণ শিক্ষণীয় ।

* * *

কোঽতিভারঃ সমর্থানাং, কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্ ।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং, কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্ ॥ ৫৩ ॥

—যিনি সমর্থ তাঁর কাছে কোনো কিছুই ভার বলে মনে হয় না, স্বীয় কার্যসাধনে যিনি তৎপর তাঁর কাছে কোনো জায়গাই দূর নয়, বিদ্বান বিদেশে গেলেও সমাদর পান আর প্রিয়বাদীদের কাছে পর বলে কেউ নেই ।

* * *

আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়ানাম সংযমঃ ।
তজ্জয়ঃ সম্পদং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্ ॥ ৫৪ ॥

—ইন্দ্রিয়গুলির অসংযম আপদের কারণ । সেগুলিকে জয় করাই হলো সকল সম্পদের পথ । যে পথে ইষ্টলাভ হয়, সেই পথেই গমন কর ।

* * *

ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্নচ ব্যাধিসমো রিপুঃ ।
ন চাপত্যসমঃ স্নেহঃ নচ দৈবাৎ পরং বলং ॥ ৫৫ ॥

—বিদ্যার তুল্য বন্ধু, ব্যাধির সমান শত্রু, সন্তানের মতন স্নেহপাত্র আর দৈব থেকে শ্রেষ্ঠ বল আর নেই ।

* * *

পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং ।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যান তদ্ধনম্ ॥ ৫৬ ॥

পুঁথিগত বিদ্যা পরহস্তগত ধন—কার্যকালে সেই বিদ্যা এবং ধন, ফল প্রদান করে না । যে জ্ঞান নিজের বোধ দ্বারা আত্মস্থ হয়নি তা পর হস্তগত ধনের ন্যায় প্রয়োজনে কাজে লাগে না ।

* * *

সন্তুষ্টৌ পিতরৌ যস্মিননুরক্তাঃ সুহৃদগনাঃ ।
গায়ন্তি যদ্যশো লোকাস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৫৭ ॥

—যাঁর ওপর তাঁর পিতামাতা সন্তুষ্ট, সহৃদগণ যাঁর অনুরক্ত, লোকে যাঁর যশ কীর্তন করে, লোকত্রয়কে তিনিই জয় করেছেন।

*　　　　*　　　　*

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বথা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৫৮ ॥

—সত্যই যার ব্রত, দীনজনের প্রতি যিনি সর্বদা দয়া প্রদর্শন করেন, কাম-ক্রোধকে যিনি বশ করেছেন, লোকত্রয়কে তিনি ইজয় করেছেন।

*　　　　*　　　　*

ক্ষতে প্রহারা নিপতন্ত্যভীক্ষ্ণং ।
ধনক্ষয়ে মূর্চ্ছতি জাঠরাগ্নিঃ ॥
আপৎসু বৈরাণি সমুদ্ভবন্তি ।
ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি ॥ ৫৯ ॥

—ক্ষতস্থানের ওপরেই আঘাত লাগে, টাকা-পয়সা না থাকলেই ক্ষুধা পায়, বিপদের সময়েই অনর্থক শত্রুতা ঘটে, ছিদ্র মিললেই যাবতীয় অনর্থ ঘটে।

*　　　　*　　　　*

বিদ্যাবিবাদায় ধনংমদায় শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায় ।
খলস্য সাধোর্বিপরীতমেতজ্ জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায় ॥ ৬০ ॥

—দুষ্ট লোকের বিদ্যা বিবাদেই নিয়োজিত হয়, তার ঐশ্বর্য অহংকার উৎপন্ন করে, তার শক্তি পরের নির্যাতনেই ব্যয়িত হয় আর সজ্জনের ব্যবহৃত হয় জ্ঞানে-দানে এবং রক্ষণে।

*　　　　*　　　　*

জ্ঞাতিভির্বণ্টাতে নৈব চৌরেনাপি ন নীয়তে।
দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্ ॥ ৬১ ॥

—জ্ঞাতিরা ভাগ করে নিতে পারে না, চোরেরা চুরি করে নিতে পারে না, দানেতেও যার ক্ষয় নেই, বিদ্যা এমন এক মহামূল্যবান রত্নবিশেষ।

*　　　　*　　　　*

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত এব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥ ৬২ ॥

-প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজেকে জরা-মৃত্যুরহিত মনে করে বিদ্যা ও অর্থের চিন্তা করবেন এবং মৃত্যু কেশ ধারণ করেছে এরূপ মনে করে ধর্ম আচরণ করবেন।

* * *

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মঃ পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলিত যদি মেরু শীততাং যাতি বহ্নি
র্ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥ ৬৩ ॥

—সূর্য যদি পশ্চিমে ওঠে, পর্বত-শিখরে যদি পদ্ম ফোটে, মেরু যদি চলমান হয়, বহ্নি যদি শীতল হয়, তবুও সজ্জনের কথার খেলাপ হয় না।

* * *

সুখমাপতিতং সেব্যং দুঃখমাপতিতং তথা।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ৬৪ ॥

—সুখে নিমজ্জিত হয়ে সুখ ভোগ কর, দুঃখে পড়ে দুঃখ ভোগ কর। দুঃখ সুখ চক্রাকারে ঘোরে—দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ আসে।

* * *

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
বিদুষাপি সদা গ্রাহ্যং বৃদ্ধাদপি ন দুর্ব্বচঃ ॥ ৬৫ ॥

—বালকও যদি যুক্তিযুক্ত হিতোপদেশ দেয়, তাহলে বৃদ্ধের দুর্বাক্য উপেক্ষা করে, বিদ্বানের তা গ্রহণযোগ্য।

* * *

বনানি দহতি বহ্নিঃ সখা ভবতি মারুতঃ।
স এব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্ ॥ ৬৬ ॥

—অরণ্যদহন কালে বায়ু সখারূপে অগ্নির সহায়তা করে। সেই বায়ুই দীপকে নেভায়। কারণ দুর্বলের সঙ্গে বন্ধুত্বে গৌরব নেই।

* * *

উপদেশোহি মূর্খস্য প্রকোপায় ন শান্তয়ে।
পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্ ॥ ৬৭ ॥

—উপদেশে মূর্খের উগ্রতা শমপ্রাপ্ত হয় না ; দুগ্ধপানে সাপের কেবল বিষই বাড়ে।

* * *

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষাঃনমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্ক কাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে নতু নম্যতে ।। ৬৮ ।।

—ফলের ভারে বৃক্ষ নত হয়, গুণের গরিমায় গুণীরা নত, শুকনো কাঠ ভেঙে যায়, কিন্তু মচকায় না, মূর্খ বিনাশপ্রাপ্ত হয় তবু বিনত হয় না।

*　　　　*　　　　*

হস্তস্য ভূষণং দানং সত্য কণ্ঠস্য ভূষণম্।
কর্ণস্য ভূষণং শাস্ত্রং ভূষনৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ।। ৬৯ ।

- হাতের অলংকার দান, কণ্ঠের ভূষণ সত্য কথা, শাস্ত্রশ্রবণ কর্ণের আভরণ, অন্য গহনার কি প্রয়োজন।

*　　　　*　　　　*

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্ম্মঃসনাতন ।। ৭০ ।।

—সত্য বলবে, প্রিয় বাক্য বলবে, অপ্রিয় সত্য বলবে না, প্রীতিকর মিথ্যা বলবে না—এই হলো সনাতন ধর্ম।

*　　　　*　　　　*

সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষং তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ ।। ৭১ ।।

—সত্য, মৃদু, প্রিয়, ধীর, হিতকর বাক্য বলবে। আপনার উৎকর্ষ তথা পরনিন্দা বর্জনীয়।

*　　　　*　　　　*

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং মহৎ।
স্থিতির্হি সত্যং ধর্ম্মস্য তস্মাৎ সত্যং ন লোপয়েৎ ।। ৭২ ।।

—সত্যের চেয়ে বড়ো ধর্ম আর কিছু নেই, মিথ্যার চেয়ে বড়ো পাপ আর নেই, ধর্মের স্থিতি সত্যে, তাই সত্যের লোপ করো না।

*　　　　*　　　　*

ক্ষময়া দয়য়া প্রেম্না সূনৃতেনার্জ্জবেন চ।
বশীকুর্য্যাৎ জগৎ সর্ব্বং বিনয়েন চ সেবয়া ।। ৭৩ ।।

—ক্ষমা, দয়া, প্রেম, সত্য, সারল্য, বিনয় আর সেবা দিয়ে জগতকে বশীভূত করবে।

*　　　　*　　　　*

শতং দদ্যান্ ন বিবদেতেতি বিজ্ঞস্য সম্মাতম্ ।
বিনা হেতুমপি দ্বন্দ্বমিতি মূর্খস্য লক্ষণম্ ।। ৭৪ ।

—শত কিছু পরিত্যাগ করতে হলেও, বিজ্ঞ ব্যক্তি বিবাদ করে না আর বিনা কারণে বিবাদ করা মূর্খের লক্ষণ ।

*　　　*　　　*

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্ ।
উদারচরিতানাম্ভু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ।। ৭৫ ।।

—এ আপন, এ পর, সংকীর্ণচিত্ত অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা এরূপে ভাবে উদার চিত্ত যাঁদের পৃথিবীর সকল জীবকেই তাঁরা আত্মীয়-সমান মনে করেন ।

*　　　*　　　*

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়া-সমন্বিতঃ ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে ।। ৭৬ ।।

—ফল এবং ছায়াসমন্বিত মহাবৃক্ষ আশ্রয় নেওয়ার উপযুক্ত । দৈবাৎ ফল না পাওয়া গেলেও ছায়া তো মিলবে ।

*　　　*　　　*

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে ।
ছেত্তুঃ পাশ্বর্গতাচ্ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ ।। ৭৭ ।।

—শত্রুও যদি অতিথি হয়ে বা কোনো কাজে গৃহে আসে তাহলে অতিথি সংকার অবশ্য করণীয় । গাছের পাশে দাঁড়িয়ে ছেদক যখন গাছ কাটে, গাছ কিন্তু তাকে ছায়াদানে কার্পণ্য করে না ।

*　　　*　　　*

অল্পানামপি বস্তুনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা ।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈ র্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ ।। ৭৮ ।।

—ক্ষুদ্র তুচ্ছ বস্তুও সংহতি কার্য সাধনে সক্ষম হয় । তৃণ থেকে রজ্জু প্রস্তুত করে মত্ত হস্তীকে বাঁধা যায় ।

*　　　*　　　*

বহুনামপ্যসারাণাং সমবায়ো রিপুঞ্জয়ঃ ।
বর্ষাধারাধরো মেঘস্তৃণৈরপি নিবার্য্যতে ।। ৭৯ ।।

—**বহু** অসার বস্তুও যদি একত্রিত হয়, তাহলে মিলিত শক্তিতে শত্রুকে জয় করা সম্ভব, তৃণরাশি একত্রিত করে কুটির নির্মিত হলে বর্ষাধারার ধারক মেঘকেও নিবারণ করা যায়।

* * *

ধর্ম্মাদর্থঃ প্রভবতি ধর্ম্মাৎ প্রভবতি সুখম্‌।
ধর্ম্মেণ লভতে সর্বং ধর্ম্মসারমিদং জগৎ ॥ ৮০ ॥

—**ধর্ম** থেকে অর্থ, সুখ সবকিছু পাওয়া যায় ; ধর্মই জগতের সার।

* * *

যুবৈব ধর্ম্মশীলং স্যাদ্‌ অনিত্যাঃ খলু জীবিতম্‌।
কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি ॥ ৮১ ॥

—**জীবন** অনিত্য, কে জানে কার মৃত্যু আগে হবে! তাই যুবাকাল থেকেই ধর্মশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ ॥ ৮২ ॥

—**আদরে** বহু দোষ, তাড়নে বহু গুণ। তাই পুত্র এবং শিষ্যকে তাড়নে বা শাসনে রাখাই বিধেয়।

প্রাজ্ঞে নিযোজ্যমানে হি সন্তি রাজ্ঞস্ত্রয়ো গুণাঃ।
যশঃ স্বর্গনিবাসশ্চ বিপুলশ্চ ধনাগমঃ ॥ ৮৩ ॥

—রাজা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্মে নিয়োগ করলে বিপুল ধনাগম, যশোলাভ ও স্বর্গবাস হয়ে থাকে।

*　　　*　　　*

মূর্খে নিযোজ্যমানে তুত্রয়ো দোষাঃ মহীপতেঃ।
অযশশ্চার্থনাশশ্চ নরকে গমনং তথা ॥ ৮৪ ॥

—রাজা মূর্খ ব্যক্তিকে কর্মে নিয়োগ করলে অপযশ, অর্থনাশ এবং নরক বাস হয়ে থাকে।

*　　　*　　　*

সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং নিত্যং সুখ মরোগিণঃ।
ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ প্রিয়া যস্য তস্য নিত্যোৎসবং গৃহম্ ॥ ৮৫ ॥

—কৃষকের কুটির নিত্য শস্যকণায় পূর্ণ, অরোগীর নিত্য সুখ, পতিব্রতা স্ত্রী যার— গৃহ তার নিত্য উৎসবময়।

*　　　*　　　*

হেলা স্যাৎ কার্য্যনাশায় বুদ্ধিনাশায় নিঃস্বতা।
যাচঞা সাম্মান-নাশায় কুলনাশায় কুক্রিয়া ॥ ৮৬ ॥

—হেলায় কার্যনাশ, নিঃস্বতায় বুদ্ধিনাশ, যাচঞায় সম্মান নাশ এবং কুক্রিয়ায় কুলনাশ হয়।

*　　　*　　　*

প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা, দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনং।
তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং, চতুর্থে কিং করিষ্যতি ॥ ৮৭ ॥

—বাল্যে বিদ্যার্জ্জন, যৌবনে অর্থ উপার্জন, আর বার্ধক্যে পুণ্য সঞ্চয় না করলে, শেষ সময়ে সে কি করবে!

*　　　*　　　*

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৮৮ ॥

—যার নিজস্ব কোনো বুদ্ধি নেই, শাস্ত্র তার কি করবে! তার দৃষ্টিশক্তি নেই দর্পণে তার কি হবে।

*　　　*　　　*

শ্বঃকার্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্।
নহি প্রতীক্ষতে ব্যাপৎ কৃতং তচ্চ ন বা কৃতম্ ॥ ৮৯ ॥

—**আগামীকালের** করণীয় আজই শেষ করা উচিত, বিকালের **কর্তব্য** সকলেই করা বিধেয়। বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হলে তা দূর করা সম্ভব নাও **হতে** পারে। তাই তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ফেলা উচিত।

*　　*　　*

কিং করিষ্যন্তি বক্তারঃ শ্রোতা যত্র ন বিদ্যতে।
নগ্নক্ষপণকে দেশে রজকঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৯০ ॥

—**বক্তারা** কি করবে যদি শ্রোতা না থাকে! সন্ন্যাসীরা যেখানে নগ্ন সেখানে ধোপা কি করবে!

*　　*　　*

স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ ॥ ৯১ ॥

—**বনজ** শাকেই যখন স্বচ্ছন্দে উদরপূর্তি হয়, তখন দগ্ধ উদরের জন্য মহাপাপ করার কাজ কি!

*　　*　　*

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ॥ ৯২ ॥

—**প্রতিদিন** চোখের সামনে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে অথচ সকলেই অমর হতে চায় এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হতে পারে!

*　　*　　*

স্বধর্মে স্থিরতা স্থৈর্য্যম্ ধৈর্য্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
স্নানং মনোমলত্যাগো দানং বৈ ভূতরক্ষণম্ ॥ ৯৩ ॥

—স্থৈর্য হলো স্বধর্মে স্থিরতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হলো ধৈর্য, মনের ময়লা ধোয়াই স্নান, আর ভূতরক্ষণই হলো দান।

*　　*　　*

ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুর্লোভো ব্যাধিরনন্তকঃ।
সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দ্দয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৯৪ ॥

—ক্রোধের মতো দুর্জয় রিপু, লোভের তুল্য ব্যাধি আর নেই। যিনি সর্বভূতের হিতসাধনে রত তিনিই সাধু আর নির্দয় যে, সে অসাধু—এই হলো শাস্ত্রের বাণী।

* * *

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ ৯৫॥

—বেদ বিভিন্ন, স্মৃতিও বিভিন্ন। নানা মুনির নানা মত। ধর্মতত্ত্ব গুহায় নিহিত। মহাজনেরা যে পথে বিচরণ করেছেন সেইটিই পথ।

* * *

কামধেনুগুণা বিদ্যা হ্যকালে ফলদায়িনী।
প্রবাসে মাতৃসদৃশী বিদ্যা গুপ্তং ধনম্ স্মৃতম্॥ ৯৬॥

—কামধেনু যেমন সব সময় দুগ্ধ দান করে, বিদ্যা তেমনি অকালেও ফলদায়ক। প্রবাসে বিদ্যা মাতৃসদৃশী তাই বিদ্যাকে গুপ্তধনরূপে গণ্য করা হয়।

* * *

সুখার্থী বা ত্যজেদ্বিদ্যা বিদ্যার্থী বা ত্যজেৎ সুখম্।
সুখার্থিনঃ কুতো বিদ্যা নাস্তি বিদ্যার্থিনঃ সুখম্। ৯৭॥

—সুখান্বেষীর বিদ্যার প্রত্যাশা করা অনুচিত, বিদ্যার্থীর সুখ পরিত্যাগ করা উচিত, যে সুখ কামনা করে তার বিদ্যা লাভ হয় না তেমনি যে বিদ্যালাভ করতে চায় তার সুখ মেলে না।

* * *

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি চ তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ। ৯৮॥

পাঁচ বছর পর্যন্ত সন্তানকে লালন করা উচিত, তারপর দশবছর শাসনে রাখা উচিত। ষোল বছর বয়সে পুত্রের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করা বিধেয়।

* * *

সুকৃদ্ দুষ্টং সখায়ং যঃ পুনঃ সন্ধাতুমিচ্ছতি।
স মৃত্যুমেব গৃহ্ণাতি হস্তেন ভূজগং যথা॥ ৯৯॥

—বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও যে একবার শত্রুতা করেছে তার সঙ্গে কেউ যদি সন্ধি স্থাপন করে আবার মেলামেশা শুরু করে তাহলে সাপকে হাতে ধরে সে স্বীয় মৃত্যুকেই ডেকে আনে।

* * *

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে ন মিত্রেঽপ্যতি বিশ্বসেৎ।

কদাচিৎ কুপিতং মিত্রং সর্বদোষং প্রকাশয়েৎ ॥ ১০০ ॥

অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, বন্ধুকেও অতিরিক্ত বিশ্বাস করা অনুচিত। কেননা রেগে গেলে বন্ধুও সকল দোষ প্রকাশ করে দেয়।

* * *

জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যাং বান্ধবং ব্যসনাগমে।

আপৎকালেষু মিত্রঞ্চ ভার্য্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে ॥ ১০১ ॥

—ভৃত্যকে কাজে পাঠালে সে যদি সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদন করে তাহলে সে যথার্থ ভৃত্য, মৃগয়া দ্যূতক্রীড়া দিবানিদ্রা পরনিন্দা নৃত্য গীত ক্রীড়া বৃথা ভ্রমণ বেশ্যা মদ্য ইত্যাদি ব্যসনেই বন্ধুর পরীক্ষা হয়, বিপদের মাঝেই মিত্রের পরিচয় মেলে, ধনক্ষয়ে চেনা যায় পত্নীকে।

* * *

উপকার গৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ।

পাদলগ্নং করস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ ॥ ১০২ ॥

—কোনো একজন শত্রুর উপকার করে, তাকে বশ করে, আবার তাকে দিয়েই

অন্য শত্রুকে জয় করবে। পায়ে একটা কাঁটা বিঁধলে হাতে অন্য একটি কাঁটা নিয়ে সেটি দিয়ে পায়ের কাঁটা বের করতে হয়।

*   *   *

নখিণাং চ নদীনাং চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রধারিণাম্।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যো স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ ॥ ১০৩ ॥

—বাঘ, সিংহ, কুকুর, বেড়াল প্রভৃতি পশু যাদের নখ আছে, গোরু মহিষ ইত্যাদি শৃঙ্গধারী পশু, যার হাতে অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে, স্ত্রীলোক এবং রাজকুলের কারোকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

*   *   *

হস্তী হস্তসহস্রেণ শতহস্তেন ঘোটকঃ।
শৃঙ্গী চ দশহস্তেন স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনঃ ॥ ১০৪ ॥

—হাতি থেকে হাজার হাত, ঘোড়া থেকে একশ হাত, শৃঙ্গধারী পশুদের থেকে দশ হাত দূরে থাকবে এবং স্থান ত্যাগ করে দুর্জ্জনকে উপেক্ষা করবে।

*   *   *

আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্ দারান্ রক্ষেদ্ ধনৈরপি।
আত্মানাং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি ॥ ১০৫ ॥

—বিপদ-আপদের জন্য অর্থসঞ্চয় করা উচিত, অর্থ দিয়ে স্ত্রী রক্ষণীয়, আত্মরক্ষার্থে অর্থাৎ ধর্ম রক্ষার্থে প্রয়োজনবোধে স্ত্রী এবং অর্থকেও বিসর্জন দেওয়া চলে।

*   *   *

পরনারীং পরদ্রব্যং পরিবাদং পরস্য চ।
পরিহাসং গুরোঃ স্থানে চাপল্যং চ বিবর্জয়েৎ ॥ ১০৬ ॥

—পরনারী, পরদ্রব্য অথবা পরনিন্দা বর্জনীয়। গুরুজনের সামনে হাস্য পরিহাস চপলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। অতিলোভ ও পরস্পাহরণ বর্জনীয়।

*   *   *

ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥ ১০৭ ॥

—কুলের জন্য প্রয়োজন হলে সেই কুলের একজনকে ত্যাগ করা বিধেয়। গ্রামের প্রয়োজনে কুলত্যাগ বাঞ্ছনীয়। জনপদের প্রয়োজনে গ্রামকেও ত্যাগ করতে হবে; আর আত্মার্থে পৃথিবীকেও পরিত্যাগ করবে।

লুব্ধমর্থেন গৃহ্ণীয়াৎ ক্রুদ্ধমঞ্জলিকর্ম্মণা।
মূর্খং ছন্দানুবর্ত্তেন তথা সত্যেন পণ্ডিতম্‌ ॥ ১০৮ ॥

—অর্থ দিয়ে লোভীকে, ক্রুদ্ধকে কৃতাঞ্জলি হয়ে, মূর্খকে তোষামোদ করে আর পণ্ডিতকে সত্য দিয়ে তুষ্ট করবে। যে যেভাবে তুষ্ট তাকে তা করবে।

*　　　*　　　*

ধনধান্য-প্রয়োগেষু বিদ্যা-সংগ্রহণেষু চ।
আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সদা ভবেৎ ॥ ১০৯ ॥

—ধন ও ধান্যের আদান-প্রদানে, বিদ্যা সংগ্রহকালে, আহারে, রাজবিধি ও আইন কানুনের প্রয়োগে সর্বদাই লাজ-লজ্জা বিসর্জন দেবে। সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করবে।

*　　　*　　　*

কুদেশং চ কুবৃত্তিং চ কুভার্যাং চ কুনদীং তথা।
কুদ্রব্যং কুভোজ্যং চ বর্জ্জয়েৎ সুবিচক্ষণঃ ॥ ১১০ ॥

-বিচক্ষণ ব্যক্তি কুদেশে বাস, কুবৃত্তি গ্রহন, কুভার্য্যা, কুনদী, কুদ্রব্য এবং জ্য বর্জন করবেন। সঙ্গদোষে শিলা ভাসে। কুসঙ্গ পরিত্যাজ্য।

*　　　•　　　*

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্‌ বাক্যং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ১১১ ॥

—পথ ভালোভাবে দেখে তবে পা ফেলা উচিত, জল বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছেঁকে তবেই পান করা বিধেয়, সত্যকথা বলা উচিত এবং পছন্দসই কাজই করণীয়।

*　　　*　　　*

দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসঃ মৃত্যুরেব ন সংশয় ॥ ১১২ ॥

—যার স্ত্রী দুষ্ট, মিত্র প্রতারক, ভৃত্য অবাধ্য এবং অবিনয়ী, যার গৃহে সর্পের অধিষ্ঠান তার মৃত্যু যে আসন্ন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

*　　　*　　　*

ত্যজ দুর্জ্জন-সংসর্গং ভজ সাধু-সমাগমম্‌।
কুরুপুণ্যে মহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাম্‌ ॥ ১১৩ ॥

—দুর্জনের সংসর্গ বর্জনীয়, সাধুগণের সঙ্গ করা উচিত। অনিত্যতার কথা নিত্য স্মরণ করে, অহোরাত্র পুণ্যকর্ম করবে।

*　　　　*　　　　*

ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞঃ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ।। ১১৪ ।।

—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, সবই বিনাশের সম্মুখীন হবে জেনে, ধন ও জীবন পরার্থে উৎসর্গ করেন।

*　　　　*　　　　*

আদাতৃতা বংশদোষাদ্ কর্ম্মদোষাদ্ দরিদ্রতা।
ক্ষিপ্ততা মাতৃদোষচ্চ পিতৃদোষাচ্চ মূর্খতা ।। ১১৫ ।।

—কুলদোষে দাতা হওয়া যায় না, কর্মদোষে মানুষ দরিদ্র হয়, মাতৃদোষে হয় উন্মত্ত আর পিতৃদোষে হয় মূর্খ।

*　　　　*　　　　*

যদি নিত্যমনিত্যেন নির্ম্মলং মলবাহিনা।
যশঃ কায়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধং ভবেন্নু কিম্ ।। ১১৬ ।।

দেহ বিনাশী এবং মলবাহক। তাই এই কায়ায় যদি যশোলাভ করা যায় তাহলে তার চেয়ে অধিকতর মঙ্গলময় আর কি হতে পারে।

*　　　　*　　　　*

গুরুরগ্নি দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরুঃ।
পতিরেকোগুরু স্ত্রীণাং সর্ব্বেষাম্ অতিথি গুরুঃ ।। ১১৭ ।।

— অগ্নি হলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইত্যাদি দ্বিজাতির গুরু, ব্রাহ্মণ হলেন সকল বর্ণের গুরু, স্ত্রীর গুরু পতি আর সকলের গুরু অতিথি।

*　　　　*　　　　*

বিদ্যা মিত্রং প্রবাসেষু মাতা মিত্রং গৃহেষু চ।
ব্যাধিতস্যৌষধং মিত্রং ধর্ম্মো মিত্রং মৃতস্য চ ।। ১১৮ ।।

—প্রবাসে বিদ্যাই মিত্র, গৃহের মিত্র মাতা, ব্যাধির মিত্র ঔষধ, প্রয়াণকালে ধর্মই মিত্র। বিদেশে জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তি সমাদর পান। তাই প্রবাসে বিদ্যাই সম্বল ও সুহৃদ।

*　　　　*　　　　*

পুত্র-প্রয়োজনা দারাঃ পুত্রঃ পিণ্ড-প্রয়োজনঃ।
হিত-প্রয়োজনং মিত্রং ধনং সর্ব্ব-প্রয়োজনম্ ॥ ১১৯ ॥

—**পুত্রার্থে** বিবাহের প্রয়োজনীয়তা, পিণ্ডদানের জন্য পুত্রের প্রয়োজন, হিত-সাধনের নিমিত্ত বন্ধুর আর সকল প্রয়োজনের জন্য অর্থের আবশ্যক।

* * *

দুর্লভং সুনৃতং বাক্যং দুর্লভঃ পণ্ডিতঃ সুতঃ।
দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যা দুর্লভঃ স্বজনঃ প্রিয়ঃ ॥ ১২০ ॥

সত্যও হবে আবার প্রিয়ও হবে এমন বাক্য দুর্লভ। পণ্ডিত পুত্র, অনুরূপ স্ত্রী এবং প্রিয় স্বজনও দুর্লভ।

* * *

অশোচ্যো নির্ধনঃ প্রাজ্ঞোঽশোচ্যঃ পণ্ডিত-বান্ধবঃ।
অশোচ্যো বিধবা নারী পুত্রপৌত্র-প্রতিষ্ঠিতা ॥ ১২১ ॥

—**প্রাজ্ঞ** ব্যক্তি যদি ধনহীন হয়, যার বন্ধু পণ্ডিত এবং যে বিধবার পুত্রপৌত্র থাকে তাদের জন্য খেদ করা অর্থহীন।

* * *

অবিদ্যঃ পুরুষঃ শোচ্যো নারী চানপত্যা।
নিরাহারাঃ প্রজাঃ শোচ্যাঃ শোচ্যং রাষ্ট্রমরাজকম্ ॥ ১২২ ॥

বিদ্যাহীন পুরুষ, অপুত্রক নারী, অনাহারী প্রজা, অরাজক রাষ্ট্রের জন্য শোক করা উচিত।

* * *

কষ্টা বৃত্তি পরাধীনা কষ্টো বাসঃ নিরাশ্রয়ঃ।
ব্যাপারো নির্ধনঃ কষ্টঃ সর্ব্বকষ্টা দরিদ্রতা ॥ ১২৩ ॥

— **পরাধীন** বৃত্তি, নিরাশ্রয় বাস, অর্থশূন্য অবস্থায় কোনো কাজে রত হওয়া, সর্বোপরি দারিদ্র্য কষ্টকর। পরাধীনতা ও অর্থশূন্যতার ন্যায় অসহায়তা আর কিছু নাই।

* * *

তস্করস্য কুতো ধর্ম্মো দুর্জ্জনস্য কুতঃ ক্ষমা।
ঘাতকানাং কুতঃ স্নেহঃ কুতঃ সত্যঞ্চ কামিনাম্ ॥ ১২৪ ॥

—তস্করের ধর্মজ্ঞতা থাকে না, দুর্জন ব্যক্তি ক্ষমাশীল হয় না, ঘাতকের স্নেহ থাকে না এবং বিষয়ী ব্যক্তি সত্যবাদী হয় না। এই সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার।

*   •   *

কার্য্যং প্রভূতমল্পং বা যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
সর্ব্বারম্ভেণ তৎ কুর্যাৎ সিংহাদেকং প্রচক্ষতে ॥ ১২৫ ॥

—প্রভূতই হোক আর অল্পই হোক, যে কাজ করবে বলে স্থির করেছ, সবার আগে তা করবে। সিংহের কাজ থেকে এটি শিক্ষণীয়। কাজ ফেলে রাখলে ক্ষতি হয়! কাজ হয় না।

*   *   *

লক্ষ্যৈকদর্শিতাং ধার্ষ্ট্যং যথাকালে চ সংগ্রহম্।
অপ্রমাদমনালস্যং পঞ্চ শিক্ষেৎ বায়সাৎ ॥ ১২৬ ॥

—লক্ষ্যের প্রতি একাগ্রদৃষ্টি, লজ্জাহীনতা, যথা সময়ে সংগ্রহ করার একনিষ্ঠতা, সতর্কতা, এবং নিরলস শ্রম—এই পাঁচটি বিষয় কাকের কাছ থেকে শিক্ষণীয়।

*   *   *

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
সত্যমেতানি গেহেষু নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥ ১২৭ ॥

—তৃণাসন, ভূমি, জল এবং সত্যবাক্য, সৎ ব্যক্তির আলয়ে এই চারিটি সুলভ্য।

*   *   *

আপদাং কথিতঃ পন্থ ইন্দ্রিয়াণাম্ অসংযমঃ।
তজ্জয় সম্পদাং মার্গোযেনেষ্টা তেন গম্যতাম্ ॥ ১২৮ ॥

—ইন্দ্রিয়সমূহের অসংযমে বিপদ অনিবার্য, সেগুলিকে জয় করলে সম্পদের পথ মেলে। তাই ইষ্টপথেই গমন করা উচিত। ইন্দ্রিয় সংযম দরকার ও অসংযম পরিত্যজ্য।

*   *   *

ষড় দোষা পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসুত্রতা ॥ ১২৯ ॥

—স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অর্থাৎ নিজের ভালো চাইলে পুরুষের নিদ্রা, তন্দ্রা ভয় ক্রোধ আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা পরিত্যজ্য।

*   *   *

ন প্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্ ।
আপৎসু চ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৩০ ॥

—**অপ্রাপণীয়**কে পাবার আকাঙ্ক্ষা যাঁদের নেই, যা বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে তার জন্যে যাঁদের দুঃখ নেই, বিপদে পড়ে যাঁরা মুহ্যমান হয় না—তাঁরাই বুদ্ধিমান এবং স্থিতধি ।

*　　*　　*

সমুদ্রাবরণা ভূমিঃ প্রাকারাবরণং গৃহম্ ।
নরেন্দ্রাবরণো দেশশ্চরিত্রাবরণা বধূঃ ॥ ১৩১ ॥

—**পৃথিবীর** আবরক সমুদ্র, গৃহকে ঘিরে রাখে প্রাচীর, রাজা দেশের আবরণ, বধূর আচ্ছাদন তার চরিত্র । আবরণ ও আভরণ সুখের কারণ ।

*　　*　　*

অবংশে পতিতো রাজা মূর্খস্য পণ্ডিতো সুতঃ ।
নির্ধনশ্চ ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ মন্যতে জগৎ ॥ ১৩২ ॥

—**হীনবংশ** সম্ভূত ব্যক্তি রাজা হলে, মূর্খের সন্তান বিদ্বান হলে, নির্ধন ধনের অধিকারী হলে জগৎকে তৃণজ্ঞান করে ।

*　　*

ব্রহ্মহাপি নর পূজ্য যস্যাস্তি বিপুলং ধনম্ ।
শশিনঃ সমবংশোঽপি নিধনঃ পরিভূয়তে ॥ ১৩৩ ॥

—**বিপুল** ঐশ্বর্যের অধিকারী ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণকেও হত্যা করে, অর্থসংগতি বলে সে পূজোর মান পেয়ে থাকে আর নির্ধন ব্যক্তি নিষ্কলুষ চন্দ্রবংশে জন্মালেও নিন্দার্হ !

*　　*　　*

পাদপানাং ভয়ং বাতাৎ পদ্মানাং শিশিরাদ্ভয়ম্ ।
পর্ব্বতানাং ভয়ং বজ্রাৎ সাধূনাং দুর্জ্জনাদ্ ভয়ম্ ॥ ১৩৪ ॥

—**ঝড়ের** ভয়ে বৃক্ষরাজি ত্রস্ত, শিশিরের ভয়ে পদ্মফুলগুলি শঙ্কিত, বজ্রপাতের আশঙ্কায় পর্বত ভীত আর সাধুরা দুর্জনের ত্রাসে ভয়গ্রস্ত ।

*　　*　　*

অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষং যদি দৃশ্যতে ।
শিলা তরতি পানীয়ে গীতং গায়তি বানরঃ ॥ ১৩৫ ॥

—জলে পাথর ভাসছে, বানরে সঙ্গীত চর্চা করছে –এহেন অসম্ভব কোনো কিছু প্রত্যক্ষ করলে তা বলা উচিত নয়।

* * *

নদীকূলে স্থিতো বৃক্ষঃ পরহস্তগতং ধনম্।
কার্য্যং স্ত্রীগোচরং যৎ স্যাৎ সর্ব্বং তদ্ বিফলং ভবেৎ ॥ ১৩৬ ॥

—নদীকূলে বৃক্ষের অবস্থিতি, পরহস্তগত ধন এবং কোনো কাজ স্ত্রীলোকের গোচরীভূত হলে তা বিফল হয়।

* * *

কুদেশমাসাদ্য কুতোঽর্থসঞ্চয়ঃ।
কুপুত্রমাসাদ্য কুতো জলাঞ্জলিঃ ॥
কুগেহিনীং প্রাপ্য গৃহে কুতঃ সুখম্।
কুশিষ্যমধ্যাপয়তঃ কুতো যশ ॥ ১৩৭ ॥

—কুদেশে গেলে অর্থসঞ্চয় করা যায় না, কুপুত্র জাত হলে পিতার শ্রাদ্ধাদি কর্ম নিষ্পন্ন হয় না, কুগৃহিণীর গৃহে সুখ মেলে না, কুশিষ্যের অধ্যাপনা কার্যে রত হলে গুরুর যশোলাভ হয় না।

* * *

প্রদোষে নিহতঃ পন্থা পতিতা নিহতা স্ত্রিয়ঃ।
অল্পবীজং হতং ক্ষেত্রং ভৃত্য দোষাদ্ধতঃ প্রভুঃ ॥ ১৩৮ ॥

—সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় পথ স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে না, পতিতা নারীর জীবন ব্যর্থ, ক্ষেত্রে অল্প বীজ বপন করলে ভালো ফসল পাওয়া যায় না আর ভৃত্যের দোষে প্রভুর অনিষ্ট হয়।

* * *

হতং অশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং হতো যজ্ঞস্তু দক্ষিণঃ।
হতা রূপবতী বন্ধ্যা হতং সৈন্যমনায়কম্ ॥ ১৩৯ ॥

—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিষ্পাদক না হলে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়, দক্ষিণা-বিহীন যজ্ঞ বিফল হয়, রূপবতী যদি বন্ধ্যা হয় তাহলে তার রূপ ব্যর্থ, আর সেনাপতি না থাকলে সৈন্যদলও গতিহীন হয়ে পড়ে।

* * *

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো জপহোমপরায়ণঃ।
আশীর্ব্বাদপরো নিত্যং এষ রাজপুরোহিতঃ ॥ ১৪০ ॥

—বেদবেদাঙ্গ তত্ত্বজ্ঞ, জপহোমপরায়ণ, নিত্য আশীর্বাদকই রাজপুরোহিত হবার যোগ্য।

*   *   *

কুলশীলগুণোপেতঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ।
প্রবীণঃ প্রেষণাধ্যক্ষো ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিধীযতে ।। ১৪১ ।।

—সদ্‌বংশে যাঁর জন্ম, যিনি সাধুচরিত্র, গুণালংকৃত, ধর্মনিষ্ঠ, প্রবীণ, আদেশ দানে পটু—তিনিই ধর্মাধ্যক্ষরূপে বিবেচিত।

*   *   *

আয়ুর্ব্বেদ কৃতাভ্যাসঃ সর্ব্বেষাং প্রিয়দর্শনঃ।
আর্যশীলগুণোপেত এষ বৈদ্যো বিধীয়তে ।। ১৪২ ।

—আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য যাঁর গভীর, যিনি প্রিয়দর্শন, শিষ্টাচারী, সচ্চরিত্র তিনিই বৈদ্য হবার উপযুক্ত।

*   *   *

সকৃদুক্ত গৃহীতার্থো লঘুহস্তো জিতাক্ষরঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী প্রকৃষ্টো লেখকঃ স্মৃতঃ ।। ১৪৩ ।।

—একবার মাত্র উক্ত বক্তব্যের অর্থ যাঁর বোধগম্য, যিনি অতি দ্রুত লিখতে পারেন, মনোরম যাঁর হস্তলিপি, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ সেই ব্যক্তিই লেখক হবার যোগ্য।

*   *   *

সমস্তনীতিশাস্ত্রজ্ঞো বাহনে রহিত ক্লমঃ।
শৌর্যবীর্যগুণোপেতঃ সেনাধ্যক্ষো বিধীয়তে ।। ১৪৪ ।।

—সমস্ত নীতিশাস্ত্র যাঁর সুবিদিত, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি বাহনে চড়তে যাঁর কোনো ক্লান্তি নেই, শৌর্য ও বীর্যবান ব্যক্তিই সেনাধ্যক্ষ হবার উপযুক্ত।

*   *   *

মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ পরচিত্তোপলক্ষকঃ।
ধীরো যথোক্তবাদী চ দূত এষ প্রকীর্ত্তিতঃ ।। ১৪৫ ।।

—মেধাবান, বাক্‌পটু, জ্ঞানী, পরের মনে কি আছে যিনি সহজেই বুঝতে পারেন, যিনি ধীর ও সত্যবাদী তিনিই দূত রূপে প্রকীর্তিত।

*   *   *

পুত্রপৌত্রগুণোপেতঃ শাস্ত্রজ্ঞো মিষ্টপাচকঃ।
শূরশ্চ কঠিনশ্চৈব সূপকারঃ স উচ্যতে ।। ১৪৬ ।।

পুত্র এবং পৌত্র আছে যার, যে শাস্ত্রজ্ঞ, উপাদেয় রন্ধনে যে পটু, বলবান্, শক্ত-সামর্থ্য এমন পুরুষকেই যোগ্য পাচকরূপে গণ্য করা হয়।

*　　　*　　　*

ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
সময়জ্ঞঃ সাবধানঃ প্রতিহারী স উচ্যতে ॥ ১৪৭ ॥

—আকারে ইঙ্গিতে ভাবে —ভঙ্গিতে যে কথা বোঝে, যে বলবান, প্রিয়দর্শন, সময়জ্ঞ এবং সাবধানী, সে-ই প্রতিহারী হবার উপযুক্ত।

*　　　*　　　*

শ্রূয়তাং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং শ্রুত্বা চ হৃদি ধার্য্যতাম্।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি ন পরেষাং সমাচরেৎ ॥ ১৪৮ ॥

—সব ধর্ম্মের সার কথা শুনে তা হৃদয়ঙ্গম কর। অপরের প্রতিকূল আচরণে যে কষ্ট পেয়েছে, সেকথা মনে রেখে, কারুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করো না।

*　　　*　　　*

নির্গুণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।
ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চণ্ডালবেশ্মনি ॥ ১৪৯ ॥

—চন্দ্র যেমন চণ্ডালের গৃহেও জ্যোৎস্না দানে কার্পণ্য করে না, তেমনি সাধুরা নির্গুণেও দয়া বিতরণ করেন।

*　　　*　　　*

যথা খাত্বা খনিত্রেণ ভূতলে বারি বিন্দতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি ॥ ১৫০ ॥

মাটি খুঁড়লে যেমন জল পাওয়া যায়, তেমনি গুরুকে সেবা করলে বিদ্যালাভ করা যায়। গুরু সেবা ভিন্ন বিদ্যালাভ সফল হয় না।

*　　　*　　　*

আয়ুষঃ ক্ষণ একোঽপি ন লভ্য স্বর্ণকোটিভিঃ।
ন চেন্নিরর্থকং নীতি কা চ হানিস্ততোঽধিকা ॥ ১৫১ ॥

—আয়ু ফুরালে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও তা আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। তেমনি আলস্যে-হেলায় জীবন কাটালে তার চেয়ে অধিকতর নিরর্থক আর কি হতে পারে!

*　　　*　　　*

অহোবত বিচিত্রাণি চরিত্রাণি মহাত্মনাম্।
লক্ষ্মীং তৃণায় মন্যন্তে তদ্ভারেণ নমন্তি চ ॥ ১৫২ ॥

—**মহাত্মাদের** চরিত্র বড়োই বিচিত্র। অতুল ঐশ্বর্যকে তাঁরা তৃণজ্ঞান করেন এবং বৈভবের ভারে তাঁরা অবনতই হন।

* * *

তে পুত্রা যে পিতুর্ভক্তাঃ স পিতা যস্তু পোষকঃ।
তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ সা ভার্য্যা যত্র নির্বৃতিঃ ॥ ১৫৩ ॥

—**সেই** যথার্থ পুত্র যে পিতৃভক্ত, তিনিই পিতা যিনি উত্তম পালক, বিশ্বাস-ভাজনই মিত্র, শান্তি দান করেন যিনি তিনিই সত্যিকারের স্ত্রী।

* * *

সাধনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হিসাধবঃ।
তীর্থং ফলতি কালেন সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ ॥ ১৫৪ ॥

—**সাধুদের** দর্শনেই পুণ্য। সাধুরা তীর্থসদৃশ। তীর্থ দর্শনের ফল পেতে বিলম্ব হয়, কিন্তু সাধুসঙ্গের ফল সদ্যই ফলে।

* * *

সৎসঙ্গঃ কেশবে ভক্তির্গঙ্গাম্ভসি নিমজ্জনম্।
অসারে খলু সংসারে ত্রীণি সারাণি ভাবয়েৎ ॥ ১৫৫ ॥

—**অসার** এই সংসারে সৎসঙ্গ করা, কৃষ্ণ ভক্তি এবং প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, সর্ব সার রূপে পরিগণিত !

* * *

প্রিয়বাক্য-প্রদানেন সৰ্ব্বে তুষ্যন্তি জন্তবঃ।
তস্মাত্তদেব বক্তব্য বচনে কিং দরিদ্রতা ॥ ১৫৬ ॥

—**প্রিয়বাক্যে** সকলেই তুষ্ট হয় তাই মধুর বচনে কার্পণ্য করা উচিত নয়।

* * *

পাপেঽপ্য পাপঃ পুরুষেঽভিধত্তে প্রিয়াণি যঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য স্বর্গ ইহৈব হি ॥ ১৫৭ ॥

—**অনিষ্ট** সাধকের সঙ্গেও যিনি প্রিয় ব্যবহার করেন, পুরুষ বাক্যের প্রতিদানে যিনি সুমধুর বাক্য ব্যবহার করেন, হৃদয় যাঁর প্রেমে পূর্ণ ইহলোক তাঁর কাছে স্বর্গ-সদৃশ।

* * *

পরোপকরণং যেষাং জাগর্ত্তি হৃদয়ে যতান্।
নশ্যন্তি বিপদ স্তেষাং সম্পদঃ সুঃ পদে পদে ॥ ১৫৮ ॥

—যাঁর হৃদয়ে সততই পরোপকার স্পৃহা জাগরূক, তাঁর বিপদ দূরীভূত হয় এবং পদে পদেই তিনি সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকেন।

*　　　*　　　*

নিগুর্ণস্য হতং রূপং দুঃশীলস্য হতং কুলম।
অসিদ্ধস্য হতো বিদ্যা হ্যাভোগেন হতং ধনম্ ॥ ১৫৯ ॥

—নির্গুণের রূপে কি হবে। দুঃশীলের আবার বংশগৌরব। কুৎসিত অনুষ্ঠানে যে লিপ্ত, বিদ্যালাভ তার বিফল। ভোগহীনের ধন সঞ্চয়ে কি লাভ।

*　　　*　　　*

স জীবতি গুণা যস্যা ধর্মো যস্য স জীবতি।
গুণ-ধর্মবিহিনস্য জীবনং নিস্প্রয়োজনম্ ॥ ১৬০ ॥

—তিনিই অমর যিনি গুণী ও ধার্মিক। গুণ-ধর্মবিহীন জীবন বিফল।

*　　　*　　　*

শান্তিতুল্যং তপো নাস্তি ন সন্তোষাৎ পরং সুখম্।
ন তৃষ্ণায়াঃ পরো ব্যাধির্ন চ ধর্মো দয়াসম ॥ ১৬১ ॥

—শান্তির তুল্য তপ আর নেই, সন্তোষের চেয়ে পরম সুখ আর নেই, কামনার চেয়ে বড়ো ব্যাধি আর নেই, দয়ার মতো ধর্ম আর নেই।

*　　　*　　　*

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা কন্যাদাতা তথৈব চ।
জনয়িতোপনীতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৬২ ॥

—ক্ষুধায় যে কাতর তাকে যিনি অন্নদান করেন, ভয় থেকে যিনি উদ্ধার করেন, যিনি কন্যা সম্প্রদান করেন, উপবীত দান করেন, আর যিনি জন্মদাতা—এই পাঁচ জন পিতারূপে গণ্য হন।

আত্মমাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা।
ধেনুর্ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৬৩ ॥

—নিজের মা, গুরুর পত্নী, ব্রাহ্মণের স্ত্রী, রাজার বধূ, গোরু, ধাত্রী এবং পৃথিবী—এই সাত ধর্মসংহিতা উক্ত মাতা।

*　　　*　　　*

অপদার্থে ধনং রক্ষেচ্ছ্রয়পশ্চ কিমাপদঃ।
কদাচিচ্চলিত লক্ষ্মী সঞ্চিতাঽপি বিনশ্যতি ॥ ১৬৪ ॥

—আপদ-বিপদের জন্য অর্থ সঞ্চয় এবং তা রক্ষা করা উচিত। কেননা লক্ষ্মী নিয়তই অস্থির! যে কোনো মুহূর্তে তাই সঞ্চিত অর্থও নাশপ্রাপ্ত হতে পারে!

* * *

সমঃ শত্রৌচ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেসু পণ্ডিতঃ সমবস্থিতঃ ॥ ১৬৫ ॥

—যিনি যথার্থ জ্ঞানী তিনি শত্রু মিত্র উভয়ের সঙ্গেই সমান ব্যবহার করেন, মান অপমানেও তিনি অসন্তুষ্ট বা বিমুখ হন না, শীত-গ্রীষ্মে দুঃখ-সুখে তিনি নির্বিকার ও অচঞ্চল।

* * *

অনিত্যাণি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্মসঞ্চয়ঃ ॥ ১৬৬ ॥

—শরীর অনিত্য, ঐশ্চর্য সম্পদও শাশ্বত নয়। মৃত্যু সততই নিকটবর্তী তাই ধর্মসঞ্চয় করা উচিত।

* * *

বহুভির্মুখ সংঘাতৈরন্যোন্যপশুবৃত্তিভিঃ।
প্রচ্ছাদ্যন্তে গুণাঃ সর্বে মেঘৈরিব দিবাকর ॥ ১৬৭ ॥

—মেঘ যেমন সূর্যকে ঢেকে দেয় তেমনি পশুর মতো আচরণ যাদের, তারা গুণবানের গুণসমূহ আবৃত করে।

* * *

বরং প্রাণপরিত্যাগো মানভঙ্গে জীবনাৎ।
প্রাণত্যাগে ক্ষণং দুঃখং মানভঙ্গেন দিনে দিনে ॥ ১৬৮ ॥

—সম্মানের লাঘব অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়, কেননা প্রাণত্যাগ ক্ষণিক কষ্ট আর মান ভঙ্গের কষ্ট সারাজীবন সইতে হয়।

* * *

শীলেন হি ত্রয়ো লোকাঃ শক্যা জেতুং ন সংশয়ঃ।
ন হি কিঞ্চিদসাধ্যং বৈ লোকে শীলবতাং ভবেৎ ॥ ১৬৯ ॥

—চরিত্রবান ব্যক্তি নিঃসন্দেহেই ত্রিলোক জয়ী। জগতে এমন কিছুই নেই, যা তাঁর অসাধ্য।

অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শনম্।
সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ ॥ ১৭০ ॥

—সংশয় যার দ্বারা অপসারিত হয়, অপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষীভূত হয়, সকলের লোচন সদৃশ সেই শাস্ত্রজ্ঞান যার নেই, চোখ থাকতেও সে অন্ধ।

* * *

শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ ১৭১ ॥

—সহস্র শোকের হেতু, শত শত ভয়ের হেতুও রয়েছে। সেগুলি প্রত্যহ মূঢ়দেরই আচ্ছন্ন করে, প্রাজ্ঞদের নয়।

* * *

আজীবনান্তাৎ প্রণয়াঃ কোপাস্তু ক্ষণভঙ্গুরাঃ।
পরিত্যাগাশ্চ নিঃসঙ্গা ভবন্তি হি মহাত্মনাম্ ॥ ১৭২ ॥

—মহাত্মাদের প্রণয় আজীবন অপরিবর্তিতই থাকে, ক্রোধ স্বল্পস্থায়ী, ত্যাগও নিঃস্বার্থ।

* * *

যুগান্তে প্রচলেন্মেরুঃ কল্পান্তে সপ্তসাগরাঃ।
সাধবঃ প্রতিপন্নার্থা ন চলন্তি কদাচন। ১৭৩ ॥

—যুগান্তে মেরু এবং কল্পান্তে সপ্ত সাগর চঞ্চল হয়ে ওঠে, কিন্তু সাধুরা কখনও অস্থির হয় না।

* * *

প্রবিচার্যোত্তরং দেয়ং সহসা ন বদেৎ ক্বচিৎ।
শত্রোরপি গুণা গ্রাহ্যা দোষাস্ত্যাজ্যা গুরোরপি ॥ ১৭৪ ॥

—ভালোভাবে ভেবেচিন্তে তবে উত্তর দেওয়া উচিত, সহসা কোনো কিছু বলা অনুচিত। শত্রুর গুণ গ্রহণীয় আর গুরুরও দোষ পরিত্যাজ্য।

* * *

দানেন পাণির্ন তু কঙ্কনেন স্নানেন শুদ্ধির্ন তু চন্দনেন।
মানেন তৃপ্তির্ন তু ভোজনেন জ্ঞানেন মুক্তির্ন তু মণ্ডনেন ॥ ১৭৫ ॥

—দানই হাতের সৌন্দর্য, কঙ্কন নয়, স্নানেই দেহ শুদ্ধ হয়—চন্দনে লেপনে নয়, যশোলাভেই পরিতৃপ্তি—ভোজনে নয়, জ্ঞানেতেই মুক্তি—মস্তক মুণ্ডনে নয়।

* * *

বৃত্তেন রক্ষ্যতে ধর্মো বিদ্যা যোগের রক্ষ্যতে।
সুনীত্যা রক্ষ্যতে রাজা সদ্‌গৃহীণ্যা তথা কুলম্‌ ॥ ১৭৬ ॥

—শুদ্ধ আচরণই ধর্মের রক্ষক, যোগের দ্বারা বিদ্যা রক্ষিত হয়, সুনীতি রাজ্য রক্ষা করে, বংশের গৌরব এবং সংসারের রক্ষিত্রী সুগৃহিণী।

*　　　*　　　*

শরীরস্য গুণানাঞ্চ দূরমত্যন্তমন্তরম্‌।
শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িণো গুণাঃ ॥ ১৭৭ ॥

—শরীর এবং গুণের প্রভেদ অত্যন্ত বেশি। শরীর ক্ষণভঙ্গুর কিন্তু গুণরাশি কল্পান্তস্থায়ী।

*　　　*　　　*

পুষ্পে গন্ধং তিলে তৈলং কাষ্ঠে বহ্নিং পয়োঘৃতম্‌।
ইক্ষৌ গুড়ং তথা দেহে পশ্যাত্মানং বিবেকতঃ ॥ ১৭৮ ॥

-পুষ্পে গন্ধ, তিলে তেল, কাষ্ঠে অগ্নি, ইক্ষুতে গুড় এবং দুগ্ধে ঘি আছে। তেমন দেহে রয়েছেন জ্ঞাতব্য অন্তরাত্মা।

*　　　*　　　*

ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্ত মাদ্‌ ভাবো হি কারণম্‌ ॥ ১৭৯ ॥

—কাষ্ঠে, পাষাণে, মৃন্ময়ে দেবতা নেই। মননেই তাঁর অধ্যাসন। তাই তন্ময়তা ও তদ্‌গত চিত্ততা অনুধ্যানীয়।

*　　　*　　　*

অগ্নিহোত্রং বিনা বেদাঃ ন চ দানং বিনা ক্রিয়া।
ন ভাবেন বিনা সিদ্ধিস্ত স্মাদ্‌ ভাবো হি কারণম্‌ ॥ ১৮০ ॥

—বেদ বিহিত প্রাত্যাহিক হোম এবং তজ্জন্য নিয়ত অগ্নিরক্ষা ব্যতীত বেদপাঠ নিষ্ফল। দানের অভাবে যজ্ঞ অসফল। মনন ও অভিনিবেশ ছাড়া সিদ্ধি অপ্রাপ্য। তাই মননে ও বিভাবনে মগ্ন হওয়া উচিত।

*　　　*　　　*

কাষ্ঠে পাষাণ ধাতুনাং কৃত্বা ভাবেন সেবনম্‌।
শ্রদ্ধয়া চ তথা সিদ্ধিস্তস্য বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ ॥ ১৮১ ॥

—শ্রদ্ধার সঙ্গে কাষ্ঠ, পাষাণ এবং ধাতু নির্মিত প্রতিমার ধ্যান-ধারণা **করলেও** জগৎ পালতিয়ার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব।

*　　　*　　　*

চলা লক্ষ্মীশ্চলাঃ প্রাণাশ্চলে জীবিত মন্দিরে।
চলাচলে চ সংসারে ধর্ম একো হিনিশ্চলঃ ।। ১৮২ ।।

—লক্ষ্মী চঞ্চলা। জীবন-মন্দিরে প্রাণও চঞ্চল আর অস্থায়ী। অস্থির এ সংসারে একমাত্র ধর্মই নিশ্চল।

*　　　*　　　*

অনিত্যানি শরীরানি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্তব্যো ধর্মসংগ্রহ ।। ১৮৩ ।।

—শরীর অনিত্য, ধনসম্পত্তিও শাশ্বত নয়। মৃত্যু নিয়ত নিকটবর্তী তাই ধর্মসঞ্চয় করা কর্তব্য।

*　　　*　　　*

জীবন্ত মৃতবন্মন্যে দেহিনং ধর্মবর্জিতম্।
মৃত্যো ধর্মেন সংযুক্তো দীর্ঘজীবী ন সংশয়ঃ ।। ১৮৪ ।।

—ধর্মবর্জিত ব্যক্তি জীবিত হলেও মৃতবৎ। ধার্মিক ব্যক্তি মৃত হলেও যে দীর্ঘজীবী, এ বিষয় কোনো সংশয় নেই।

যথা ধেনু সহস্রেষু বৎসো গচ্ছতি মাতরম্।
তথা যচ্চ কৃতং কর্মং কর্তারমনুগচ্ছতি ।। ১৮৫ ।।

—সহস্র ধেনুর ভেতর গোবৎস যেমন তার মার কাছে গমন করে, তেমনি কৃতকর্মও কর্মকর্তার অনুগমন করে।

স্বয়ং কর্ম করোত্যাত্মা স্বয়ং তৎফল মশ্নুতে।
স্বয়ং ভ্রমতি সংসারে স্বয়ং তস্মাদ্বিমুচ্যতে।। ১৮৬ ।।

—মানুষই কর্ম করে আর সেই কর্মের ফল ভোগ করে। কর্মফল হেতুই তার সংসারে আসা-যাওয়া। প্রশস্ত জ্ঞান সম্পন্ন হলে ভববন্ধন 'থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

কর্মায়ত্তং ফলং পুংসাং বুদ্ধিঃ কর্মানুসারিণী।
তথাপি সুধিয়াচার্যঃ সুবিচার্যেব কুর্বতে ॥ ১৮৭ ॥

—শ্লোক, আনন্দ, বুদ্ধি, সবকিছুই কর্মানুসারিণী। তাই সুবুদ্ধি ব্যক্তি সম্যকরূপে বিচার করে কর্ম করেন।

* * *

আত্মাপরাধবৃক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনাম্।
দারিদ্র্যরোগ দুঃখানি বন্ধন ব্যসনানি চ ॥ ১৮৮ ॥

—দারিদ্র্য, রোগ, দুঃখ, বন্ধন, ব্যসন, যে বিষয়ে অত্যাসক্তি দূষণীয়। কামজ ব্যসন—মৃগয়া দ্যূত দিবানিদ্রা পরনিন্দা নৃত্য গীত ক্রীড়া বৃথা ভ্রমণ বেশ্যা মদ্য। কোপজ ব্যসন—খলতা দৌরাত্ম্য দ্রোহ ঈর্ষা অসূয়া প্রতারণা বাক্‌পারুষ্য দণ্ডপারুষ্য—চলন্তিকা অভিধান।—প্রভৃতি আত্ম-অপরাধবৃক্ষের ফলসমূহ।

* * *

জন্ম জন্মনি চাভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ।
তেনৈবাভ্যাসযোগেন দেহী গুণম লভ্যতে ॥ ১৮৯ ॥

—জন্ম জন্মান্তর ধরে দান, অধ্যয়ন ও তপস্যায় অভ্যস্ত হলে তবেই মানুষ দানী, অধ্যয়নশীল ও তপমগ্ন হয়ে থাকে। তাই অভ্যাস যোগেই মানুষ গুণ অর্জন করে থাকে।

* * *

আয়ুঃ কর্মঞ্চ বিত্তঞ্চ বিদ্যানিধনমেব চ।
পঞ্চৈতানি হি সৃজ্যন্তে গর্ভস্থস্যৈব দেহিনঃ ॥ ১৯০ ॥

—মাতৃগর্ভে স্থিতিকালেই আয়ু, কর্ম, বিত্ত, বিদ্যা ও মৃত্যু এই পাঁচটি নির্ধারিত হয়।

* * *

রংক করোতি রাজানং রাজানং রংকমেব চ।
ধনিনং নির্ধনং চৈব নির্ধনং ধনিনং বিধি ॥ ১৯১ ॥

—ভাগ্যই রাজাকে ভিক্ষুক, ভিক্ষুককে রাজা, ধনীকে দরিদ্র, দরিদ্রকে ধনী করে।

* * *

পত্রং নৈব যদা করীরবিটপে দোষো বসন্তস্য কিং।
নীলুকোহপ্যবলোকয়তে যদি দিবা সূর্যস্য কিং দূষণম্ ॥

বর্ষা নৈব পতিত চাতকমুখে মেঘস্য কিং দূষণম্ ।
যৎপূর্বং বিধিনা ললাট লিখিতং তন্মার্জিতুং কঃ ক্ষমঃ ।। ১৯২ ।।

—তরুতে যদি পত্রোদ্গম না হয় তাহলে দোষ কি বসন্তের ? পেঁচা দিবালোকে দৃষ্টিহীন—সে কি সূর্যের দোষে ? বৃষ্টি যদি চাতকের মুখে না পড়ে তাহলে মেঘকে দোষ দিয়ে কি লাভ ! কপালের লিখন অন্যথা করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয় ।

ঈপ্সিতং মনসঃ সর্বং কস্য সম্পদ্যতে সুখম্ ।
দৈবায়ত্তং যতঃ সর্বং তস্মাদ্ সন্তোষমাশ্রয়েৎ ।। ১৯৩ ।।

—মনের সমুদয় ইচ্ছা পূরণে কার পরিপূর্ণ সুখলাভ হয়েছে ! সবকিছুই যখন দৈবের অধীন, তখন সর্ব অবস্থায় পরিতৃপ্ত থাকাই শ্রেয় ।

যাবৎ স্বস্থো হ্যয়ং দেহঃ তাবন্মৃত্যুশ্চ দূরতঃ ।
তাবদাত্মহিতং কুর্যাদ প্রাণান্তে কিং করিষ্যতি ।। ১৯৪ ।।

—যতক্ষণ দেহ সুস্থ থাকে ততক্ষণ মৃত্যু দূরে থাকে । তাই এহেন অনুকূল অবস্থাতে আত্মহিত সাধনে তৎপর হওয়া উচিত—প্রাণান্তে কি করবে !

* * *

নাস্তি কাম সমোব্যাধির্নাস্তি মোহসমো রিপুঃ ।
নাস্তি কোপ সমো বহ্নিঃ নাস্তি জ্ঞানাৎ পরম্ সুখম্ ।। ১৯৫ ।।

—কামের তুল্য ব্যাধি, মোহের মতো রিপু, ক্রোধ হেন অগ্নি আর নেই । জ্ঞানের চেয়ে সুখও আর নেই ।

* * *

সত্যেন ধার্যতে পৃথ্বী সত্যেন তপতে রবিঃ ।
সত্যেন বাতি বায়ুশ্চ সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ।। ১৯৬ ।।

—সত্যই পৃথিবীকে ধরে আছে । সত্যের দ্বারাই সূর্য তাপ বিতরণ করছে । সত্যের জন্যই বাতাস বইছে । সত্যেই সবকিছু প্রতিষ্ঠিত ।

* * *

তাদৃশী জায়তে বুদ্ধির্ব্যবসায়োঽপি তাদৃশঃ ।
সহায়াস্তাদৃশাঃ এব যাদৃশী ভবিতব্যতা ।। ১৯৭ ।।

—বুদ্ধি অনুযায়ী মানুষ চেষ্টা করে, আর ভাগ্য অনুসারে মানুষ সাহায্য পায় ।

মুক্তি মিচ্ছসি চেত্তাৎ বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ।
ক্ষমার্জবদয়া শৌচং সত্যং পীযুষবৎ পিব ॥ ১৯৮ ॥

—মুক্তি চাইলে বিষয় বিষের মতো পরিত্যাগ করা উচিত এবং ক্ষমা, দয়া, শুচিতা, সত্য—ইত্যাদি গুণগুলি অমৃতের মতোই গ্রহণযোগ্য।

*   *   *

বন্ধনায় বিষয়াসঙ্গঃ মুক্তৈ নির্বিষয়ং মনঃ।
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ॥ ১৯৯ ॥

—বিষয়সঙ্গই বন্ধনের হেতু আর বিষয় বর্জনই মুক্তি। মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ।

*   *   *

দেহাভিমানগলিতে জ্ঞানেন পরমাত্মনঃ।
যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ ॥ ২০০ ॥

—জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করলে স্বীয় শরীরের অস্তিত্বও তখন তুচ্ছ হয়ে যায় এবং মন যেখানেই অবস্থান করুক না কেন সেখানেই সমাধিস্থ হয়।

*   *   *

ধর্মস্থানে শ্মশানে চ রোগিনাং যা মতির্ভবেৎ।
সা সর্বদৈব তিষ্ঠেচ্চেৎ কেন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ২০১ ॥

—ধর্মস্থানে, শ্মশানে এবং রোগীর কাছে গেলে, যে মনোবৃত্তি হয় সেটি যদি স্থির হয়, তাহলে সমুদয় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

*   *   *

যস্তু সংবৎসরং পূর্ণং নিত্যং মৌনেন ভুঞ্জতে।
যুগ কোটিসহস্রস্তু স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২০২ ॥

—যিনি সারা বৎসর আহার কালে মৌন হয়ে থাকতে পারেন, তিনি কোটি কোটি যুগ ধরে স্বর্গলোকে অধিষ্ঠানের সুখ লাভ করেন।

*   *   *

যদ্ দূরং যদ্ দুরারাধ্যং যচ্চ দূরে ব্যবস্থিতম্।
তৎসর্ব্বং তপস্যা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্ ॥ ২০৩ ॥

—যা দূরে, যা দূরে থেকে আরাধ্য, যা দূরে অবস্থিত—সে সবই তপস্যা দ্বারা লব্ধ হয়। তপস্যা দ্বারা তাই দূরকেও অতিক্রম করা যায়।

ক্রোধো বৈবস্বতো রাজা তৃষ্ণা বৈতরণী নদী।
বিদ্যা কামদুঘা ধেনুঃ সন্তোষো নন্দনং বনম্ ॥ ২০৪ ॥

—ক্রোধ হলো যম, তৃষ্ণা বৈতরণী (যমালয়ের নদী), বিদ্যা কামধেনু এবং সন্তোষ নন্দন বন তুল্য।

*　　　*　　　*

যস্য চিত্তং দ্রবীভূতং কৃপয়া সর্বজন্তুষু।
তস্য জ্ঞানেন মোক্ষেণ কিং জটা ভস্মলেপনৈঃ ॥ ২০৫ ॥

—সর্বজীবের প্রতি দয়ায় যাঁর হৃদয় দ্রবীভূত, জ্ঞান এবং মোক্ষ লাভের জন্য তাঁর জটা ও ভস্মলেপনের কি প্রয়োজন '

*　　　*　　　*

দেয়ং ভোজ্যধনং সুকৃতিভির্নো সঞ্চয়স্তস্য বৈ
শ্রীকর্ণস্য বলেশ্চ বিক্রমপতেরদ্যাপি কীর্ত্তিঃ স্থিতা।
অস্মাকং মধুদানয়োপরহিতং নষ্টং চিরাৎ সংচিত
নির্বাণাদিতি নষ্ট পাদ যুগলং ঘর্ষত্যমী মক্ষিকাঃ ॥ ২০৬ ॥

—সঞ্চয় না করে সৎকর্মকারীদের ভোজ্য এবং ধন দান করা বিধেয়। কর্ণ, বলি —এঁদের বিক্রম অপেক্ষা কীর্তিই স্মরণীয় হয়ে আছে। আমাদের দীর্ঘ সঞ্চিত মধুরূপ অর্থ ভোগ বা দান না করলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মৌমাছিরা তাই সঞ্চিত মধু পদ দলিত করে।

*　　　*　　　*

আর্ত্তেষু বিপ্রেষু দয়ান্বিতশ্চেচ্ছ্রদ্ধেন যঃ স্বল্পমপৈতি দানম্।
অনন্তপারং সমুপৈতি দানং যদ্দীয়তে তন্ন লভেদ্ দ্বিজেভ্যঃ ॥ ২০৭ ॥

—দুঃস্থ এবং ব্রাহ্মণকে দয়ার্দ্রচিত্তে শুদ্ধ হয়ে দান করলে, তার ফল সঙ্গে সঙ্গে না পেলেও পরে বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়ে দাতার কাছে ফিরে আসে।

*　　　*　　　*

ক্ষীয়ন্তে সর্বদানানি যজ্ঞ হোমবলি ক্রিয়াঃ।
ন ক্ষীয়ন্তে পাত্রদানমভয়ং সর্বদেহিনাম্ ॥ ২০৮ ॥

—(সম্যকরূপে বিচার না করে) দান করলে যজ্ঞ হোম ইত্যাদির ক্রিয়াও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জীবের রক্ষা হেতু অভয় দানে, যজ্ঞ-হোমের ক্রিয়া নষ্ট হয় না।

*　　　*　　　*

সন্তোষস্ত্রিষু কর্ত্তব্যঃ স্বদারে ভোজনে ধনে।
ত্রিষুশ্চৈব ন কর্ত্তব্যোঽধ্যয়নে জপদানয়োঃ ॥ ২০৯ ॥

—নিজের স্ত্রী, আহার এবং অর্থ —এই তিনে সন্তোষ বিধান কর্তব্য। কিন্তু অধ্যয়ন জপ এবং দান—এই তিনে সন্তোষ বিধান অবিধেয়।

* * *

পরকার্য্যবিহন্তা চ দাম্ভিকঃ স্বার্থসাধকঃ।
ছলীদ্বেষীভদ্রুক্রুরো মার্জার স্বম উচ্যতে ॥ ২১০ ॥

—পরের কাজে যে বাধা দেয়, যে দাম্ভিক, স্বার্থপর, ছলনা করে, হিংসে করে, এবং ক্রুরচিত্ত —সে বিড়ালের তুল্য।

* * *

প্রস্তাবসদৃশং বাক্যং প্রভাবসদৃশং প্রিয়ম্।
আত্মশক্তিসমং কোপং যো জানাতি স পণ্ডিতঃ ॥ ২১১ ॥

বাক্য যাঁর প্রস্তাবসদৃশ, যিনি ভালোবাসা দিয়ে সকলকে প্রভাবিত করেন, শক্তি বুঝে ক্রোধ করেন—তিনিই পণ্ডিত।

* * *

দূরাগতং পথিশ্রান্তং বৃথা চ গৃহমাগতম্।
অনর্চ্চয়িত্বা যো ভুংক্তে স বৈ চণ্ডাল উচ্যতে ॥ ২১২ ॥

—দূরাগত পথশ্রান্ত কোনো ব্যক্তি যদি বিনা কারণেও গৃহে আসে, তাহলে তাকে অভ্যর্থনা না জানিয়ে, যে নিজে আহাররত হয় সে চণ্ডালরূপে গণ্য হয়।

* * *

তৈলভঙ্গে চিতাধূমে মৈথুনে ক্ষৌর কর্মণি।
তাবদ্ ভবতি চণ্ডালো যাবৎ স্নানং ন সমাচরেৎ ॥ ২১৩ ॥

—তেল মেখে, চিতার ধোঁয়া লাগিয়ে, যৌন ক্রীড়ার পর, ক্ষৌর কর্মের পর যতক্ষণ পর্যন্ত না সে স্নান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে চণ্ডাল।

* * *

পক্ষিণাং কাকশ্চণ্ডালঃপশূনাং চৈব কুক্কুর।
মুনীনাং পাপশ্চণ্ডালঃ সর্বেষু নিন্দকঃ জনঃ ॥ ২১৪ ॥

—পাখীদের মধ্যে কাক, পশুদের মধ্যে কুকুর, মুনিদের মধ্যে পাপী এবং সকলের মধ্যে নিন্দুক হলো চণ্ডাল।

* * *

চণ্ডালানাং সহস্রংশ্চ সূরিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
একো হি যবনঃ প্রোক্তো ন নীচো যবনাৎপরঃ।। ২১৫ ।।

তত্ত্বদর্শীদের মতে সহস্র চণ্ডালের তুল্য এক যবন। তাই যবন হলো নিকৃষ্ট মানব।

*   *

এতদর্থং কুলীনানাং নৃপাঃ কুর্বন্তি সংগ্রহম্।
আদিমধ্যাবসানেষু ন ত্যজন্তি চ তে নৃপম্ ।। ২১৬ ।।

—এজন্যই নৃপতিগণ কুলীনদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করেন, কেননা, তারা কোনো অবস্থাতেই রাজাদের ত্যাগ করে না।

*   *   *

ছিন্নেঽপি চন্দনতরুর্ন জহাতি গন্ধং
বৃদ্ধোঽপি বারণপতির্ন জহাতি লীলানম্।
যন্ত্রার্পিতো মধুরতাং ন জহাতি চেক্ষু
ক্ষীণোঽপি ন ত্যজতি শীলগুণাকুলীনঃ ।। ২১৭ ।।

—ছিন্ন হলেও চন্দনগাছ যেমন তার গন্ধ পরিত্যাগ করে না, বৃদ্ধ হলেও হাতি যেমন ক্রীড়াপ্রমোদ ত্যাগ করে না, পেষণেও যেমন ইক্ষু মিষ্টতা বর্জন করে না, তেমনি কুলীন ক্ষণকালের জন্যও তার স্বভাব এবং গুণ পরিহার করে না।

*   *   *

যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষতে
নির্ঘষণচ্ছেদন তাপতাড়নৈঃ।
তথা চতুর্ভিঃ পুরুষঃ পরীক্ষ্যতে
ত্যাগেন শীলেন গুণেন কর্মণা ।। ২১৮ ।।

—ঘষে, ছেদন করে, গরম করে এবং পিঠে ঠুকে—এই চার রকমে যেমন সোনা যাচাই করা হয়, তেমনি ত্যাগ, চরিত্র গুণ এবং কর্ম দ্বারা পুরুষরা পরীক্ষণীয়।

*   *   *

ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ রতিশক্তিশ্চ বারাঙ্গনা
বিভবোদানশক্তিশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলম্ ।। ২১৯ ।।

—স্বাদু আহার্য, পরিপাক শক্তি, রতিশক্তি, বারাঙ্গনা, ঐশ্বর্য, দানের ক্ষমতা—এগুলি সবই তপস্যার ফলে প্রাপ্তব্য।

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তিরেব চ।
ন চ তদ্ধনলব্ধান মতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্ ॥ ২২০ ॥

—**সন্তোষরূপ** অমৃতের যিনি অধিকারী তিনি সুখশান্তি প্রাপ্ত হন। ধন-লাভের জন্য (চঞ্চল হয়ে) যে ছুটছে সে কি রূপে সুখ পাবে!

*　　*　　*

মাতা চ কমলা দেবী পিতা দেবোজনার্দনঃ।
বান্ধবা বিষ্ণুভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥ ২২১ ॥

—**মাতা** যার লক্ষ্মীতুল্য পিতা যার বিষ্ণুতুল্য, যার বন্ধুরা বিষ্ণুভক্ত তিন ভুবনই তার স্বদেশ।

*　　*　　*

কান্তাবিয়োগ স্বজনাপমানো
ঋণস্য শেষঃ কুনৃপস্য সেবা।
দরিদ্রভাবো বিধয়া সভা চ
বিনাগ্নিমেতে প্রদহন্তি কায়ম্ ॥ ২২২ ॥

—**স্ত্রী** বিয়োগ, স্বজন কর্তৃক অপমান, সামান্যতম ঋণ, কুনৃপের সেবা, দারিদ্র্য, ধূর্তলোকের সভা—অগ্নি বিনা অগ্নিসম এগুলি মানুষের দেহ দগ্ধ করে।

*　　*　　*

কুগ্রামবাসঃ কুলহীন সেবা
কুভোজনং ক্রোধমুখী চ ভার্য্যা।
পুত্রশ্চ মূর্খো বিধবা চ কন্যা
বিনাগ্নিমেতে প্রদহন্তি কায়ম্ ॥ ২২৩ ॥

—**কুগ্রামে** বাস, বংশমর্যাদাহীন ব্যক্তির সেবা, কুভোজন, ক্রোধমুখী স্ত্রী, মূর্খ পুত্র, বিধবা কন্যা অগ্নিবিনা অগ্নিসম এগুলি মানুষকে দগ্ধ করে।

*　　*　　*

বৃদ্ধকালে মৃত ভার্য্যা বন্ধুহস্তগতং ধনম্।
ভোজনঞ্চ পরাধীনং তিস্র পুংসা বিড়ম্বনা ॥ ২২৪ ॥

—**বার্ধক্যে** যাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে, যার ধন সম্পদ বন্ধুর হাতে, ভোজনের ব্যাপারে যিনি পরাধীন তাঁর জীবন বিড়ম্বিত।

*　　*　　*

কষ্টং চ খলু মূর্খত্বং কষ্টঞ্চ খলু যৌবনম্ ।
কষ্টাৎ কষ্টতরঞ্চৈব পরগেহ নিবাসিনাম্ ॥ ২২৫॥

—মূর্খতা ক্লেশদায়ক, যৌবন ও ক্লেশদায়ক, কিন্তু পরগৃহে বাস অধিকতম ক্লেশদায়ক ।

* * *

অমৃতময়নিধানং নায়কো ঔষধীনাং
অমৃতময়শরীরঃ কান্তিযুক্তোঽপি চন্দ্রঃ ।
ভবতি বিগতরশ্মিমণ্ডলে প্রাপ্যো ভানোঃ
পরসদননিবিষ্টঃ কোন লঘুত্বং যাতি ॥ ২২৬ ॥

চন্দ্র অমৃতময়তার আধার, ঔষধীসমূহের নায়ক, অমৃতময় শরীর এবং কান্তিযুক্ত হলেও সূর্যোদয়ে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে অপরের নিবাসে সকলেই লঘুতা প্রাপ্ত হয় ।

* * *

অনবস্থিতকায়স্য ন জলে ন বনে সুখম্ ।
জনো বহতি সংসর্গাদ বনং সঙ্গ বিবর্জনাৎ ॥ ২২৭ ॥

-অস্থির চিত্তের জলে কিংবা বনে কোথাও সুখ নেই। মানুষ সংসর্গের দ্বারা চালিত হয়, কিন্তু সংসর্গরহিত হওয়ায় অরণ্যকে অরণ্য বলে ।

* * *

সংসারাং তাপদগ্ধানাং ত্রয়ো বিশ্রান্তহেতবঃ ।
অপতঞ্চ কলত্রঞ্চ সতাং সঙ্গীতিরেব চ ॥ ২২৮ ॥

-সংসার তাপিতের অপত্য, কলত্র, সাধুসঙ্গ—এই তিন শ্রান্তি-অপনোদনের স্থান ।

* * *

শ্বানপুচ্ছমিব ব্যর্থ জীবিতং বিদ্যয়া বিনা ।
ন গুহ্যং গোপনে শক্তং ন চ দংশ নিবারণে ॥ ২২৯ ॥

-বিদ্যাহীন জীবন কুকুরের পুচ্ছের মতোই ব্যর্থ, কেননা তা তার গুহ্যদেশ গোপনে কিংবা দংশক অর্থাৎ মশা-মাছি নিবারণে অসমর্থ ।

* * *

বিদ্বান প্রশস্যতে লোকে বিদ্বান সর্বত্র গৌরবম্ ।
বিদ্যয়া লভতে সর্বম্ বিদ্যা সর্বত্র পূজ্যতে ॥ ২৩০ ॥

—**বিদ্বান** সমাজে প্রশংসা অর্জন করে, সর্বত্রই তিনি গৌরবের পাত্র। বিদ্যার দ্বারা সকলপ্রকার বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া যায়—বিদ্যা সর্বত্রই পূজিত হয়।

* * *

কাম ক্রোধং তথা লোভং স্বাদ শৃঙ্গারকৌতুকম্।
অতিনিদ্রাঽতি সেবা চ বিদ্যার্থী হ্যষ্ট বর্জয়েৎ ॥ ২৩১ ॥

—**কাম**, ক্রোধ, লোভ, স্বাদু আহার্য, শৃঙ্গার কৌতুক, অতিনিদ্রা, গুরুভোজন—বিদ্যার্থীর এই আটটি পরিহার করা কর্তব্য।

* *

পুস্তকং প্রত্যাধীতং বিদ্যানাধীতং গুরুসন্নিধৌ।
সভামধ্যে ন শোভন্তে জারগর্ভা ইবস্ত্রিয় ॥ ২৩২ ॥

—**গুরুর** কাছে অধ্যয়ন না করে, বই পড়ে যে বিদ্যার্জন, সভার মধ্যে তা উপপতি সঙ্গমে গর্ভবতী স্ত্রীর মতোই, শোভা পায় না।

* * *

বিবেকিনমনুপ্রাপ্তো গুণো যাতি মনোজ্ঞতাম্।
সুতরাং রত্নমাভাতি চামীকরনিয়োজিতম্ ॥ ২৩৩ ॥

—**বিবেকবান** ব্যক্তিতে গুণ মনোজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়, উপযুক্ত পাত্রে রত্নের শোভা অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

* * *

সত্যং মাতা পিতা জ্ঞানং ধর্মো ভ্রাতা দয়া সখা।
শান্তিঃ পত্নী ক্ষমাপুত্রঃ ষড়েতে মম বান্ধবাঃ ॥ ২৩৪ ॥

সত্য আমার মা, জ্ঞান আমার পিতা, ধর্ম আমার ভাই, দয়া আমার সখা, শান্তি আমার পত্নী, ক্ষমা আমার পুত্র—এই ছয় আমার বন্ধু

* * *

গুণৈরুত্তমতাং যান্তি নোচ্চৈরাসন সংস্থিতৈঃ।
প্রাপ্তাংশিখরস্থোঽপি কিং কাকো গরুড়ায়তে ॥ ২৩৫ ॥

—**গুণই** মানুষকে শ্রেষ্ঠতার আসনে বসায়, উচ্চ আসন নয়। প্রাসাদ-শীর্ষস্থ কাক কি গরুড় হতে পারে!

* * *

অন্তঃসারবিহীননামপুদেশো ন জায়তে।
মলয়াচলবসন্তিন বেণুশ্চন্দনায়তে ॥ ২৩৬ ॥

—**অন্তঃসারশূন্যকে** উপদেশ দিয়ে কি হবে! মলয় পর্বতে উৎপন্ন হলেও বাঁশ কখনও চন্দন হয় না।

* * *

ন বেত্তি যো যস্য গুণ প্রকর্ষং
স তু সদা নিন্দতি পাত্র চিত্রম্ ।
যথা কিরাতী করিকুম্ভলব্ধাং
মুক্তাং পরিত্যজ্য বিভর্ত্তি গুঞ্জাম্ ॥ ২৩৭ ॥

—যার গুণ সম্পর্কে যে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ, সে যে তার নিন্দা করবে, এতে অবাক হবার কোনো কারণ নেই। যেমন ব্যাধ রমণী করিকুম্ভলব্ধ মুক্তা পরিত্যাগ করে কুঁচ-মালিকা ধারণ করে।

* * *

অধীত্যেবং যথাশাস্ত্রং নরো জানাতি স উত্তমঃ।
ধর্মোপদেশবিখ্যাতং কার্য্যাকার্য্যং শুভাশুভম্ ॥ ২৩৮ ॥

—যিনি শাস্ত্রপাঠ করে, কার্য অকার্য, শুভ অশুভ বিষয়ে অবহিত হয়ে কাজ করতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। কোন্‌টা করণীয় ও কোন্‌টা বর্জনীয় এ বোধ নীতি শাস্ত্র পাঠে জন্মায়।

* * *

অযুক্ত স্বামিনো যুক্তং যুক্তং নীচস্য দূষণম্ ।
অমৃতং রাহবে মৃত্যুর্বিষং শঙ্করভূষণম্ ॥ ২৩৯ ॥

—অনুপযুক্ত প্রভুর অধিকারে উপযুক্ত বস্তুও নাশপ্রাপ্ত হয়। অমৃতও রাহুর কাছে মৃত্যু-বিষ, কিন্তু সেই বিষই আবার শিবের ভূষণ।

* * *

অধমা ধনমিচ্ছন্তি ধনং মানং চ মধ্যমাঃ।
উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্ ॥ ২৪০ ॥

—অধমেরা কেবল ধন চায়, মধ্যমেরা চায় ধন এবং মান, উত্তমেরা মান চায় — মানই মহতের ধন। মান, যশঃ, খ্যাতি মানুষের আকাঙ্খিত বস্তু।

* * *

প্রাতঃ দ্যূত প্রসঙ্গেন মধ্যাহ্নে স্ত্রীপ্রসঙ্গতঃ।
রাত্রৌ চৌরপ্রসঙ্গেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্ ॥ ২৪১ ॥

—সকালে দ্যূত প্রসঙ্গ অর্থাৎ মহাভারত পাঠ, মধ্যাহ্নে স্ত্রীপ্রসঙ্গ অর্থাৎ রামায়ণ পাঠ, রাতে চৌর প্রসঙ্গ অর্থাৎ কৃষ্ণের রাজনৈতিক চাতুর্যের কাহিনী পাঠ করে, ধীমান্ ব্যক্তিদের কাল কাটে।

* * *

দর্শনধ্যান সংস্পর্শৈর্মৎসী কূর্মী চ পক্ষিণী।
শিশু পালয়তে নিত্যং তথা সজ্জন সঙ্গতি ॥ ২৪২ ॥

—অভিনিবেশ সহকারে এবং সদা জাগ্রত দৃষ্টি রেখে মৎসী, কূর্মী এবং পক্ষিণী সন্তানকে লালিত পালিত ও সম্প্রসারিত করে। অনুরূপভাবে সজ্জনের সংসর্গ মানুষকে পোষণ করে।

* * *

সংসার কটু বৃক্ষস্য দ্বে ফলে হ্যমৃতোপমে।
সুভাষিতং চ সুস্বাদু সঙ্গতি সজ্জনে জনে ॥ ২৪৩ ॥

—সংসার বৃক্ষের অমৃততুল্য দু'টি ফল—মধুর ও প্রীতিজনক বচন এবং সাধু সঙ্গ। সৎসঙ্গ সুবচন ও সুখের কারণ।

* * *

সৎসঙ্গতেভর্বতি হি সাধুতা সতানাং
সাধুনাং ন হি খলসঙ্গতেঃ খলশ্চম্।
আমোদ কুসুম ভবং সুদেব ধত্তে
মৃদ্গন্ধং নহি কুসুমানি ধারয়ন্তি ॥ ২৪৪ ॥

—সৎসঙ্গে অসাধুও সাধু হয়। খলসঙ্গে সাধু খল হয়। মৃত্তিকা সুগন্ধি ফুলের ধারক হলেও, ফুলে কিন্তু মাটির গন্ধ হয় না। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস। অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

* * *

গম্যতে যদি মৃগেন্দ্র মন্দিরে
লভ্যতে করি কপোল মৌক্তিকম্।
জম্বুকাশ্রয়গতং চ প্রাপ্যতে
বৎস পুচ্ছ স্বর চর্মখণ্ডম্ ॥ ২৪৫ ॥

—সিংহের বাসায় প্রবেশ করলে গজমতি মেলে। কিন্তু শিয়ালের গর্তে গেলে, সেখানে গোবৎসের লেজ চর্ম এবং অস্থি পাওয়া যায়।

* * *

কিং তথা ক্রিয়তে লক্ষ্ম্যা যা বধূরিব কেবলা
যা তু বৈশ্যেব সামান্য পথিকৈরপি ভুজ্যতে ।২৪৬ ॥

—বধূর মতো ঘরে রাখলে লক্ষ্মীর কি প্রয়োজন। অর্থাৎ সিন্ধুকে আবদ্ধ অর্থ কোনো কাজেই লাগে না। কৃপণ বা যক্ষের ধন কোন কাজে লাগে না। ধনী এবং নির্ধন সমানভাবে ঐশ্বর্যকে ভোগ করলে তবেই তার সার্থকতা।

* * *

যস্যার্থস্তস্য মিত্রানি যস্যার্থস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থঃ স পুমাংল্লোকে যস্যার্থঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ২৪৭ ॥

—যে অর্থবান, তার মিত্র ও বন্ধু-বান্ধব লাভ হয়। যার অর্থ আছে সেই লোক সমাজে পণ্ডিত বলে গণ্য হয়।

* * *

উপার্জিতানাং বিত্তানাং ত্যাগ এব হি রক্ষণম্।
তড়াগোদর সংস্থানাং পরিবাহ ইবাম্ভসাম্ ॥ ২৪৮ ॥

—ত্যাগই হলো উপার্জিত বিত্তের রক্ষা কবচ। প্রবাহিত দীঘির জলই পরিশুদ্ধ থাকে।

* * *

কচৈলিনং দন্তমলো পধারিণং
বহ্বাশিনং নিষ্ঠুরভাষিতং চ।
সূর্যোদয়ে চাস্তমিতে শয়ানং
বিমুঞ্চতে শ্রীর্যদি চক্রানিঃ ॥ ২৪৯ ॥

—যে মলিন বস্ত্র পরিধান করে, যার দাঁত নোংরা, যে অধিক আহার করে, নির্দয় যার ভাষণ, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে শুয়ে থাকে—লক্ষ্মী তাকে ছেড়ে যান।

* * *

অতিক্লেশেন যে চার্থাঃ ধর্মস্যাতিক্রমেণ তু।
শত্রূণাং প্রণিপাতেন তে হ্যর্থাঃ ন ভবন্তু মে ॥ ২৫০ ॥

—আমি যেন ধর্মের পথকে লঙ্ঘন করে অতি কষ্টে উপার্জিত অর্থ কিংবা শত্রুদের ভূলুণ্ঠিত করে, অর্জিত অর্থের অধিকারী না হই।

* * *

বরং বনং ব্যাঘ্রগজেন্দ্র সেবিবতং
দ্রুমালয়ং পক্কফলাম্বু সেবনং।
তৃণেষু শয্যা শতজীর্ণ বল্কলম্
ন বন্ধুমধ্যে ধনহীন জীবনম্ ॥ ২৫১ ॥

—বরং ব্যাঘ্র হস্তী অধ্যুষিত অরণ্যে পক্ক ফল আর (দিঘির) জল খেয়ে, তৃণশয্যায় শুয়ে, শতচ্ছিন্ন বল্কল পরে জীবন ধারণ শ্রেয়, কিন্তু বন্ধুদের মাঝে ধনহীন জীবন যাপন করা উচিত নয়।

দুর্জনং সজ্জনং কর্তুমুপায়ো ন হি ভূতলে।
অপানং শতধাধৌতান্ ন শ্রেষ্ঠ মিন্দ্রিয়ং ভবেৎ ॥ ২৫২ ॥

—পৃথিবীতে দুর্জন ব্যক্তিকে সজ্জনে পরিণত করার কোনো উপায় নেই। গায়ের রং যদি কালো হয় তাহলে শতবার ধুলেও তার কোন পরিবর্তন হয় না।

*　　　　*　　　　*

বয়সং পরিণামে হি যঃ খলঃ খল এব সঃ।
সুপক্কমপি মাধুর্যং নোপায়তীন্দ্র বারুণম্ ॥ ২৫৩ ॥

—বয়সের পরিবর্তনেও যে কপট সে কপটই থেকে যায়। ইন্দ্রবারুণ ফল সুপক্ক হলেও মধুর হয় না।

*　　　　*　　　　*

যদিচ্ছসি বশীকর্তুং জগদে কেন কর্মণা।
পরাপ বাদশাস্ত্রেভ্যো গাং চরন্তি নিবারয় ॥ ২৫৪ ॥

—যদি একটি কর্মের দ্বারা জগৎকে বশ করতে চাও, তবে সেটি হলো, পরের অপবাদ এবং শাস্ত্রের নিন্দা থেকে বাক্ সংযত করা

*　　　　*　　　　*

দূতো ন সঞ্চরিত খে ন চলেচ্চ বার্তা,
পূর্বং ন জল্পিতমিদং ন চ সঙ্গমো হস্তি।
ব্যোম্নিস্থং রবিশশী গ্রহণং প্রশস্তং
জানাতি যো দ্বিজবরঃ স কথং ন বিদ্বান্ ॥ ২৫৫ ।

—দূতও পাঠাতে হয় না, আকাশে বার্তাও পাঠাতে হয় না, পূর্বে যেটি কল্পনাও করা হয় নি, যেটির সঙ্গে যোগ সাধনও হয়নি অথচ আকাশে স্থিত সূর্য এবং চন্দ্রের গ্রহণ যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জানতে পারেন, তিনি বিদ্বান না হয়ে পারেন না।

*　　　　*　　　　*

মোট চাণক্য শ্লোক—২৮৭ ;

চাণক্য পরিচিতি

চণক + ষ্ণ—অপত্যার্থে চাণক। অর্থাৎ চাণক্য ছিলেন চণক মুনির পুত্র। তক্ষশিলায় তাঁর জন্ম। বাল্যে পিতৃবিয়োগের পর তিনি মাতার স্নেহ ও নিরন্তর প্রত্যবেক্ষণে লালিত পালিত ও সম্প্রসারিত হন।

চাণক্য ছিলেন কুশ্রী, কুরূপ। কদাকার দন্তরাজি তিনি উৎপাটিত করেছিলেন বলে জানা যায়। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও একগুঁয়ে। একদিন গমনরত চাণক্যের পায়ে কুশ বিঁধেছিল। ক্রোধাবিষ্ট হয়ে তিনি কাশের মূল পর্যন্ত উন্মূলন করেছিলেন।

সেকালে তক্ষশিলা ছিল বিদ্যাচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র। চাণক্য গভীর অধ্যবসায় সহকারে সেখানে বিদ্যার্জন করেন। নানা শাস্ত্রে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি পাটলিপুত্রে যান। জনৈক নন্দবংশীয় রাজা কর্তৃক সভামধ্যে অপমানিত হওয়ায় তিনি পণ করেছিলেন যে নন্দবংশ ধ্বংস করবেন। কালক্রমে এ ব্যাপারে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে তিনি চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে তাঁর মন্ত্রী হয়েছিলেন।

মস্কো থেকে প্রকাশিত আন্তোনভা বোনগার্দ, লেভিন কতোভস্কি-র 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এ বলা হয়েছে, 'বৌদ্ধ ও জৈন পুঁথি-পত্রে বর্ণিত হয়েছে চন্দ্রগুপ্তের অল্প বয়সের কথা, তক্ষশিলায় তাঁর পাঠ গ্রহণের বৃত্তান্ত এবং মনে করা হয়েছে যে সেখানেই তিনি তাঁর হিতৈষী ও ভবিষ্যৎ উপদেষ্টা কৌটিল্য বা চাণক্যের সাক্ষাৎ পান।'

চাণক্য বিষ্ণুগুপ্ত, তথা বিষ্ণুশর্মা এবং কৌটিল্য নামেও পরিচিত। রাজনীতি ও অর্থনীতি শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে। আর তাঁকে তার 'প্রাচ্যের মাকিয়াভেলি' বলা হয়।

'চাণক্য নীতিদর্পণ,' 'বৃদ্ধ চাণক্য,' 'চাণক্য নীতিশাস্ত্র', 'বোধি চাণক্য', 'লঘু চাণক্য' ও 'চাণক্য রাজনীতি শাস্ত্র' নামে এক হাজার পাঁচশ সত্তরটি শ্লোক বিন্যস্ত নীতি বিষয়ক গ্রন্থগুলি তাঁর রচনা বলে অনুমান করা হয়।

আজ থেকে একশ বাহাত্তর বছর আগে উইলিয়াম কেরীর অনুপ্রেরণায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে 'লঘু চাণক্যে'-র জয় গোপাল তর্কালঙ্কার কৃত প্রথম অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের প্রকাশিত এই গ্রন্থে চাণক্যের দুই শতাধিকের অধিক ২৮৭ শ্লোক এবং সেগুলির বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হলো। এগুলি নিঃসন্দেহেই চলার পথের নির্ভরযোগ্য দীপশিখা।

-- চাণক্যের বহুখ্যাত গ্রন্থটি হলো অর্থশাস্ত্র—যেটি 'মৌর্যযুগের রাষ্ট্র কাঠামোর পরিচয় বহন করছে।' অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা কৌটিল্য মনে করতেন যে রাষ্ট্রের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হলো সামাজিক বৈষম্যকে, অর্থাৎ চতুবর্ণভিত্তিক সামাজিক স্তর ভেদকে টিকিয়ে রাখা।

বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে চাণক্য আজও অমর হয়ে আছেন।

* * *

কবিরের দোহাঁ

দুখ মে সুমিরন সব করে˚, সুখ মে˚ করৈ ন কোয়।
জো সুখ মে সুমিরন করৈ, তো দুখ কাহে হোয়॥

দুঃখের সময় সবাই ঈশ্বরের কথা স্মরণ করে। বার বার ঈশ্বরকে ডাকে। তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু সুখের সময় তাদের মধ্যে এ ব্যাকুলতা দেখা যায় না। সুখের সময় তারা ঈশ্বরের কথা ভাবে না। ঈশ্বরকে আমলই দেয় না। তা এমন মানুষ ঈশ্বরকে স্মরণ করে কি পেতে পারে? কবির দাস বলছেন তারাই ঈশ্বরকে পায়, যারা সুখের সময়, আনন্দের সময়ও ঈশ্বরকে স্মরণ করে। তাঁকে কাছে পাবার জন্য আকুল হয়।

* * *

জাতি না পুছো সাধ কী, পুছ লীজিয়ে জ্ঞান।
মোল করো তলবার কা, পড়া রহন দো ম্যান॥

যিনি সাধক মানুষ, তাঁর জাত জানার চেষ্টা করো না। জাত-পাতের দ্বন্দ্বে দীর্ণ ভারতীয় সমাজের উদ্দেশ্যে তাঁর আবেদন, সাধক মানুষদের জাত জানতে চেও না। মানুষের পরিচয় জাতে নয়। তার পরিচয় জ্ঞানে, কর্মে। তা সে মানুষ সাধকই হোন, আর সাধারণ গৃহস্থই হোন। তিনি তাই বিশেষ করে সাধকদের উদাহরণ দিয়ে বলছেন, তাঁদের জানতে না চেয়ে, তাঁদের জ্ঞান জানার চেষ্টা করো। যেমন তরোয়ালের খাপের থেকে তরোয়াল মূল্যবান, তেমনি মানুষের জাতের থেকে মানুষের জ্ঞান বেশি মূল্যবান। অস্ত্রের ধারটাই আসল, খাপটা নয়।

* * *

বড়া দুয়া তো কেয়া হুয়া, জৈসে পেড় খজুর।
পন্হী কো ছায়া নহী, ফল লাগে অতি দূর॥

সন্ত কবির তাঁর এই দোহায় সেইসব মানুষদের উদ্দেশ্যে সৎ পরামর্শ দিচ্ছেন, যারা জীবনে বড় হবার বাসনা রাখে। তিনি বলছেন, জীবনে উন্নতি করা, বড় হওয়া ভালো

জিনিস, তাই বলে খেজুর গাছের মতো বড় হয়ে লাভ নেই। প্রকৃতিতে দেখা যায়, খেজুর গাছ বড় হয়, অনেক লম্বা হয়। অথচ এই গাছ লম্বা বা বড় হলেও মানুষের কোন উপকারে আসে না। শুষ্ক মরুভূমির পথের প্রান্তের এই গাছ মানুষকে একটু ছায়া দেয় না। এই গাছ অতি লম্বা হওয়ায়, এর ফলও থাকে অনেক দূরে, নাগালের বাইরে। তাই বড় হলেও এ গাছ মানুষের উপকারে লাগে না। সে জন্য তিনি বলছেন, খেজুর গাছের মতো বড় হয়ে কোন লাভ নেই।

*　　*　　*

সাধু য়েসা চাহিয়ে, জৈসা সুপ সুভায়।
সার-সার কো গাহি রহৈ, থোথা দেহ উড়ায়॥

সাধু সন্ত মানুষ কেমন হওয়া উচিত, এই দোহায় তিনি সে কথাই বলেছেন। তিনি বলছেন, খাদ্যবস্তু থেকে যেমন সার, অর্থাৎ আসল জিনিসটি গ্রহণ করে বাকিটা ছিবড়ের মতো ফেলে দিতে হয়, তেমনি করে সাধু মানুষও জীবনের সার বিষয়গুলি গ্রহণ করে অসারগুলি বর্জন করবেন।

*　　*　　*

কবীর গর্ব না কীজিয়ে, কল গহে কর কেস।
না জানে কিত মা রহৈ, কেয়া ঘর কেয়া পরদেশ॥

কবিরদাস বলছেন, এ জীবনে গর্ব করো না। গর্ব বড় বিষম বস্তু। (কল গহে), অর্থাৎ একবার মৃত্যুর খপ্পরে পড়লে আর বাঁচার রাস্তা নেই। তখন কোথায় দেশ, কোথায় বিদেশ, সব সমান। তাই কোন কিছুর জন্য গর্ব না করে সোজা পথে জীবনযাপন করে যাও।

*　　*　　*

তিনকা কবহুঁ ন নিদিয়ে, জো পাঁয়ন তর হোয়।
কবহুঁ উড়ি আঁখিন পরৈ, পীর ঘনেরী হোয়॥

অতি ক্ষুদ্র জিনিস বলে অবহেলা করা উচিত নয়। তিনকা অর্থাৎ খড় কুটো বলে পায়ের নীচে (পাঁয়ন তর) চাপা দিয়ে অবহেলা ভরে চলে যাওয়া উচিত নয়। যে কোন সময় উড়ে চোখের ওপর পড়ে, খুবই কষ্টের (পীর ঘনেরী) কারণ ঘটতে পারে। এখানে খড়কুটো উদাহরণ মাত্র। আসলে তিনি মানুষকেই বোঝাতে চেয়েছেন। বলতে চেয়েছেন যে, কোন মানুষকেই তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়।

*　　*　　*

কাল করৈ সো আজ কর, আজ করৈ সো অব্ব।
পল মে' পরল হোয়গী, বহুরি করৈগো কব্ব॥

অলস হয়ো না—এই দোহায় কবিরদাস মানুষের উদ্দেশ্যে এই উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, যে কাজটা কাল করবে বলে ঠিক করেছ, সে কাজটা আজই করো। আর যে কাজটা আজ করবে বলে ঠিক করেছ, সেটা এখনই (অব্ব) করে ফেল। যে কোন মুহূর্তে প্রলয় (পরল) ঘটে যেতে পারে। তাই যদি হয়, তাহলে কাজ করবে কখন। সুতরাং আজ করব, কাল করব বলে কাজ ফেলে রেখ না।

*　　　*　　　*

ভারী কহুঁ তো বহু ডরাউঁ, হুল্কা কহুঁ তো ঝুঠ।
মৈঁ ক্যায় কেয়া জানো রাম, কৌন নয়নোঁ কবহুঁ না দীঠ॥

এই দোহায় কবিরদাস শ্রীরামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন, শ্রীরামকে ভারী বলতে তার খুবই ভয় করে (বহু ডরাউঁ)। আবার তাঁকে হালকা বললেও মিথ্যে বলা হয়। আসলে শ্রীরাম যে কেমন, তা তিনি কি করে বলবেন (মৈঁ ক্যায় কেয়া জানো) কারণ, তিনি তো কোনদিন শ্রীরামকে নিজের চোখে দেখেন নি।

*　　　*　　　*

গুরু গোবিন্দ দোউ খড়ে, কাকে লাগেঁ পাঁয়।
বলিহারী গুরু আপনে, জিন গোবিন্দ দিয়ো বতায়॥

কবিরদাসের মতে গুরু এবং গোবিন্দের (ভগবানের) মধ্যে গুরুই শ্রেষ্ঠ। সাধারণ মানুষ দ্বন্দ্বে পড়ে যায়, গুরু এবং ভগবানের মধ্যে কাকে সে আগে প্রণাম করবে (কাকে লাগেঁ পাঁয়)। মানুষের মনে এমন দ্বন্দ্ব হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর কথা হলো, মানুষের উচিত এই দ্বন্দ্ব ভুলে গুরুকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে তাঁর পদতলে মাথা নত করা। কারণ, গুরুই ঈশ্বরের সঙ্গে (গোবিন্দ নিয়ো বতায়) আমাদের মেল বন্ধন ঘটিয়ে দেন। সে জন্য তিনিই শ্রেষ্ঠ।

*　　　*　　　*

সব ধরতি কাগজ করুঁ, লেখনি সব বনরায়।
সাত সমুদ্র কী মসি করুঁ, গুরু গুণ লিখা ন জায়॥

গুরু কেন শ্রেষ্ঠ, গুরু কেন মানুষের একমাত্র আরাধ্য, কবি কবিরদাস তাঁর এই দোহায় সে কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, গুরুর গুণের কথা লিখে শেষ করা যায় না। সারা দুনিয়াটাকে (সব ধরতী) যদি কাগজ করা হয় এবং বন জঙ্গলকে যদি

কলম করা হয় ও সেই সঙ্গে সাত সমুদ্রের জলকে যদি কালি (সাত সমুদ্র কী মসী করুঁ) রূপে ব্যবহার করে লিখতে বসা হয়, তাহলেও গুরুর গুণের কথা সম্পূর্ণ হবে না।

*   *   *

কবীর গুরুকী ভক্তি করুঁ তজি বিষয়া রস চৌজ।
বার বার নহিঁ পাইহৈ, মানুষ জনম কী মৌজ ॥

কবির বলছেন, গুরু ভক্তির মধ্যে যতো আনন্দ, অতো আনন্দ বিষয় বাসনা পূর্তির মধ্যেও নেই। তিনি বলছেন, বিষয় বাসনা ত্যাগ করে (বিষয়া রস চৌজ) আমি যদি নিরন্তর গুরুর ভজনা করে যাই, তাহলে আমি সুখ লাভ করব। এই আনন্দ সুখ থেকে আমি বঞ্চিত হতে চাই না। মনুষ্য জন্মের আনন্দ তো বার বার মেলে না।

*   *   *

মেরা মুঝ মে কুছ নহী, জো কুছ হ্যায় সো তোর।
তেরা তুঝকো সেঁাপতে, কেয়া লাগৈগা মোর ॥

তাঁর কথা হলো, আমার নিজের বলতে কিছু নেই (মেরা মুঝে মে কুছ নহী)। আমার যা কিছু তা 'সো তোর' অর্থাৎ আপনারই। এখানে আপনি বলতে তিনি প্রভু ঈশ্বরকে বলছেন। আমার সব কিছু আপনার হওয়ায় আপনার কাছে আমার সব কিছু বিসর্জন দিতে আমার কখনো বাধবে না।

*   *   *

এয়সা কোঈ না মিলা, হমকো দে উপদেশ।
ভবসাগর মে বুড়তা কর গহি কাঢ়ৈ কেস ॥

এই দোহায় কবিরদাস বলছেন, হে প্রভু আজ পর্যন্ত আমাকে উপদেশ দেবার মতো কারুকে পেলাম না। চিন্তার সাগরে (ভবসাগর) ডুব দিয়ে শুধু শুধু আমার ক্লেশ (কেস) বাড়ল।

*   *   *

নেহ নিভায়ে হী বনে, সোচে বনে ন আন।
তন দে, মন দে, সীস দে, নেহ ন দীজে জান ॥

এই দোহায় সন্ত কবির প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, নেহ অর্থাৎ প্রেম দিলেই প্রেম পাওয়া যায়। প্রেম পাবার জন্য ভাবনার শিকার হলে চলবে

না। দেহ মন, মাথা সবই বিসর্জন দেওয়া যায়। কিন্তু প্রেমকে কখনো বিসর্জন দেওয়া যায় না। প্রেমের মূল্য সবচেয়ে বেশি।

*   *   *

জব মৈঁ থা তব হরি নহীঁ, অব হরি হ্যায় হম নাহিঁ।
প্রেম গলী অতি সাঁকরী, তামেঁ দো ন সমাহিঁ॥

কবিরদাস বলছেন, ঈশ্বরভক্তি এবং বিষয় বাসনা একই সঙ্গে চলতে পারে না। তিনি বলেছেন 'জব মৈঁ থা' অর্থাৎ মানুষ যখন নিজের বিষয় চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত, তখন ঈশ্বর তার থেকে অনেক দূরে (তব হরি নহীঁ) অবস্থান করেন। আবার যখন মানুষের মনে ঈশ্বরের প্রাধান্য (অব হরি হ্যায় হম নাহিঁ) তখন বিষয় বাসনার স্থান অতি দূরে। তিনি বলেছেন, প্রেমের পথ অতি সংকীর্ণ (সাঁকরী) এবং সংকীর্ণ প্রেমের পথে একই সঙ্গে দুজনের অবস্থান সম্ভব নয়।

*   *   *

প্রেম ছিপায়া না ছিপৈ, জা ঘট পরগট হোয়।
জো পৈ মুখ বোলৈ নহীঁ, নৈন দেত হ্যায় রোয়॥

প্রেম এমনই জিনিস যে, লুকোতে চাইলেও লুকিয়ে রাখা যায় না (ছিপায়া না ছিপৈ)। এই প্রেম হৃদয়ের মাধ্যমে (ঘট পরগট হোয়) প্রকাশ হয়ে পড়ে। যদিও (জো পৈ) মানুষ লোকলজ্জার ভয়ে মুখে প্রেম প্রকাশ করে না, তবু তার দুটো চোখ অশ্রুজলের মাধ্যমে (নৈন দেত হ্যায় রোয়) তা প্রকাশ করে দেয়। এখানে এই প্রেম বলতে তিনি ঈশ্বর প্রেমের কথা বলেছেন।

*   *   *

কবীর গর্ব ন কীজিয়ে, কাল গহে কর কেস।
না জানৈ কিত মারিহৈ, কেয়া ঘর কেয়া পরদেস॥

কবিরদাস বলছেন, গর্ব করো না। গর্ব করা খুব খারাপ। একবার মৃত্যুর কবলে (কাল গহে) পড়লে দুঃখের আর শেষ থাকবে না কিভাবে যে মৃত্যু তোমাকে শেষ করে (মারিহৈ) দেবে, তা তুমি জানো না। তখন কোথাও গিয়েও কোনভাবে নিস্তার পাবে না। গর্ব মানুষকে শেষ করে দেয়। তা মৃত্যুর থেকেও ভয়ংকর।

*   *   *

পানী কেরা বুদবুদা, অস মানুষ কী জাতি।
দেখত হি ছিপি জায়েগা, জিঁউ তারা পরভাতি॥

কবিরদাস বলছেন, মানুষ জাতির জীবন জলের বুদবুদের মতো ! বড় ক্ষণস্থায়ী এই জীবন। প্রভাতে (পরভাতি) আকাশের তারা যেমন একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায় (দেখত হি ছিপি জায়েগা), তেমন মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনও উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়।

মাটী কহৈ কুম্হার কো, তূ কেয়া রূঁদে মোহিঁ।
ইক দিন এয়সা হোয়েগা, ম্যায় রূঁদূঁগী তোহিঁ ।।

কুমোর মাটি নিয়ে কাজ করে। তাকে প্রতিদিন নানা রকমের মাটির পাত্র তৈরি করার জন্য মাটি দলতে, মাখতে হয়। সেজন্য কুমোর হয়তো মনে করে সে যেভাবে মাটিকে ব্যবহার করবে, সেভাবে তাকে ব্যবহৃত হতে হবে। কুমোরের এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য কবিরদাস বলছেন, কুমোরই চিরকাল মাটি দলে যাবে না, এমন একদিন আসবে যেদিন মাটিও কুমোরকে দলবে, মাখবে, (ম্যায় রূঁ দূঁগী তোহিঁ)। **অর্থাৎ** কিনা কাজ এক তরফা নয়, দু তরফা।

* * *

ইহ দুনিয়া দুই রোজ কী, মত কর যা সে হেত।
গুরু চরণন সে লাগিয়ে, জো পূরণ সুখ দেত ।।

কবিরদাস বলছেন, মায়া বড় বিষম বস্তু। এই পৃথিবীতে মানুষের আগমন সামান্য কয়েক দিনের (দুই রোজ কী) জন্য। তাই এই পৃথিবীর প্রেম বা মায়ার বাঁধনে (যা সে হেত) নিজেকে বেঁধে ফেলো না। তার চেয়ে গুরুর ভজনা করো। গুরুর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে (চরণন সে লাগিয়ে) পড়ে থাকো। গুরুই মানুষকে পরিপূর্ণ সুখ (পূরণ সুখ) দিতে পারেন।

* * *

দান দিয়ে ধন না ঘটে, নদী ন ঘটৈ নীর।
আপনী আঁখো দেখিয়ে, য়োঁ কথি কহৈ কবীর ।।

এই দোহায় কবিরদাস মানুষকে উদার হতে বলছেন। তিনি বলছেন, দান করলে ধন কমে যায় না (দান দিয়ে ধন না ঘটে)। প্রকৃতি থেকে নিজের এই কথার সমর্থনে উদাহরণ টেনে বলছেন : যেমন নদীর জল নদী কারুকেই দিতে কার্পণ্য করে না। কার্পণ্য করে না বলেই নদীর জলেও ঘাটতি পড়ে না (নদী ন ঘটৈ নীর)। শুধু প্রকৃতিতে কেন, নিজের চোখের দিকেও তাকিয়ে দেখুন (আপনী

আঁখো দেখিয়ে), যেখা নেও জলের কোন অভাব নেই। তাই তাঁর উপদেশ দান করো, দান করলে কোন ক্ষতি হয় না।

*　　　*　　　*

কথনী মীঠী খাঁড়-সী করনী বিষ কী লোয়।
কথনী তজি করনী করৈ, তো বিষ সে অমৃত হোয়॥

কবিরদাস বলছেন, এমন কিছু মানুষ আছে যারা মুখে খুব মিষ্টি কথা (কথনী মীঠী খাঁড়-সী) বলে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তারা বিষের থেকেও জ্বালাময় (বিষ কী লোয়) কাজ করে। যেসব মানুষ মুখে কথা না বলে কাজ করে (কথনী তজি করনী করৈ), তাদের কাজ বিষের মতো জ্বালাময় হলেও তা অমৃত সমান।

*　　　*　　　*

সাঈঁ ইতনা দীজিয়ে, জা মে কুটুম্ব সমায়।
ম্যায় ভী ভূখা না রহুঁ, সাধু ন ভূখা জায়॥

প্রভুর কাছে কবিরদাসের আবেদন, হে প্রভু, আমার এবং আমার আত্মীয় পরিজনের (জা মে কুটুম্ব সমায়) ভরণ পোষণের উপযুক্ত আহার বিহারের ব্যবস্থা করে দাও। আমি নিজে অভুক্ত থাকতে চাই না (ম্যায় ভী ভূখা না রহুঁ সাধু ন ভূখা জায়), চাই না কোন সজ্জন ব্যক্তিও অনাহারে থাকুন।

*　　　*　　　*

সাধু এয়সা চাহিয়ে, জৈসা সুভায়।
সার সার কো গহি রহৈ, থোথা দেহ উড়ায়॥

সৎ সাধু কেমন হওয়া উচিত, এই দোহায় কবির সেই কথাই বলেছেন। সাধু মানুষ কেবল সার জিনিসই গ্রহণ করবেন। অসার অপ্রয়োজনীয়গুলো ত্যাগ করবেন।

*　　　*　　　*

জো তো কোঁ কাঁটা বুবৈ, তাহি বোব তু ফুল।
তো হি ফুল কে ফুল হ্যায়, ওয়া কো হ্যায় তিরসুল॥

এই দোহায় কবিরদাস বলছেন, সৎ মানুষের উচিত সদাচরণ করা। যে তোমার গায়ে কাঁটা ফোটাবে (কাঁটা বুবৈ), অর্থাৎ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে, তার সঙ্গে তোমাকেও যে খারাপ ব্যবহার করতে হবে তা কিন্তু নয়। তোমার গায়ে কাঁটা

ফোটালেও তুমি তার দিকে ফুল এগিয়ে দাও। তোমার ফুলের বিনিময়ে তুমি ফুলই পাবে আর তার কাঁটার বিনিময়ে সে পাবে তিরসূল অর্থাৎ ত্রিশূল।

* * *

দুর্বল কো ন সতাইয়ে, জা কী মোটী হ্যায়।
বিনা জীব কী স্বাস সে, লোহ ভসম হৈ্ব জায়॥

তিনি বলেছেন, দুর্বল মানুষকে কষ্ট দেওয়া (সতাইয়ে) উচিত নয়। কারণ, দুর্বল, মানুষের অভিশাপ অত্যন্ত শক্তিশালী (মোটি)। দুর্বল মানুষের অভিশাপ যে কতোটা শক্তিশালী সেটা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলছেন, কামারের হাপরের হাওয়া (বিনা জীব কী স্বাস সে) যেমন লোহা গলিয়ে দেয়, তেমনি দুর্বল অসহায় মানুষের ক্রোধও সব কিছু ভস্ম করে দেয়। তাই তিনি বলেছেন, দুর্বল মানুষের ওপর নিরর্থক অত্যাচার করো না।

* * *

গোধন, গজধন, বাজিধন, ঔর রতন ধন, খান।
জব আবৈ সন্তোষ ধন, সব ধন ধূরি সমান॥

তিনি বলেছেন, মনের শান্তির মতো শ্রেষ্ঠ সম্পদ আর কিছু নেই (জব আবৈ সন্তোষ ধন)। মানুষ নানাবিধ সম্পত্তির অধিকারী হয়। সেই সব সম্পত্তির মধ্যে ধনরত্ন (রতন ধন), গরু, হাতি, ঘোড়া (গোধন, গজধন, বাজিধন) ইত্যাদি সবই পড়ে। কিন্তু মানুষ একবার মানসিক প্রসন্নতার অধিকারী হলে অন্য যাবতীয় সম্পদ ধুলোর মতো (ধূরি সমান) মাটিতে মিশে যায়। সে সব সম্পদের আর কোন মূল্য থাকে না।

* * *

তেরা সাঈঁ তুঝ মে, জিঁউ পুহুপনমে বাস।
কস্তূরী কা মিরগ কিঁউ, ফিরি ফিরি ঢুঁঢেঁ ঘাস॥

মানুষ ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য এখানে সেখানে পাগলের মতো খুঁজে মরে। অথচ সে জানে না যে ঈশ্বর তার মধ্যেই অবস্থান করেন। এই দোহায় তিনি সেই কথাই বলছেন। তিনি বলছেন, তোমার ঈশ্বর তোমার মধ্যেই (তেরা সাঈ তুঝ মে) রয়েছেন। তাঁকে পাওয়ার জন্য মন্দিরে, মসজিদে বা গির্জায় যেতে হবে না। কস্তুরী মৃগ (কস্তুরী কা মিরগ) তার দেহের সুবাস স্থল খুঁজে পাবার জন্য অরণ্যের ঘাসে ঘাসে মুখ দিয়ে ফেরে, অথচ সে জানে না সুগন্ধী কস্তুরী তার দেহের মধ্যেই রয়েছে। ফুলের মধ্যেই

যেমন সুগন্ধ (জিঁউ পুহুপনমে বাস) থাকে, তেমনি মানুষের মধ্যেও সুগন্ধ রূপী ঈশ্বর অবস্থান করেন।

*　　　*　　　*

সুখিয়া সব সংসার হ্যায়, খায়ে অরু সোবৈ।
দুখিয়া দাস কবীর হ্যায়, জাগৈ অরু রোবৈ॥

এই সংসার অর্থাৎ পৃথিবীতে তারাই সুখী (সুখিয়া), যারা সারা দিন খায় দায় আর ঘুমিয়ে থাকে। আর দুঃখী কবিরদাসের মতো কিছু মানুষ, যারা সুখী মানুষের হাল দেখে জেগে জেগে কেবল কাঁদে (জাগৈ অরু রোবৈ)। এই পৃথিবীতে কবিরদাসের মতো মানুষের সুখ নেই।

*　　　*　　　*

পোথী পঢ়ি পঢ়ি জগ মুবা, পণ্ডিত ভয়া ন কোই।
একৈ আখের প্রেম কা, পঢ়ে সো পণ্ডিত হোই॥

এই দোহায় কবিরদাস প্রেমের জয়গান গেয়েছেন। তিনি বলছেন সারা দুনিয়ার পুঁথি পাঠ (পোথী পঢ়ি পঢ়িজগ মুৱা) করলেই পণ্ডিত হওয়া যায় না। পণ্ডিত বা জ্ঞানী হতে গেলে একটা শব্দের সঙ্গে পরিচিত হলেই হয়। (একৈ আখর) এবং সেই শব্দটি হলো প্রেম। প্রেম অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেম, মানব প্রেম। তাঁর চিন্তায় প্রেমের স্থান সবার ওপরে।

*　　　*　　　*

জাতি পাঁতি পুছৈ নহিঁ কোঈ।
হরি কা ভজৈ সো হরি কা হোঈ॥

কবিরদাস মানুষের জাত পাতে বিশ্বাস করতেন না। ভক্তি যুগে তিনি যে সম্প্রদায়ের কবি ছিলেন, সেই সম্প্রদায়ের মানুষ মানুষের মধ্যে জাত পাতের বিচারে বিশ্বাস করতেন না। মানুষের মধ্যে কোন রকমের বিভেদ মেনে নিতে পারতেন না। তাঁদের চোখে, যে ঈশ্বরের ভজনা করে, সেই ঈশ্বরের ভক্ত। তাই তিনি বলছেন, জাত পাত (জাতি পাঁতি) জানতে চেও না (পুছৈ নহিঁ কোঈ)। যে হরি অর্থাৎ ঈশ্বরের ভজনা করে, সেই ঈশ্বরের আপনজন হয়ে যায় (হরি কা হোঈ)।

*　　　*　　　*

সভী রসায়ন হম করী, নহিঁ নাম সম কোয়।
রঞ্চক ঘটমে সঞ্চরে, সব তন কঞ্চন হোয়॥

কবিরদাস তাঁর এই দোহায় ঈশ্বরের মাহাত্ম্যই প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, সব (সভী) ধরনের ওষুধ পত্র (রসায়ন) ইত্যাদি আমি খেয়েছি (করী)। খেয়েও এমন কোন ফল পাইনি, যে ফল পেয়েছি ঈশ্বরের (সম) নাম করে। তিনি আরো বলেছেন, এই ঈশ্বরের নামরূপী পদার্থ (রসায়ন) অতি সামান্য (রঞ্চক) পরিমাণেও শরীরে (ঘটমে) প্রবেশ করলে, সে শরীর সোনার (কাঞ্চন) মতো মহা মূল্যবান হয়ে ওঠে (হোয়)। তাঁর বিচারে ঈশ্বরের নামের ওপরে আর কিছু থাকতে পারে না।

* * *

মোকো কহাঁ ঢুঁঢ়ে বন্দে,
ম্যায় তো তেরে পাসমে।
না ম্যায় বকরী না ম্যায় ভেড়ী
না ম্যায় ছুরী গঁড়াসমে।
নহীঁ খালমে নহী পোঁছমেঁ,
না হডডী না মাঁসমেঁ।
না ম্যায় দেবল না ম্যায় মসজিদ
না কাবে কৈলাশমে।
না তো কো নো ক্রিয়া কার্যমে
নহী জোগ বৈরাগমে।
খোজী হোয় তুরতৈ মিলিহোঁ
পল ভরকী তলাসমে॥
ম্যায় তো রহোঁ সহরকে বাহর
মেরী পুরী মবাসমে।
কহে কবীর সুনো ভাই সাধো,
সব সাঁসোঁকী সাঁসমে॥

কবিরদাস তাঁর এই পদে মানুষের কাছে ঈশ্বরের বিকাশ বাতলে দিয়েছেন। মানুষ ভাবে ঈশ্বর বুঝি এমন কোন গোপন স্থানে অবস্থান করেন, যেখানে মানুষের যাওয়া সম্ভব নয়। মানুষ থেকে তিনি অনেক দূরে অবস্থান করেন। মানুষের এমন ধারণা ভুল বলেই তিনি পদের শুরুতে বলছেন, ওহে আমার ভক্ত শিষ্য (বন্দে) আমাকে তুমি খোঁজ কেন, আমি তো তোমার কাছেই আছি। আমি ছাগলও (বকরী) নই, আবার ভেড়াও নই খাপে পোরা ছুরিও নই। মানুষের দেহের চামড়া (খালমে), হাড়, মাংসে আমাকে পাবে না। মন্দির, দেব মসজিদ বা কৈলাশেও আমার দেখা পাবে না। আমাকে পাওয়ার

জন্য অতো দৌড়-ঝাঁপের প্রয়োজন নেই। আমাকে পাবে সাংসারিক মায়ার বন্ধনের বাইরে। মানুষের হৃদয় নামের নগরীতে আমার অবস্থান। শারীরিক কামনা সংযমিত করলেই আমাকে পাওয়া যায়।

* • *

মায়া ছায়া এক সী, বিরলা জানৈ কোয়।
ভগতাকে পাছে ফিরৈ সনমুখ ভাগৈ সোয়॥

প্রকৃতি থেকে উদাহরণ টেনে এনে কবিরদাস মানুষকে বোঝাতে চাইছেন, মায়া বড় বিষম বস্তু। একমাত্র ছায়ার মাধ্যমেই মায়ার বিষমতা প্রকাশ করা যায়। যে মানুষ মায়া অর্থাৎ সংসার থেকে দূরে সরে যেতে চায়, ছায়ার মতো মায়া তার পিছু পিছু ফেরে। আর যে মানুষ আগ বাড়িয়ে মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়তে চায়, ছায়ার মতো মায়া তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। তার পক্ষে আর মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়া হয়ে ওঠে না।

* * •

জল মে কুম্ভ, কুম্ভ মে জল হ্যায়, বাহির ভীতর পানী
ফুটা কুম্ভ জল জলহি সমানা, য়হু তত কথো গিয়ানী॥

এই দোহায় কবিরের রহস্যবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। যে রহস্যবাদের জন্য তাঁর খ্যাতি, সে রহস্যবাদ এই দোহায় দেখতে পাওয়া যায়। এই দোহার মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, মায়ার জন্যই পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম ও রূপের অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এই মায়ার বাঁধন থেকে মুক্তি পাওয়া মানে আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পুনরায় একবার সংযোগ স্থাপিত হওয়া। আত্মা ও পরমাত্মার একই শক্তির দুটি ভাগ। মায়ার পর্দা এদের পৃথক করে দিয়েছে। উপাসনা ও জ্ঞানার্জনের জন্য মায়ার বাঁধন ছিন্ন হয়ে গেলে দুটি ভাগ আবার এক হয়ে যায়। এই দোহায়—একটি কলসি জলে ভাসছে। কলসিতে সামান্য জল আছে। কলসির ভেতরের জল আর বাইরের জল একই। কিন্তু কলসির পাতলা আবরণের জন্য দুই জলে মিলন ঘটছে না। এইভাবেই মায়া ব্রহ্মের দুই স্বরূপের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখে। কলসি ভেঙে গেলে দুই জল মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। এভাবেই মায়ার আবরণ ভেঙে আত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটে যায়। এই অদ্বৈতবাদই কবিরের রহস্যবাদের আধার।

* • *

হরি রস পীয়া জানিয়ে, কবহুঁ ন জায় ঘুমার।
ম্যায় মনতা ঘুমত ফিরৈ, নাহীঁ তন কী সার॥

সন্ত কবির সুফি মতবাদের দ্বারাও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই দোহায়

সুফির চিন্তার প্রভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। সুফি চিন্তায় প্রেমের মধ্যে নেশাই প্রধান। তাই এই দোহায় তিনি বলতে পারেন, ঈশ্বর চিন্তারূপী রস যে একবার পান করেছে, তার নেশা কখনো কাটে না।

* * *

হরি মরি হ্যায় তো হম হূঁ মরি হ্যায়।
হরি ন মরৈ হম কাহে কো মরি হ্যায়॥

এটি কবিরের রহস্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাব প্রসূত আর একটি দোহা। এই দোহার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চাইছেন যে, আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মিলন এতো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে, এই দুয়ের মধ্যে একের বিনাশ ঘটলে অপরেরও বিনাশ ঘটে। একের অস্তিত্বের দ্বারা অপরের অস্তিত্ব সার্থক হয়ে ওঠে। তিনি বলছেন, হরি মারা যাওয়া মানে, আমারও মারা যাওয়া। আর হরি অর্থাৎ ঈশ্বর বেঁচে থাকা মানে, আমারও বেঁচে থাকা। ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়ার এই চিন্তা রহস্যবাদী ধারণাই প্রকাশ মাত্র।

* * *

সন্তো রাহ দোউ হম দীঠা।
হিন্দু তুছক হটা নহিঁ মানৈ, স্বাদ সবনকো মীঠা॥
হিন্দু বরত একাদসি সাধৈ, দুধ সিংঘাড়া সেতী।
অনকো ত্যাগৈ মন নহি হটকৈ, পারন করৈ সগোতী॥
রোজা তুরক নমাজ গুজারৈ, বিসমিল বাঁগ পুকারৈ।
উনকো ভিস্ত কহাঁ তে হোই হ্যায়, সাঁঝে মুরগী মারৈ॥
হিন্দু দয়া মেহরকো তুরকন, দেনোঁ ঘট সোঁ ত্যাগী।
বৈ হলাল বৈ ঘটকা মারৈ আগি দুনোঁ ঘর লাগী॥
হিন্দু তুরুক কী এক রাহ হ্যায়, সতগুরু ইহৈ বতাঈ।
কহহি কবীর সুনো হো সন্তো, রাম ন কহেউ খোদাঈ॥

কবিরদাসের সময় উত্তর ভারতে হিন্দু এবং মুসলমান এই উভয় ধর্মেরই প্রভাব ছিল। তিনি নিজের চোখে দেখেছেন, জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, এই দুই ধর্মের সমালোচনার দিকগুলি। তাঁর এই দীর্ঘ পদে সেই সমালোচনাই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলছেন, আমি দুটি পথ (রাহ দোউ হম দীঠা) দেখেছি। এই পথ হলো, হিন্দু ধর্মের পথ এবং মুসলমান ধর্মের পথ। এই দুটি ধর্মের মূল কথা একই (স্বাদ সবনকো মীঠা)। হিন্দু একাদশীর দিন ভাত খায় না, দুধ সিঙারা খেয়ে থাকে। আর এদিকে মুসলমানেরা রোজার মাসে সারাদিন উপবাস করে সন্ধেবেলা ভরপেট খায়।

সন্ধ্যেবেলা (সাঁঝে) মুরগি মারলে তারা স্বর্গে (ভিস্ত) যাবে কি করে। হিন্দু মুসলমান (তুরুকন) উভয়েরই হৃদয় থেকে (ঘট সোঁ) দয়া,করুণা (মেহর কো) লুপ্ত হয়ে গেছে, এদের বিনাশ হওয়া দরকার। এদের ঘরে আগুন লাগুক (আগি দুনোঁ ঘর লাগী)। মুসলমানরা পোচ মেরে পশু হত্যা (হলাল) করে আর হিন্দুরা এক ঝটকায় মেরে হত্যা করে। এরা কেউই রাম বা খোদাকে (খোদাঈ) চায় না।

* * *

নিন্দক নিয়রে রাখিয়ে, আঁগন কুটী ছবায়।
বিন পানী সাবুন বিনা, নির্মল করে সুভায়।।

কবিরদাস এই দোহায় বলেছেন, নিন্দুককে নিন্দুক বলে দূরে সরিয়ে রেখ না। তাকে বাড়ির উঠোনের ছায়ায় (আঁগুন কুটী ছবায়) আশ্রয় দাও। নিন্দুক না থাকলে তোমার ভালো হবে না। কেন ভালো হবে না তার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, জল এবং সাবান (বিন পানী সাবুন বিনা) ছাড়া যেমন জামা-কাপড় পরিষ্কার হয় না, তেমনি নিন্দুক না থাকলে ভুল ভ্রান্তি থেকে বিরত হয়ে মনের প্রসন্নতা মেলে না। মন নির্মল, স্বচ্ছ হয় না।

* * *

জাকো রাইখ সাঈয়াঁ, মারি ন সক্কে কোয়।
বাল ন বাঁকা করি সকৈ, জো জ্যা বৈরী হোয়।।

কবিরদাসের বিশ্বাস, ঈশ্বর (সাঈয়াঁ) যার রক্ষক, কেউ তাকে (কোয়) মারতে পারে না। সারা দুনিয়ার বিরোধী হলেও কেউ তার সামান্যতমও ক্ষতি (বাল ন বাঁকা করি সকৈ) করতে পারে না। তাঁর বিশ্বাস ঈশ্বর শক্তিধর বলে এটা সম্ভব।

* * *

সমঝৈ তো ঘরমে রহৈ, পরদা পলক লগায়।
তেরা সাহিব তুঝমেঁ, অনত কহুঁ মত জায়।।

তিনি বলছেন, তুমি যদি মনে করো, ঈশ্বর তোমার মধ্যেই (ঘরমে) আছেন, তাহলে চোখের পাতা (পলক) রূপী পর্দা (পরদা) টাঙিয়ে ঈশ্বরের ভজনা করে যাও। তাঁকে ঠিক পেয়ে যাবে।

* * *

লালী মেরে লালকী, জিত দেখোঁ তিত লাল।
লালী দেখন ম্যায় গঈ, ম্যায় ভী হো গঈ লাল।।

এই দোহায় ঈশ্বরের মহিমার কথা বলা হয়েছে। তিনি বলছেন, ঈশ্বরের মহিমা অপার। ঈশ্বরের উপস্থিত (লালী মেরে লালকী) সর্বত্র। যেদিকে তাকাবে, সেদিকেই (জিত দেখোঁ তিত) তুমি ঈশ্বরকে দেখতে পাবে। এমনই সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বরকে দেখতে গিয়ে আমিও ঈশ্বরে মিলে গেছি। তাঁর ব্যক্তিত্বে লীন হয়ে গেছি।

* *

পানী হী তে হিম ভয়া, হিম হী গয়া বিলায়।
কবিরা কো থা সোই ভয়া, অব কুছ কহা ন জায়॥

এই দোহায় আত্মা ও পরমাত্মার যোগসূত্রের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, জল থেকেই (পানী হী তে) বরফ হয় (হিম ভয়া) আবার ঐ বরফ গলে (বিলায়) জল হয়ে যায়। এই যে জল গলে বরফ আবার বরফ থেকে জল হয়ে যাওয়ার পদ্ধতি, এই পদ্ধতিতেই আত্মা শরীরের রূপ ধারণ করে আবার শরীর ছেড়ে পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়। কবির বলেছেন, এটাই হলো সার কথা, এর বেশি আর কিছু আমার বলার নেই।

* * *

আত্ম অনুভব জ্ঞানকী, জো কোঈ পুছৈ বাত।
সো গুংগা গুড় খাঈকৈ, কহে কৌন মুখ স্বাদ॥

কবিরদাস বলছেন, যে মানুষ আত্মসাক্ষাৎকারের জ্ঞান লাভ করেছে, তার কাছে ঐ জ্ঞানের প্রকৃতি জানতে চেও না। কারণ এই আত্ম উপলব্ধির জ্ঞান (আত্ম অনুভব জ্ঞানকী) অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। বোবা (গুংগা) মানুষ যেমন মিষ্টি খেয়ে (গুড় খাঈকৈ) মিষ্টির স্বাদ নিজে উপলব্ধি করতে পারে, অথচ কারুকে জানাতে পারে না, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার, তাঁর সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের আনন্দও অন্যের কাছে ব্যাখ্যা করা যায় না।

* * *

ছীর রূপ সতনাম হ্যায়, নীর রূপ ব্যবহার।
হংস রূপ কোঈ সাধু হ্যায়, ততকা ছাননহার॥

হাঁস যেমন জল থেকে দুধ আলাদা করে দুধ খেয়ে নেয়, সংসারজ্ঞানে জ্ঞানী কোন সাধু তেমনি সংসারের বন্ধন মুক্ত থেকে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেন। তিনি বলছেন ঈশ্বরের নাম (সতনাম) হলো দুধের (ছীর) মতো। আর মানুষের ব্যবহার জলের মতো। এই ব্যবহার হলো মায়া, মমতা, সাংসারিক বন্ধন। হংসরূপী কোন সাধু

সাংসারিক মায়া, মমতার বন্ধন থেকে ঈশ্বর জ্ঞানকে পৃথক ভাবে গ্রহণ করে ঈশ্বর নামের আনন্দ লাভ করেন।

*   *   *

সমদৃষ্টি সতগুরু কিয়া, মেটা ভরম বিকার।
জহঁ দেখো তহঁ এক হী, সাহেবকা দীদার॥

এই দোহায় কবিরদাস তাঁর প্রতি সদগুরুর করুণার কথাই বর্ণনা করছেন। তিনি বলেছেন, গুরু তাঁকে সমদৃষ্টি প্রদান করেছেন। সমদৃষ্টি অর্থে সবাইকে সমান চোখে দেখার দৃষ্টি। এই দৃষ্টি লাভের ফলে মনের ভ্রম (ভরম), বিকার কেটে গেছে। মানুষকে আর ছোট বড় বলে বিচার করার, পৃথক করার বাসনা জাগে না। যেদিকে তাকাও, সেদিকে কেবল একই ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়।

*   *   *

জল জিউ প্যারা মাছরী ভক্ত পিয়ারা দাম।
মাতা প্যারা বালকা, ভক্ত পিয়ারা নাম॥

ভক্তের কাছে ভগবান অতি প্রিয়। ভক্ত ভগবানকে কতোটা ভালোবাসে, তারই তুলনামূলক পরিচয় দিয়েছেন তিনি এই দোহায়। মাছ (মাছরী) যেমন জলকে ভালোবাসে, লোভী মানুষ অর্থ, সম্পদ, জাগতিক সুখ (দাম) ভালোবাসে, মা যেমন তার সন্তানকে ভালোবাসে, তেমনি করেই ভক্ত তার প্রভুকে ভালোবাসে৲ ভক্তের এই ভালোবাসার মধ্যে মাছের জলপ্রেম, লোভীর অর্থপ্রেম, মায়ের বালক প্রেমের মতো আন্তরিক প্রেম বিদ্যমান।

*   *   *

মোরী চুনরী মে পরি গয়ো দাদা পিয়া।
পাঁচ তত্ত কৈ বনী চুনারিয়া সোলহ সৈ বন্দ লাগৈ জিয়া।
ইয়হ চুনরী মোরে মৈকে তে আয়ী সসুরেমে মনুয়া খোয় দিয়া।
মলি-মলি ধোই দাগা ন ছুটে জ্ঞানকো সাবুন লায় পিয়া।
কহত কবীর দাগা তব ছুটিহৈ জব সাহব আপনায় লিয়া॥

আমার চুনরী (অর্থাৎ ওড়না) এখানে শরীরে দাগা লেগে (পরি গয়ো দাগ) গেছে। অর্থাৎ আমার শরীর বিষয় বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। এই শরীর পাঁচ তত্ত্বের সমষ্টি। ভারতীয় চিন্তাধারায় বলা হয় আকাশ, জল, আগুন, হাওয়া এবং পৃথিবী এই পাঁচ তত্ত্বের সমাহার আমাদের শরীর। এই শরীর নানা রকমের মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। মায়ের বাড়ি, বাবার বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি ইত্যাদি নানা দিক থেকে

আত্মীয়তার বাঁধনে বাঁধা। চুনরী রূপী শরীর থেকে জ্ঞান রূপী সাবানের স্পর্শেও এই দাগ যায় না। কবিরদাস বলছেন তখনই এই দাগের স্পর্শ মুক্ত হওয়া যায়, যখন ঈশ্বর কাছে টেনে নেবেন। অর্থাৎ এই মায়ার সংসার থেকে মুক্তি মিলবে।

* * *

পীয়া চাহে প্রেম রস, রাখা চাহৈ মান।
এক ম্যানমে দো খড়গা, দেখা সুনা ন কান।

এই দোহাঁর মাধ্যমে কবিরদাস বলছেন, ঈশ্বরভক্তি এবং ব্যক্তিস্বার্থের পূর্তি একই সঙ্গে সম্ভব নয়। কেউ যদি মনে করে সে প্রেম রস পান করবে অর্থাৎ ঈশ্বর ভক্তিতে লীন থাকবে, আবার পাশাপাশি নিজের গর্ব, অহংকার নিয়েও থাকবে, তাহলে সে ভুল করবে। কারণ, এমন মোটেই সম্ভব নয়। একটি খাপে (ম্যান) যেমন একসঙ্গে দুটি তরোয়াল রাখা যায় না, তেমনি ঈশ্বর ভক্তি ও স্বার্থপরতা একই সঙ্গে কোন মানুষের সঙ্গী হতে পারে না। কবিরদাস বলেছেন, এমন ঘটনা তিনি কখনো চোখে দেখেননি বা কানে শোনেন নি (দেখা সুনা ন কান)।

* * *

নৈনোঁকী করি কোঠরী, পুতলী পলংগ বিছায়।
পলকোঁকী চিক ডারিকৈ, পিয়কো লিয়া রিঝায়॥

নিজের অন্তরে কি ভাবে ঈশ্বরকে স্থান দেব, এই দোহাঁয় সেই কথাই লেখা হয়েছে। তিনি বলছেন, চোখ দুটিকে (নৈনোঁকী) করলাম ঘর চোখের তারাকে করলাম বিছানা, দু'চোখের পাতা (পলকে) দিয়ে করলাম আড়াল—এমনই এক নিরাপদ স্থানে প্রিয় ঈশ্বরকে বসিয়ে তাঁর সেবা করা উচিত।

* * *

হরিসে জনি তূ হেত কর, কর হরিজনসে হত।
মাল মুকুল হরি দেত হ্যায়, হরি হরিজন হরিহী দেত॥

এই দোহাঁয় কবির মানুষকে প্রেম করার কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, তুমি ঈশ্বর ভজনা করো না। ঈশ্বর (হরি) এর সঙ্গে তোমার নৈকট্য স্থাপনের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর বাদ দিয়ে তুমি বরং সাধারণ মানুষকে (হরিজনসে) প্রেম করো। সাধারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করো। বিষয় সম্পত্তি (মাল মুকুল) এসব জিনিস প্রভুরই দান। আর মানুষও প্রভুর দান। সুতরাং প্রভু অর্থাৎ হরি বা ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের সন্তান হরিজনের সেবা করো। হরিজনের সেবা করলেই হরিকে পাওয়া হবে।

* * *

প্রীতমকো পতিয়াঁ লিখুঁ, জো কুহুঁ হোর বিদেস।
তনমে মনমে নৈন মে, তাকো কহা সংদেস ॥

বিদেশ (বিদেস) বাসী প্রিয়তমকে (প্রীতমকো) তার প্রেমিক চিঠি লেখে (পতিয়াঁ লিখুঁ)। সেই চিঠিতে তার মনের প্রেম, ভালোবাসা, আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। কবিরদাস বলেছেন, আমার প্রিয়তম ঈশ্বর। তাঁকে আমি আবার চিঠি লিখতে যাবো কেন। তিনি তো আমার দেহে, মনে, চোখে (তনমে, মনমে, নৈনমে) সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর কাছে আমি আমার প্রেমের বার্তা (সংদেস) পাঠাতে যাবো কেন।

মালা ফেরত জুগ গয়া, গয়া ন মনকা ফের।
করকা মনকা ডারি কৈ, মনকা মনকা ফের।

কবিরদাস বাহ্য ধর্মীয় আড়ম্বর, অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন। হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম যাই হোক না কেন, সেই ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠান তাঁর পছন্দ হতো না, তার সমালোচনা করতে তিনি কসুর করেন নি। মনের মলিনতা (মনকা ফের) কাটাবার উদ্দেশ্যে মানুষ মালা জপে। মালা জপতে জপতে তার একটা জীবনই শেষ হয়ে যায়। তবু মানুষের মনের মলিনতা যায় না। কারণ মনের মলিনতা মুক্তির জন্য মালা জপে কোন উপকার হয় না। তাই তিনি বলেছেন, হাতের (করকা) মালা (মনকা) জপা ছেড়ে মনের বৃত্তির পরিবর্তন করো (মনকা মনকা ফের)। সুস্থ সহযোগী মন হলেই মনের মলিনতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

* * *

মেরা তেরা মনুয়াঁ কৈস এক হোই রে।
ম্যায় কহতা হোঁ আঁখিন দেখি, তূ কহতা কাগজ কী লেখী ॥
ম্যায় কহতা সুরঝাবনহারী, তূ রাখ্যো অরুঝাই রে।
ম্যায় কহতা তূ জাগত রহিয়ো, তূ রহতা হ্যায় সোই রে ॥

কবিরদাস তাঁর এই পদে বলেছেন, আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তির (এখানে কবিরদাসের) সঙ্গে বিষয় বাসনার জালে জড়িয়ে পড়া মানুষের (তেরা) মনের মিল কি করে সম্ভব। আমি নিজের চোখের (আঁখিন) দেখার অভিজ্ঞতা থেকে বলি, তুমি বাইরের লেখা পড়ে বলো। আমি এমন কথা বলি, যাতে জীবনের রহস্য সহজে বোঝা যায় (সুরঝাবনহারী) আর সাধারণ মানুষ (তূ) যে সব কথা বলে, তাতে জটিলতা বাড়ে। আমি মানুষকে সজাগ থাকতে বলি আর মানুষ সজাগ (জাগত) থাকার বদলে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

তাই তিনি বলছেন, মানুষ যেখানে তাঁর কথা শোনে না, সেখানে কি করে বিষয় বাসনার চক্রে আটকা পড়া মানুষ ও আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী যোগী মানুষ এক হয়।

*

মালা তো করমে ফিরৈ, জীভ ফিরৈ মুখ মাহিঁ।
মনবাঁ তো দহু দিসি ফিরৈ, ইয়হ তো সুমিরন নাহিঁ॥

এই দোহায় তিনি বলেছেন, এমন অনেক মানুষ আছে, যারা মালা জপে। মালা জপা মানুষদের মধ্যে যারা ভণ্ড, তাদের তিনি সমালোচনা করছেন। তিনি বলছেন মালাজপা যোগীরা হাতে মালা জপে। কিন্তু মুখে তাদের অন্য চিন্তা। অর্থাৎ বলব এক রকম আর করব এক রকম। এদের মন (মনবাঁ) দু'দিকে দৌড়ায়। এটা মোটেই সুলক্ষণ (সুমিরণ) নয়।

* * *

সাধু গাঁধি ন বাঁধঈ, উদর সমাতা লেয়।
আগে পীছে হরি খড়ে, জব মাঁগৈ তব দেয়॥

কবিরদাস বলছেন, সৎ মানুষ কখনো কিছু তাড়াহোর চেষ্টা করে না। সৎ মানুষ পুঁটলি (গাঁঠি) বাঁধেন না (বাঁধঈ)। যেটুকু দরকার, সেটুকুই গ্রহণ করেন। দোহায় এই কথাটাই তিনি এভাবে বলছেন যে, যার পেটে (উদর) যতোটা ধরে (সমাতা) ততোটাই সে গ্রহণ (লেয়) করে। তার জন্য সব সময় (আগে পীছে) ঈশ্বর তৈরি হয়েই রয়েছেন। চাইলে (জব মাঁগৈ) তাঁকে পাইয়ে নেন। যে মানুষ সৎ, প্রয়োজনের বেশী গ্রহণ করে না, ঈশ্বরও তাকে দিতে কার্পণ্য করেন না।

* * *

ক্যায়া মুখ লৈ বিনতি করোঁ, লাজ আবত হ্যায় মোঁহি।
তুম দেখত ঔগুন করোঁ, কৈসে ভাবোঁ তোহি॥

হে প্রভু, আমি আপনার কাছে কোন মুখে (ক্যায়া মুখ) প্রার্থনা করবো। (বিনতি করোঁ) আপনার কাছে নিজের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করতে আমার লজ্জা হচ্ছে। আপনার চোখের সামনেই (তুম দেখত) আমি অন্যায় কাজ (ঔগুন করোঁ) করছি। এ আপনার ভালো (ভাবোঁ) লাগবে কি করে। অর্থাৎ এই দোহায় তিনি বলছেন যে মানুষ অন্যায় কাজ করে, স্বার্থের সাগরে ডুবে থাকে, ঈশ্বরের কাছে তার কিছু চাওয়া উচিত নয়।

* * *

উততে কোই ন বাহুরা, জাসে বুঝুঁ ধায়।
ইততেঁ সবহী জাত হ্যায়, ভার লদায় লদায়॥

তিনি বলছেন, স্বর্গ থেকে (উততে) কেউ এই পৃথিবীতে ফিরে আসে না। যাকেই (জাসে) জিজ্ঞেস করি সেই বলে, স্বর্গ থেকে সে আসে নি   এই লোক (ইততেঁ) থেকে সবাই (সবহী) যায়। গিয়ে স্বর্গের পাপের পুণ্যের বোঝা বাড়ায় (ভার লদায় লদায়)।

* * *

মন লাগো মেরে যার ফকীরীমে।
জো সুখ পায়ো রাম-ভজনমে, সো সুখ নাহিঁ অমীরীমে॥
ভলা বুরা সবকী সুন লীজৈ, কর গুজরান গরীবীমেঁ।
প্রেম-নগরমে রহনি হমারী, ভলি বনি আঈ সবুরীমে॥
হাথমে কুণ্ডী, বগলমে সোটা, চারোঁ দিসি জাগীরীমে।
আখির ইয়হ তন খাক মিলেগা, কহা ফিরত মগরুরীমে॥
কহৈ কবীর সুনো ভাই সাধো, সাহিব মিলৈ সবুরীমে॥

কবিরদাস তাঁর এই পদে ঈশ্বর ভজনার পরামর্শ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, রাম রাম ভজনা (রাম ভজনমে) করলে যে সুখ পাবে, যে আনন্দ পাবে, সে সুখ, আনন্দ বড়লোক, ধনী হওয়ার মধ্যে পাবে না। হে বন্ধু (মেরে যার) গরিব হয়েই থাকো। সবার সুখ, দুঃখের খবর নাও এবং গরিবের মতো দৈনন্দিন জীবন যাপন করো। আমাদের এই একটা জীবন যেন সুখে কাটে। একটু ধৈর্য ধরলে (সবুরীমে), অর্থাৎ নিজের কামনা বাসনাকে একটু সংযমিত করলে ভালো ফলই পাওয়া যায়। হাতে আহার পাত্র (কুণ্ডী), বগলের নিচে লাঠি (সোটা) নিয়ে সারা দুনিয়া ঘোরার অধিকার পেয়ে গেলেও তাতে কি আর এমন লাভ! গর্ব, অভিজাত্য (মগরুরী) এসব থেকে কি হবে! শেষ পর্যন্ত এই দেহ তো ছাই হয়ে যাবে! তাই কবিরদাস বলছেন, ওসব স্বার্থ, গর্ব আভিজাত্য ত্যাগ করে ধৈর্য ধরে রাম নাম ভজনা করো। তাহলেই ঈশ্বরকে পেয়ে যাবে।

* *

কহতা তো বহুতা নিলা, গহতা মিলা ন কোই।
সো কহতা বহি জান দে, জো নহিঁ গহতা হোই॥

বড় বড় কথা বলার লোকের কোন অভাব হবে না। কথা বলতে ওস্তাদ এমন মানুষের কোন অভাব নেই সমাজে। কিন্তু বেশি বড় বড় কথা বলা (কহতা) ছেড়ে

কাজের কাজ করার মতো লোক (গহতা) বিশেষ চোখে পড়ে না, যে (সো) বেশী কথা বলে, তাকে ত্যাগ করে, যে মানুষটা কাজের কাজ করে তাকে যেতে দিয়ো না।

* * *

নিরমল ভয়া তো কেয়া ভয়া, নিরমল মাঁগে ঠৌর।
মল নিরমলতেঁ রহিত হ্যায়, তে সাধু কোই ঔর ॥

মানুষ স্বচ্ছ, পাপ রহিত (নিরমল) হয়। এমন হতেই পারে। স্বচ্ছ, পাপ রহিত মানুষও আশ্রয় কামনা করে। আর যে মানুষ পাপ ও পুণ্য এই দুইয়েরই প্রভাব মুক্ত, এই দুইয়েরই ওপরে অবস্থান করে, সেই প্রকৃত সাধু মানুষ। তাঁর কাছে পাপাত্মা ও পুণ্যাত্মা এই দুই-ই সমান।

* * *

ইয়হ তন বিষকী বৈলরী, গুরু অমৃতকী খান।
সীস দিয়ে জো গুরু মিলৈ, তৌ ভী সস্তা জান ॥

তিনি বলছেন, মানুষের এই দেহ বিষের লতা এবং ঈশ্বর হলেন অমৃতের খনি। তাই যে একবার গুরুর সন্ধান পেয়েছে, তার মতো ভাগ্যবান আর কেউ নেই। গুরুই শ্রেষ্ঠ, গুরুর ওপরে কেউ নেই, এ কথাই তিনি বললেন এই দোহায়।

* * *

বৃচ্ছ কবহুঁ নহিঁ ফল ভখৈঁ, নদী ন সঞ্চৈ নীর।
পরমারথকে কারণে, সাধুন ধরা সরীর ॥

পৃথিবীতে সাধু (সাধুন) অর্থাৎ গুরু শ্রেণীর মানুষ কেন আবির্ভূত হন, সে কথাই কবিরদাস এই দোহায় বলছেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, গাছ (বৃচ্ছ) কখনো (কবহুঁ) তার ফল ভোগ (ভখৈঁ) করে না। নদী তার জল নিজের ব্যবহারে লাগায় না। এগুলো তারা মানুষ ও পশু পাখিদের ব্যবহার করতে, ভোগ করতে দেয়। সেই রকম ভাবে মহাত্মাগণও পরমার্থের জন্য (পরামারথকে) পৃথিবীতে আবির্ভূত হন।

* * *

কবিরা নৌবত আপনী, দিন দস লহু বজায়।
ইয়হ পুর পট্টন ইয়হ গলী, বহুরী ন দেখো আয় ॥

কবির বলছেন, এ জীবন বড় ছোট। তাই এই শহর, মানুষ, গলিপথ ইত্যাদি যা কিছু দেখার দেখে নাও। আর একবার এই পৃথিবীতে এসে দেখার সুযোগ হবে না। পৃথিবীর জীবনের মায়া কাটাতে পৃথিবীকে ভালো করে জেনে নেওয়া দরকার।

* * *

জৈসা অন-জল খাইয়ে, তৈসা হী মন হোয়।
জৈসা পানী পীজিয়ে, তৈসী বাণী সোয়॥

মানুষ যেমন খাদ্য গ্রহণ করে, সেই রকমই তার মন হয়। যেমন জল গ্রহণ করে, সেই রকমই তার মুখের ভাষা হয়। অর্থাৎ এই দোহায় কবিরদাস বলছেন, মানুষের আচার, ব্যবহার, রুচি, সংস্কৃতির ভিত্তিতেই মানুষের মন গড়ে ওঠে।

* * *

মাঁগন মরন সমান হ্যায়, মত কোই মাঁগো ভীখ।
মাঁগন তে মরনা ভলা, ইরহ সতগুরুকী সীখ॥

এই দোহায় কবিরদাস বলছেন, ভিক্ষে করা এবং মরা (মাঁগন মরন) এই দুটিই সমান। তিনি বলছেন, ভিক্ষে করো না। ভিক্ষে করার থেকে মৃত্যু ভালো। সতগুরুর এটাই শিক্ষা। এই শিক্ষা মেনে চলা উচিত !

* * *

কহ কবীর ভ্রমনাশী।
রাম মিলৈ অবিনাশী॥

কবিরের রাম তার গুরু রামানন্দের রাম থেকে ভিন্ন। রামনন্দের রাম দশরথের পুত্র এবং বিষ্ণুর অবতার। অপর দিকে কবীরের রাম অবিনাশী। নিরাকার ব্রহ্মকেই কবির রাম বলে মনে করেন। তাঁর অনুগামীদের যাতে তাঁর রাম চিন্তা বুঝতে অসুবিধা না হয়, সে জন্য তিনি এই কথা লেখেন।

* * *

অরে ইন দুহন রাহন পাঈ।
হিন্দু অপনৌ করৈ বড়াঈ গাগর ছুবন ন দেঈ॥
বেশ্যা কে পায়ন তর সোবৈ ইয়হ দেখা হিন্দুবাঈ।
মুসলমান কে পীর উলিয়া মুর্গী মুর্গী খাঈ॥
খালা কেরী বেটী ব্যাহে ঘরহিঁ মে রহা সমাঈ।
বাহের সে ইক মুর্দা লায়ে ধোয়-ধায় চড়বাঈ॥
সব সখিয়াঁ মিলি জেবন বৈধীঁ ঘর-ভর করৈঁ বড়াঈ।
হিন্দুন কী হিন্দুবাঈ দেখী তুরকন কী তুরকাঈ॥
কহেঁ কবীর সুনো ভাই সাধো কৌন রাহ হ্বৈ জাই॥

কবিরদাস মানুষকেই শ্রেষ্ঠ বলে জানতেন। মানুষের মধ্যে কোন বিভেদ তিনি বরদাস্ত করতেন না। হিন্দুর বাহ্য আড়ম্বর, অস্পৃশ্যতা ; মুসলমানের মিথ্যা ঈশ্বর ভক্তি সবই তাঁর দ্বারা সমালোচিত হয়েছিল। কবি চণ্ডীদাসের মতো তিনিও মনে করতেন, সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই। তিনি মানুষকে শুনিয়ে বলছেন তোমরা এই যে ধর্ম ধর্ম করে নাচো, তোমাদের ধর্মের এই তো চেহারা। এখন বলো, আমি কোন্ ধর্মের পথে যাবো।

*　　*　　*

মাঠী এক ভেষ ধরি নানা সব মে ব্রহ্ম সমানা।
কহৈ কবীর ভিস্ত ছিটকাঈ দোজগ হী মনভানা॥

এই দোহাতেও কবীর ঐ ধর্মীয় ভিন্নতাকে ব্যক্ত করছেন। তিনি বলেছেন মানুষের সৃষ্টির উৎস ঐ একই। মানুষ শুধু নানা রূপ ধারণ করে থাকে। মৃত্যুর পর সব মানুষ সেই ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়। কবীর বলেন, স্বর্গে যাওয়ার স্বপ্ন কল্পনা মাত্র। তাই ধর্ম নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করো না।

*　　*　　*

অনগাড়িয়া দেবা, কৌন করৈ তেরী সেবা।
গাঢ়ে দেব কো সব কোঈ পূজৈ, নিত হী লাবৈ সেবা॥

কবিরদাস নিজে এক ধর্মীয় চেতনার অনুগামী ছিলেন। সেই চেতনায় ধর্মের কোন রূপ ছিল না। সেই রূপহীন (অনগাড়িয়া) দেবতাকে কেউ পূজো করতে বিশেষ আগ্রহী নয়। চেনা জীবন, প্রচলিত সামাজিক পথেই লোকে চলতে ভালোবাসে। সেই মতোই তারা চলে।

*　　*　　*

গুরু প্রেম কা অংক পঢ়ায় দিয়া।
অব পঢ়নে কো কছু নাহিং বাকী॥

এই অংশে কবিরদাসের গুরুভক্তি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলছেন, গুরু প্রেমের ওপরে আর কিছু নেই। যে একবার গুরু প্রেমের পাঠ নিয়েছে তার আর কিছু পড়ার প্রয়োজন নেই। তার সব লেখাপড়া সাঙ্গ হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। গুরু প্রেমের ওপরে কিছুকে স্থান দিতে তিনি রাজি নন বলেই এ কথা বলেন।

*　　*　　*

নৈনা নীঝর লাইয়া, রহট বসৈ নিস জাম।
পপিহা জিঁউ পিব পিব করৌ, কবরে মিলহুগে রাম॥

কবিরের এই দোহায় আধ্যাত্মিক প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যে রামের কতোটা অনুরাগী তা এই দোহা পাঠে জানা যায়। পিউ কাহাঁ পাখি যেমন সব সময় পিব পিব করে, তিনিও তেমনি তাঁর প্রিয়তম রামের সঙ্গে মিলিত হবার বাসনায় দিনরাত তাঁরই নাম জপ করেন।

*　　　　*　　　　*

কহেঁ কবীর হরি দরস দিখায়ো।
হমহিঁ বুলাবো কি তুম চল আয়ো॥

কবিরদাস বলছেন (কহেঁ কবীর) আমাদের ঈশ্বরের দর্শন (হরি দরস) দাও। তিনি ঈশ্বরকে আন্তরিক ভাবে ডাকতে চান। তিনি চান ঈশ্বর তাঁর ডাকেই যেন তাঁর কাছে চলে আসেন।

*　　　　*　　　　*

জৈসে জলহি তরঙ্গ তরঙ্গিনী,
এয়সে হম দিখলা বহিঁগে।
কহৈ কবীর স্বামী সুখ সাগর,
হংসহি হংস মিলাবাহিঁগে॥

কবিরদাস সেই মানুষদের অত্যন্ত সুখী বলে মনে করেন, যারা নিজের অস্তিত্ব থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে আর এক সজীব অস্তিত্বের সঙ্গে মিলিত হয়। যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ, সমুদ্রের বুকের ওপর সৃষ্টি হয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যায়। কবির বলছেন, প্রভুভক্তি-রূপী সাগর (স্বামী সুখ সাগর)-এর সঙ্গে মিলিত হয়েও আমরা ঐ একই ভাবে অতি আনন্দিত হয়ে উঠব।

*　　　　*　　　　*

হমারে রাম রহীম করীম
কেসো অলহ রাম সতি সোঈ।
বিসমিল মোটি বিসম্ভর একৈ,
ঔরন দুজা কোঈ॥

এই কবিতা থেকে কবিরের ওপর ইসলাম ও সুফী মতের প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। হিন্দু মুসলমানের বিবাদ মেটাবার জন্য তিনি ভারতীয় ব্রহ্মবাদের ভিত্তিতে রাম রহিম, বিসমিল বিশ্বম্ভরকে এক বলেই দেখিয়েছেন। তাঁর মতে এঁরা এক ব্রহ্মেরই দুই রূপ। আর কেউ নয়।

*　　　　*　　　　*

কবীর বাদল প্রেমকা, হম পর বরতা আই।
অন্তর ভোগী আত্মা, হরী ভঈ বনরাই ॥

কবিরের ওপর প্রেমবাদের দারুণ প্রভাব পড়েছিল। এই দোহা সেই প্রভাবেরই ফল। তিনি বলছেন, প্রেমের বাদল ধারা (বাদল প্রেমকা) আমাদের ওপর বর্ষিত হলে ভোগী মানুষের (ভোগী আত্মা) অন্তরস্থলে (অন্তর) বনরাজির (বনরাই) মতো হরি বিরাজ করতে থাকেন।

*　　　*　　　*

কবী তেজ আনন্দ কা মানো ঊগী সুরজ সেনি।
পতি সঙ্গ জাগী সুন্দরী কৌতুক দীখা তেনি ॥

সুফীদের সৃষ্টি সংক্রান্ত বিচারধারা কবীরকে প্রভাবিত করেছিল। অবশ্য সুফীদের মোক্ষ সংক্রান্ত বিচারধারার সঙ্গে তাঁর মতের ভিন্নতা ছিল। সুফীরা নৈতিক আচরণের শুদ্ধতার ওপর বেশি জোর দিতেন। হৃদয় এবং শরীরের শুদ্ধতার ওপর ঐ মতে জোর দেওয়া হয়েছে। এই দোহায় সেই মতেরই প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। অনেকে আবার এটিকে বৈষ্ণব ভাবনার প্রভাব বলে মনে করেন। বৈষ্ণব চিন্তাতেও এই দুটিকে আবশ্যক বলে ধরা হয়েছে।

*　　　*　　　*

হরি মেরা পীব মাই, হরি মেরা পীব
হরি বিন রহি ন সকৈ মেরা জীব।
হরি মেরা পীব ম্যায় হরি কী বহুরিয়া
রাম বড়ে ম্যায় ছটুক লহুরিয়া ॥

কবিরের সুফী প্রভাবিত সাহিত্যে বিরহ ও দাম্পত্য প্রেমের প্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে। সুফীদের মতানুসারে প্রেমের চরম পরিণতি দাম্পত্য প্রেমে। সেখানে সাধক ও পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরের সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর মতো। সুফীদের এই পদ্ধতিকে অনুসরণ করে কবিরও রামের সঙ্গে, হরির সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। নিজেকে হরির স্ত্রী (বহুরিয়া) রূপে প্রকাশ করেছেন।

*　　　*　　　*

অল্লা রাম কী গম নহীঁ।
তহাঁ কবীর রহা ল্যৌ লায় ॥

কবিরের সমকালে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ঘটত মূলত রাম ও রহিমের নামকে কেন্দ্র করে। তাই তিনি নাম রহিত নিরাকার ব্রহ্মকেই উপাস্য মানতেন।

*　　　*　　　*

কবীর জাগ্যা হী চাহিয়ে।
কেয়া গৃহ্‌ কেয়া বৈরাগ ॥

কবির বৈরাগী ছিলেন। কিন্তু বৈরাগী হলেও সংসারত্যাগী মানুষ ছিলেন না। নিজ পরিশ্রমে অর্জিত অর্থ দ্বারা জীবন নির্বাহ করতেন। আবার সংসারের মধ্যেও তিনি পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েন নি। তিনি মনে করতেন, সংসারেই থাকো আর বৈরাগীই হও, জ্ঞান থেকে নিজেকে বঞ্চিত করো না।

* * *

পাইন পূজৈঁ হরি মিলেঁ তো ম্যায় পূজুঁ পহার।

কবির মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। তিনি খোলাখুলি মূর্তিপূজার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলছেন পাথর (পাহন) পুজো করলে যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহলে আমি পাহাড় পুজো করব। পাথর খণ্ডের থেকে পাহাড় অনেক বড়— এই পাহাড় পুজো করে অনেক বেশি পুণ্য লাভ হবে এবং অনেক তাড়াতাড়ি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। এভাবেই তিনি মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন।

* * *

জাকে মুঁহ মাথা নহীঁ, নাহীঁ রূপ অরূপ।
পুহুপ বাস তেঁ পাতরা, অ্যায়সা তব অনূপ ॥

এই দোহাঁর মাধ্যমেই কবির ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। হিন্দু ধর্মের আচার বিচারের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু একেশ্বরবাদী হওয়ায় ব্রহ্মের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ প্রেম। তিনি বলছেন, তাঁর ব্রহ্মের কোন রূপ নেই, দেহ নেই। ফুলের (পুহুপ) মধ্যে যেভাবে সুগন্ধ অবস্থান করে, সেভাবেই সর্বত্র ব্রহ্মের অবস্থান।

* * *

হম সব মাঁহি সকল হম মাঁহী,
হম থেঁ তর দূসরা নাহীঁ।
তীন লোক মে হমারা পসারা,
আবাগমন সব খেল হমারা।
ঘট দরশন কাহিয়ত ভেখা।
হমহী অতীত রূস নহী রেখা।

হম হী আপ কবীর কহাবা,
হম হী অপনা আপ লখাবা।

কবিরদাস বলছেন, আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মিলন ঘটে গেলে এমনই ঘটে। নিজের মধ্যে সকলকে এবং সবার মধ্যে নিজেকে (হম সব মাঁহি সকল হম মাঁহী) সে দেখতে পায়। তাকে ঈশ্বরের নেশা পেয়ে বসে। সাধারণ গৃহস্থ মানুষ ওর এই ঈশ্বর প্রেম উপলব্ধি করতে না পেরে ওকে পাগল ভেবে বসে। ওকে মত্ত করে তোলা এই শক্তির স্বাদ সাধারণ মানুষ জানে না।

গুরু চরণ লাগি হম বিনবতা, পূছত কহু জীউ পাইয়া।
কবন কাজি জগ উপজৈ, বিনসৈ কছু মোহি সমঝাইয়া॥

এই দোহার কবিরদাস তাঁর গুরুর কাছে সংসারের উৎপত্তি ও রহস্য বুঝিয়ে বলার আবেদন করেছেন। গুরুর চরণ ধরে অতি বিনয়ের (বিনবতা) সঙ্গে তিনি জানতে চাইছেন হে প্রভু আমকে বলে দাও, এ জীবন (জীউ) আমি কিভাবে পেলাম। এই জীবন রহস্য আমাকে বুঝিয়ে (সমঝাইয়া) দাও। তুমি ছাড়া আর কে আমাকে বুঝিয়ে দেবে বলো।

*　　　　*　　　　*

বূড়া বংস কবীর কা, উপজিয়ো পূত কমাল।
হরি কা সুমরিন ছাঁড়ি কে, ভরি লৈ আয়া মাল॥

প্রাচীনকালে কবিরা তাঁদের কবিতায় নিজেদের জন্ম বৃত্তান্ত, বংশ পরিচয় ইত্যাদি লিখে দিতেন। সন্ত কবির তাঁর এই দোহার নিজের পরিবারের কিছুটা পরিচয় দিয়েছেন। কবিরের জীবনীকাররা বলেন, তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল লোঈ। কমাল এবং নিহাল নামে দুটি ছেলে এবং কমালী ও নিহালী নামে দুটি মেয়ে ছিল। অবশ্য এই দোহার মাধ্যমে কবির জানাচ্ছেন, তাঁর বংশ খুবই খারাপ (বূড়া বংস) এবং কমাল নামে তাঁর একটি ছেলে হয়। এবং এই ছেলে ঈশ্বর ভজনা ছেড়ে (হরি কা সুমরিন) কেবল অর্থ উপার্জনেই (মাল) মত্ত ছিল।

*　　　　*　　　　*

সাখী আঁখী জ্ঞান কী, সমুঝি দেখু মন মাঁহি।
বিন সাখী সংসার কা, ঝগরা ছূটত নাঁহি॥

সাখী শব্দের অর্থ মহাপুরুষদের আপ্তবাক্য। তিনি বলছেন, আমরা যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে পাক খেতে খেতে জ্ঞানের আলোর অপেক্ষা করি তখন সাখী

আমাদের পথ দেখায়। মহাপুরুষগণ আমাদের আপ্তবাক্য (সাখী) না শোনালে আমাদের মনের মুক্তি ঘটে না।

কাঁকর পাথর জোরি কে, মসজিদ লঈ চিনায়।
তা চঢ়ি মুল্লা বাঁগ দে, বহরা হুয়া খুদায়॥

কবিরদাস তাঁর দোহায় হিন্দু ধর্মের বহুবিধ আড়ম্বর, মিথ্যাচারের সমালোচনা করেছেন। একই রকম ভাবে মুসলিম ধর্মের নানান মিথ্যা আড়ম্বরের বিরুদ্ধেও তাঁর কলম সতর্ক হয়ে উঠেছিল। মুসলমানরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে আজান দেয়। এই অভ্যাসের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, আল্লা কি কালা (বহরা) হয়ে গেছেন যে, তাঁকে শোনাবার জন্য মসজিদে এতো জোরে আজান দিতে হবে!

* * *

নহী কো উঁচা নহীঁ কো নীচা,
জাকা প্যণ্ড তাহী কা সীঁচা।
জে তূ বামন বম্নী জায়া,
তৈ আন বাট হৈব কাহে ন আয়া।
কহে কবীর অধির নহিঁ কোঈ,
সো আধিম জা মুখ রাম ন হোঈ।

এই কবিতায় কবির জাতপাতের দ্বন্দ্বে দীন হিন্দু সমাজের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষের মধ্যে উঁচু নিচু বলে কিছু নেই। উঁচু নিচু জাতের বিচার এসব মানুষের সৃষ্টি। মানুষের সমাজে একমাত্র সেই অধম, যে মুখে রাম নাম করে না।

* * *

দেখ্যা হ্যায় তো কস কহুঁ, কহুঁ তৌ কো পতিয়ায়।
গূঁগে কেরী সরকার, খায়ে ওঁ বৈঠা মুসকায়॥

রহস্যবাদী হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হলো আস্তিক হওয়া। কবির রহস্যবাদী এবং পরিপূর্ণ আস্তিক ছিলেন। তিনি নাস্তিকদের শূন্যকেও ব্রহ্ম রূপে দেখতেন। তাঁর আস্তিক্য চিরাচরিত বিশ্বাসের ওপর নির্ভর না করে প্রত্যক্ষ অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই তিনি এই দোহায় বলতে পারলেন, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি, কিন্তু দেখতে পেলেও কি করে তাঁর রূপের বর্ণনা দেব (কস কহুঁ)। বোবা মানুষ (গূঁগে) মিষ্টি

সরকরা খেলেও যেমন সেই স্বাদ জানতে পারে না, তেমনি কবিরদাসও ঈশ্বরের দর্শন পেলেও তাঁর রূপের বিবরণ দিতে অক্ষম।

* * *

মেরা মুঝ মে কছু নহ্ী, জো কছু হ্যায় সো তেরা।
তেরা তুঝকো সৌঁপতা, কেয়া লাগে হ্যায় মেরা।।

কবিরদাস মনে করতেন, ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন পথে সব থেকে বড় বাধা হলো মায়া। এই মায়ার জন্যই ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন হয়ে ওঠে না। এই মায়ার বাধা ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্য সাধককে উপদেশ দিয়ে তিনি এই দোহা রচনা করেন। তিনি বলেন, আমার নিজের বলতে কিছু নেই (মেরা মুঝমে কছু নহ্ী)। আমার যা কিছু সবই তাঁর (তেরা)। তাই তাঁর জিনিস তাঁকে ফিরিয়ে দিতে আমার অসুবিধা কোথায়।

* * *

রাম বিন তন কী তাপ ন জাঈ
জল কী অগিন উঠী অধিকাঈ।
তুমু জলনিধি ম্যায় জল কর মীনা
জল মে রহো জলহিঁ বিন ছীনা।
তুমু পিঞ্জরা ম্যায় সুবনা তোরা,
দরসন দেহু ভাগ বড় মোরা।
তুমু সতগুর ম্যায় নৌতম চেলা,
কহৈ কবীর রাম রমুঁ অকেলা।

কবিরের এই রহস্যবাদী পদে তাঁর রামভক্তিই প্রকাশ পেয়েছে। নানাভাবে রামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, নৈকট্য তিনি এই পদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন, রামের সঙ্গলাভের সুযোগ না ঘটলে দেহের তাপ মেটে না। তাঁর কাছে রাম জলের (জলনিধি) মতো এবং তিনি নিজে সেই জলের মাছ। রাম যদি হন পাখির খাঁচা, তাহলে তিনি সেই খাঁচার পাখি। রাম তাঁর গুরু এবং তিনি রামের চেলা। একলা নির্জনে বসে রামের ভজনা করতে তাঁর মন বড়ই আতুর।

* * *

বন্দ করি দৃষ্টি কো ফেরি অন্দর করৈ,
ঘট কা পাট গুরুদেব খোলৈ।
কহত কবীর তূ দেখ সংসারে মে,
গুরুদেব সমান কোঈ নাঁহি তোলৈ।।

কবিরদাসের মতো গুরুর বন্দনা আর কোন ভক্ত কবি মনে হয় করেন নি। তিনি প্রাণ খুলে গুরুর বন্দনা করে গেছেন। তিনি বলছেন, একবার দু চোখ বন্ধ করে নিজের ভেতর দিকে তাকিয়ে দেখলে, দেখতে পাবে মনের দরজা (ঘট কা পাট) খুলে ঈশ্বরই তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি বলছেন, একবার সংসারের দিকে তাকিয়ে দেখ, সংসারে গুরুদেবের সমান কারুকে পাবে না। তিনি নিজে গুরুর কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছিলেন বলেই, গুরুর প্রতি তাঁর এতো ভক্তি।

আসন কিয়ে পবন দিঢ়ে দিঢ় রহু রে, মন কা মৈল ছাড়ি দে বৌরে।
কেয়া সীংগী মুদ্রা চমকায়ে, কেয়া বিভূতি সব অঙ্গ লগায়ে।
সো হিন্দু সো মুসলমান, জিসকা দুর রহৈ ঈমান॥
সো ব্রহ্মা জো কথৈ ব্রহ্ম গিয়াঁন, কাজি সো জানে রহমাঁন॥
কহৈ কবীর কছু আন কীজৈ, রাম নাঁম জপি লাহা লীজৈ॥

আমরা জানি কবিরদাস ধর্মীয় আড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন, ধর্মীয় রীতিনীতি গোঁড়ামির তিনি যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। এই সমালোচনা বা বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি হিন্দু ধর্ম বা মুসলমান ধর্ম কোন ধর্মকেই বাদ দেননি। আবার প্রকৃত ধর্ম কেমন হওয়া উচিত সে কথাও তিনি লিখেছেন। তিনি বলছেন, যে মানুষ সৎ সেই প্রকৃত সাধক। তা তার ধর্ম হিন্দু বা মুসলমান যাই হোক না কেন। এই কবিতা অংশে তাঁর সেই ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে।

*　　　*　　　*

দিন কো রোজা রখত হ্যায়, রাত হনত হ্যায় গায়।
ইয়হে তো খুন হে বন্দগী, কৈসে খুসী খুদায়॥

মুসলমান ধর্মাবলম্বীদেরও নানা ত্রুটি বিচ্যুতিকে সমালোচনা করতে তিনি ছাড়েননি। তিনি বলছেন, মুসলমানরা সারাদিন উপোস থেকে রোজা পালন করে রাতে পেট ভরে খায়। এমন আচরণ করলে কি তাতে আল্লা খুশি হন।

*　　　*　　　*

কবীর কাজী স্বাদি বসি, ব্রহ্ম হতৈ তব হোই।
চঢ়ি মসীত এক কহৈ, দরি কিউঁ সাঁচা হোই।

পুরোহিতদের মতো তিনি কাজীদেরও সমালোচনা করতে ছাড়েননি। তিনি মনে করতেন কাজীদের আচরণ মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ। তারা একদিকে ব্রহ্মের উপাসনা করবে আবার জিভের স্বাদের জন্য সেই ব্রহ্মকেই হত্যা করবে।

*　　　*　　　*

মূড় মূড়ায়ে হরি মিলৈ, সব কোউ লেই মূড়াই।
বার-বার কে মূড়নে, ভেড় ন বৈকুণ্ঠ জাই॥

অনেকে মাথা নেড়া করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। এই ধর্মীয় আচারকে তিনি বাহ্য আড়ম্বর বলে মনে করতেন। এবং এই আড়ম্বরের সমালোচনা করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। তিনি বলছেন, অনেকে মনে করে মাথা নেড়া করলে বুঝি ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়। সেই আশাতে তারা মাথা মুড়োয়। তিনি বলছেন, তাই যদি হতো তাহলে বারবার মাথা মুড়িয়েও ভেড়া বৈকুণ্ঠে যেতে পারে না কেন? সুতরাং তাঁর কথা হলো, মাথা নেড়া করলেই ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায় না।

* * *

তীরথ বরত সব বেলহী, সব জগ মেল্যা ছাই।
কবীর মূল নিকন্দিয়া, কৌন হলাহল খাই॥
মন মথুরা দিল দ্বারিকা, কায়া কাসী জান।
দসবাঁ দ্বারা দেহুরা তামৈঁ জোতি পিছান॥

তীর্থ ব্রত এইসব আচার-অনুষ্ঠানেরও তিনি বিরোধী ছিলেন এবং এগুলিরও সমালোচনা করেছেন। তিনি বলছেন, তীর্থ, ব্রত এসব সবাই পালন করে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় না। তাঁর মতে মানুষের মনই দ্বারকা, মথুরা। তাই পুণ্যের জন্য মানুষকে কোথাও যাবার দরকার নেই।

* * *

হমারে কৈসে লোহূ, তুমহারে কৈসে দূধ।
তুমহ কৈসে ব্রাহ্মণ পাঁড়ে, হম কৈসে সূদ॥

কবিরদাস জাত পাত বিরোধের উর্ধ্বে ছিলেন। বর্ণের কারণে মানুষের মধ্যে বিভাজন তিনি মেনে নিতে পারেননি। ব্রাহ্মণ বলে যারা নিজেদের শূদ্রদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে তাদের কাছে তাঁর প্রশ্ন, আমাদের রক্ত আর তোমাদের রক্ত কেমন? তোমাদের রক্তের রং কি অন্য কিছু? তোমাদের মায়েদের বুকের দুধ কি আমাদের মায়েদের বুকের দুধ থেকে আলাদা? তোমাদের রক্তের এবং দুধের রং যদি আমাদের রক্ত ও দুধের রং থেকে আলাদা না হয়, তাহলে তুমি কিসের ব্রাহ্মণ আর আমি কিসের শূদ্র?

* * *

বৈসনো ভয়া তো কেয়া ভয়া, বুঝা নঁহী বিবেক।
ছাপা তিলক বনাই করি দগধ্যা লোক অনেক॥

বৈষ্ণবরাও কবিরের সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে তিনি যে মিথ্যা আড়ম্বর, লোক দেখানো ভক্তিভাব দেখেছিলেন, তার সমালোচনা করতে দেরি করেন নি। এই দোহায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলছেন, বৈষ্ণব (বৈসনো) হলেই কি মানুষটা ভালো হয়ে গেল! এমন অনেক বৈষ্ণবকেও দেখতে পাওয়া যায়, বিবেক বলে কিছু নেই। কপালে তিলক কেটে (ছাপা তিলক) তারা বহু মানুষের ক্ষতি করতে পিছপা হয় না।

* * *

ইয়হ সব ঝুধী বন্দগী বিরথা পঞ্চ নমাজ।
সাঁচে মারে ঝুঁঠি পঢ়ি, কাজী করৈ অকাজ॥

অসৎ পুরোহিত, গোঁসাই থেকে যেমন তিনি সমাজের সাধারণ মানুষদের সতর্ক করে দিয়েছেন, তেমনি কাজী ও মোল্লাদের থেকেও মানুষকে সতর্ক করতে ভোলেননি। তিনি বলছেন, ঐ পাঁচবার নামাজ পড়া, কুর্নিশ করা বৃথা। মিথ্যে মিথ্যে সাধারণ মানুষকে দিয়ে এসব করিয়ে কাজী ও মোল্লারা সুখ ভোগ করে। সুতরাং তাদের কথামতো চলো না।

* * *

সন্তো ধোখা কাঁসো কহিয়ে
গুণ মে নির্গুণ, নির্গুণ মে গুণ
বাট ছাঁড়ি কিউঁ কহিয়ে॥

ভক্তি যুগের কবিদের মধ্যে দুটি ধারা বিদ্যমান ছিল—একটি সগুণ সম্প্রদায়, অপরটি নির্গুণ সম্প্রদায়। এই দুই মতাবলম্বীদের মধ্যে মতান্তর জনিত বিরোধও দেখা দিত মাঝে মাঝে। কবিরদাস মনে করতেন, আসলে এই সগুণ, নির্গুণ বিরোধ কিছুই নয়। দুটিই মূলত এক। সেই চিন্তাধারা থেকে তিনি এই কথা লেখেন।

* * *

ভাব ভগতি বিসবাস বিনু, কটৈ ন সংসৈ মূল।
কহৈ কবীর হরি ভগতি বিনু, মুক্তি নংহী রে মূল॥

কবিরদাস ভক্তিকেই ঈশ্বর প্রাপ্তির মূল পথ বলে মনে করতেন। তাই তিনি বলছেন, মানুষের মনে যদি ভক্তি (ভগতি) না থাকে তাহলে মনের মলিনতা কাটে না তিনি বলছেন, হরির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ভিন্ন মুক্তি নেই।

* * *

কেয়া জপ কেয়া তপ কেয়া সংযম কেয়া ব্রত কেয়া অস্নান ।
জব লাগি জুক্তি ন জানিয়ে, ভাব ভক্তি ভগবান ॥

তিনি যেমন ঈশ্বর ভক্তির কথা বলছেন, তেমনি আবার নানা আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-মার্গে মিলিত হবার জন্য জপ তপ, সংযম, ব্রত পালনের প্রয়োজন নেই। মানুষকে ঈশ্বরের কাছে পেঁছবার জন্য কারুর সাহায্য, কোন আচার অনুষ্ঠানের সাহায্য নিতে তিনি রাজি নন।

* * *

কবীর সুতা কেয়া করৈ, গুণ গোবিন্দ কে গাই ।
তেরে সিরপর জম খড়া, খরচ কদৈ কা খয়ি ॥

এই দোহায় কবির সাংসারিক মোহ-মায়ায় আবদ্ধ মানুষদের সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, সুতা কেটে কি হবে, তার চেয়ে গুরুর গান গাও। গুরুর গান গাইলে জীবনে অনেক আনন্দ পাবে।

* * *

কবীর নৌবতী আপনি, দিন দস লেহু বজাই ।
এ পুর পাটন এ গলী, বহুরি ন দেখৈ আই ॥

লৌকিক আচরণ হিতকারী মনে করে কবিরদাস এই দোহায় লৌকিক আচরণের উপকারিতার কথায় বলছেন। তিনি বলছেন, রাম নামের উপাসনা ভিন্ন লৌকিক জীবনে শান্তি নেই।

* * *

ইয়হু এয়সা সংসার হ্যায়, জৈসা সেঁবল ফুল ।
দিন দস কে ব্যোহার কৌ, ঝুঠে রংগ ন ভূল ॥

কবিরদাস এই দোহায় আবার সেই সংসারের অসারতার কথাই বলছেন। তিনি বলছেন, এই সংসার শিমুল (সেঁবল) ফুলের মতো। শিমুল ফুলের যেমন রূপ আছে, সংসারেরও তেমনি রূপ আছে, আকর্ষণ, চটক আছে। কিন্তু মধুহীন শিমুল ফুলের মতো সংসারের মধ্যেও কোন রস নেই। সুতরাং সংসারের মোহের মধ্যে পড়ো না।

* * *

বাসরি সুখ না রৈনি সুখ, না সুখ সুপিনে মাঁহি।
কবীর বিছুটয়া রাম সুং, না সুখ ধুপ ন ছাঁহি ॥

এই দোহায় রামের প্রতি কবিরের প্রেম বিরহ প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির শব্দ শুনে রাধা যেমন উতলা হয়ে উঠতেন, তেমনি রাম বিহীন কবিরের জীবন অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছে। তিনি বলছেন, রামের অভাবে তাঁর মোটেই শান্তি নেই।

* * *

মাঁহি উদাসী মাখো চাহৈ, চিতবন রেনি বিহাই।
সেজ হমারী স্যংঘ ভঈ হ্যায়, জব সোউং তব ঘাই ॥

সাধকের যখন উদ্বেগের অবস্থা হয়, তখন তার কিছুই ভালো লাগে না। এই দোহায় সেই কথায় বলা হয়েছে, তিনি বলেন, উদ্বেগের অবস্থায় আনন্দের বিষয়ও তাঁর কাছে উদ্বেগের বস্তু হয়ে ওঠে।

* * *

জিস মরনৈং থৈং জ্যা ডরৈ, সো মেরে আনন্দ।
কব মরি হুঁ কব দেখি হুঁ, পুরণ পরমানন্দ ॥

প্রিয় প্রেম বিরহে মানুষের মরণের অবস্থা হয়ে যায়। কিন্তু মরণের অবস্থা হলেও সে তো মরতে পারে না। কারণ এই অবস্থায় মৃত্যু তো অবধারিত নয়। বিরহ বেদনায় আকুল হয়েও কেবল মৃত্যু কামনা করে। এই দোহায় কবিরের নিজের সেরকম মনোদশাই প্রকাশ লাভ করেছে।

* * *

পায়া পকড়তা প্রেম কা, সারী কিয়া সরীর।
সতগুরু দাও বতাইয়া, খেলৈ দাস কবীর ॥

কবিরের গুরু কবিরকে প্রেম-ভক্ত হবার আদেশ দিয়েছিলেন। সেই আদেশের সমর্থনে তিনি যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন কবীর তাই এই দোহার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

* * *

ভগতী নারদী মগন সরীরা,
ইনি বিধি তব তিরি কহৈ কবীরা।

কবিরদাস তাঁর রচনার অনেক স্থানে নারদীয় ভক্তির উল্লেখ করেছেন এটি তার অন্যতম। নারদীয় ভক্তিতে ভাব সাধনার দ্বারাই ভাব ভক্তির সাধন করা হয়েছে। প্রেম এবং আসক্তি দুটিই এক, নিরাকার।

* * *

আঁষড়িয়া ঝাঁঈ পড়ী, পনথ নিহারি নিহারি।
জীভড়িয়াঁ ছাল্যা পডয়া রাম পুকারি-পুকারি ॥

কবিরদাস তাঁর এই দোহায় অত্যন্ত বিরহ প্রকাশ করেছেন। তিনি **বলছেন, প্রভু** শ্রীরামের বিরহে তিনি ব্যাকুল। প্রভুর পথ চেয়ে চেয়ে তাঁর চোখে ছানি পড়ে গেল এবং রামের নাম উচ্চারণ করে করে তাঁর জিভ ছড়ে গেল। তবু তিনি রাম নাম ছাড়তে আগ্রহী নন। কারণ, তিনি যে রামের প্রেমে ব্যাকুল।

* * *

বে দিন কব আবৈংগে মাই।
জা কারণ হম দেহ ধরী হ্যায়, মিলিবৌ অঙ্গ লগাই ॥
হেঁা জানুঁ বে হিল মিল খেলুঁ, তন মন প্রাণ সমাই।
য়া কামনা করৌ পরি পূরণ, সমরথ হো রাম রাই।
মাঁহি উদাসী মাধব চাহেঁ, চিতবত রৈন বিহাই।
সেজ হমারী সংঘ ভই হ্যায়, জব সেঁ উ তব ঘাই ॥
বহু অরদাস দাস কী সুনিয়ে, তন কী তপন বুঝাই।
কহৈ কবীর মিলৈ জৈ সাঈ, মিলি করি মঙ্গল গাই ॥

কবিরদাস তাঁর এই পদে প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের বাসনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রিয় শ্রীরাম। তিনি প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হতে অতি আগ্রহী। তাঁর ব্যাকুলতা এই কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। বিরহ বেদনায় আতুর, অত্যন্ত ব্যাকুল এই কবি জানতে চাইছেন সেদিন কবে আসবে, যেদিন তিনি তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পাবেন।

মায়া তজুঁ তজী নহিঁ জাই।
ফির ফির মায়া মোয় লিপটাই।
মায়া আদর মায়া মান, মায়া নহী তহাঁ ব্রহ্ম গিয়ান।
মায়া রস মায়া কর জান, মায়া কারনি তজৈ পরান ॥
মায়া জপ-তপ মায়া জোগ, মায়া বাঁধী সব হী লোগ।
মায়া জল-থল, মায়া অকাস, মায়া ব্যপী রহী চহুঁ পাস ॥
মায়া মাতা মায়া পিতা অস্তরী সুতা।
মায়া মারি করৈ ব্যোহার, কহে কবীরা মেরে রাম আধার ॥

এই পদের মাধ্যমে কবিরদাস বোঝাতে চাইছেন যে, মায়া খুবই খারাপ। মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়লে মুক্তি নেই। তিনি বলছেন, মায়াকে ত্যাগ করলেও মায়া তোমাকে ত্যাগ করবে না। মায়া ঠিক ফিরে ফিরে এসে তোমাকে জড়িয়ে ধরবে। এই মায়ার রূপ বহু এবং এর বিস্তার সর্বত্র। বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র এরা সবাই মায়ার এক একটা রূপ। তাই তিনি বলছেন, এসব ত্যাগ করে রাম নাম ভজনা করো।

* * *

মায়া মঠা ঠাগিনি হম জানী।
তিরগুণ ফাঁস লিয়ে কর ডোলৈ বোলৈ মধুরী বাণী॥

কবিরদাস বলছেন মায়া দুরাচারী নারীর মতো। সমাজে মোহিনী নারী যেমন পুরুষকে মোহপাশে আবদ্ধ করে তাকে পথভ্রষ্ট করে, তেমনি ভাবে পথ ভ্রষ্ট করে মায়া, সুতরাং মায়ার বাঁধনে যাতে না পড়তে হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

কবীর মায়া পাপিনী, ফন্দ লৈ বৈধী হাটি।
সব জগ তো ফংদে পড়য়া, গয়া কবীরা কাটি।

এই অংশেও কবিরদাস সেই মায়ার কথা বলছেন। তিনি বলছেন, মায়া অতি পাপিনী। এই মায়া মানুষকে ধরবে বলে ফাঁদ পেতে বসে আছে। সব মানুষ এই মায়ার ফাঁদে পড়ে মারা যায়। সর্বস্বান্ত হয়। তবে কবিরকে মায়ার ফাঁদে জড়িয়ে তার ক্ষতি করা সম্ভব নয়। কারণ তিনি তো মায়ার ফাঁদ কেটে বেরিয়ে তাঁর প্রিয় রামের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

* * *

মীঠি মীঠি মায়া, তজী নহিং জাঈ।
অগ্যানী পুরুষ কো, ভোলি খাঈ॥

তিনি বলছেন, এই মায়ার রূপ বড় মধুর। এই মধুর রূপের মোহে পড়লে ছেড়ে আসা সম্ভব নয়। অজ্ঞ (অগ্যানী) মানুষকে ছলে বলে ভুলিয়ে মায়া শেষ করে ছাড়ে। তাই কবিরদাস বলছেন, মায়ার সংস্পর্শে যাওয়া উচিত নয়।

* * *

আগম বেলি অকাস ফল, অন ব্যবর কা দুধ।
সসা সীঁঙ্গ কী ধনু হড়ী রমৈ বাঝ কা পুত॥

এই অংশে কবিরদাস বলতে চেয়েছেন যে মায়ার রূপ বিচিত্র। এই মায়া সৎ এবং

অসৎ। তার এই দুই রূপ মানুষকে ধর্ম এবং অধর্ম এই দুইয়ের মধ্যে লীন করে রাখে। মায়ার রূপ কাল্পনিক হওয়ার কারণে অনির্বচনীয়।

*　　　*　　　*

নট বহু রূপ খেলৈ সব জানৈ, কলা করৈ গুণ ঠাকুর মানৈ।
আ খেলৈ সবহী ঘট মাঁহী, দুসরা কে লেখে কছু নাহীঁ।
জাকে গুণ সোঈ পৈ জানৈ, ঔর কো জানে পার অয়ানে॥

তিনি বলছেন, মায়াকে ঘিরে যা কিছু সবই মিথ্যা। অভিনেতার অভিনয়-রহস্যের কিছুই যেমন জানা যায় না, তেমনি মায়ার সব কিছুই রহস্যময়, অনির্বচনীয়। মায়ার রহস্য কেবল ব্রহ্মই জানেন। আর কেউ নয়।

*　　　*　　　*

মায়া দুই ভাঁতি, দেখী ঠোক বজায়।
এক গহাবৈ রাম পৈ, এক নরক লৈ জায়॥

কবিরদাস মায়াকে দুই রূপে দেখেছেন। তাঁর মতে, মায়ার একটি রূপ আত্মাকে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত করে, আর একটি রূপ মানুষকে ব্রহ্মের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

*　　　*　　　*

কবীর মায়া পাপিনী, হরি সূঁ করৈ হরাম।
মুখ কড়িয়ালী কুমতি কী, কহন ন দেঈ রাম॥

কবিরদাস বলছেন মায়া পাপিনী। সে মানুষের জিভকে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ দিতে রাজি নয়। কারণ ব্রহ্মের সঙ্গে জিভের মিলন ঘটে গেলে কেউ মায়ার নাম করবে না। তাই সে সব সময় জিভ ও ব্রহ্মের মিলনে বাধা সৃষ্টি করে।

*　　　*　　　*

অবধূ নিরঞ্জন জাল পসারা।
স্বর্গ পতাল জীব মৃত মণ্ডল, তীন লোক বিস্তারা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু সিব প্রকট কিয়ো হ্যায়, তায় দিয়ো সির ভারা॥
ঠাঁও ঠাঁও তীরথ বৃত থাপ্যো, ঠগনে কো সংসারা।
মায়া মোহ কঠিন বিস্তারা, আপু ভয়ো করতারা॥

সতগুরু সবদ কো চীহ্নত নাহী, কৈসো হোয় উবারা।
জারি ভূঁজি কোইলা করি ডারে, ফিরি ফিরি লৈ অবতারা।
অমর লোক জহাঁ পুরুষ বিরাজৈ, তিনকা মুদা দ্বারা।
জিন সাহব সে ভয়ে নিরঞ্জন সো তো পুরুষ হ্যায় ন্যারা॥
কঠিন কাল তে বাঁচা চাহো গহো সবদ টকসারা॥
কহৈ কবীর অমর কর রাখো, মানো সরদ হমারা॥

এই পদে কবিরদাস নিরঞ্জনকে স্পষ্টরূপে মায়া বলে বর্ণনা করেননি। তবে এটিকে মায়ার সমান বলে উল্লেখ করেছেন। মায়ার মতো নিরঞ্জনও পুরো পৃথিবীকে ভ্রমের মধ্যে রেখে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার চেষ্টা করে। তাই তাঁর মত হলো, এটিকে মায়া বলে মনে করা উচিত।

* * *

জো তুম দেখো সো ইয়হু নাহী, ইয়হ পদ অগম অগোচর মাঁহী।
কহৈ কবীর জে অম্বর জানৈ, তাহী সুঁ, তাহী সুঁ মেরা মন মানৈ॥

কবিরদাস সৃষ্টিকে অত্যন্ত রহস্যময় বলে মনে করতেন। এবং এই সৃষ্টির মূলে কোন অদৃশ্য শক্তির ক্ষমতার আভাস তিনি দেখতে পান। তিনি বলছেন, এই যে দৃশ্যমান নামরূপী সংসার, বাস্তবে এটি কোন অদৃশ্য শক্তির দ্বারা পরিচালিত।

* * *

দুই দুই লোচন পেখা, হম হরি বিনু অউ রূন দেখা।
নৈন রহে রংগুলাঈ, অব বেগম কহনু ন জাঈ॥

কবিরদাস বলছেন, এই যে রহস্যময় পৃথিবী, আমি এই পৃথিবীকে আমার দু চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু হরি ছাড়া আর কিছুই আমি দেখতে পাইনি। আমার দুটি চোখ তাঁর প্রেমে মত্ত। এ ছাড়া আর কিছু আমার দ্বারা বলা সম্ভব নয়।

* * *

বাজীগর ডংক বজাঈ, সব খলক তাসে আঈ।
বাজীগর স্বাঁগু তকেলা, অপনে রঙ্গ রমৈ অকেলা॥

এই অংশে তিনি বলতে চাইছেন, বাজিকর ডংকা বাজিয়ে তার খেলা দেখায়। এই খেলা দেখার জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ একজোট হয়। তারপর এক সময় আবার জাদুকর মানুষের চোখের সামনে থেকে খেলা সরিয়ে নেয়। আবার নিজের রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নেয়।

ভাব ভগতি বিসবাস বিন, কটৈ ন সংসৈ সূল।

কবিরদাস মনে করতেন ভক্তি ছাড়া মায়া জনিত সংশয়ের দুঃখ দূরে হয় না। এবং ভক্তি ছাড়া কোন প্রকারে মুক্তি নেই। তাঁর এই দোহাঁয় সেই ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে।

*　　*　　*

রাম ভজৈ সো জানিয়ে, জাকৈ আতুর নাহিং।
সত সন্তোষ লিয়ে রহৈ, ধীজ মন মাঁহিং॥
জন কো কাম ক্রোধ ব্যাপৈ নহী, ত্রিষ্ণা ন জারৈ।
প্রফুল্লিত আনন্দ মে, গ্যোব্যন্দ গুন গাবৈ॥

কবিরদাস বলছেন, মায়ার বাঁধন থেকে মুক্তির সব থেকে বড় উপায় হলো ঈশ্বর ভক্তি। ভক্তির সাহায্যেই ঋষি, মুনি, দিগম্বর যোগীরা মায়ার প্রভাব মুক্ত থেকে ঈশ্বর সাধনা করে যেতে পেরেছিলেন। এই ঈশ্বর ভক্তির জন্যই কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি মায়ার সহচরদের বিনাশ ঘটে। মায়া মুক্ত হয়ে ভক্ত নিশ্চিন্তে ঈশ্বর বন্দনা করতে পারে।

*　　*　　*

কেয়া জপ কেয়া তপ সংজম, কেয়া ব্রত কেয়া অস্নান।
জব লগি জুক্তি ন জানিয়ে, ভাব-ভগতি ভগবান॥
ঝুঠা জপ তপ ঝুঠা জ্ঞান, রাম নাম বিন ঝুঠা ধ্যান।

কবিরদাস মনে করতেন, ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান অপূর্ণ। তিনি বলছেন, জপ তপ, সংযম, ব্রত, স্নান এসব অনুষ্ঠানের কোন মূল্য নেই। এগুলোর মাধ্যমে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

*　　*　　*

চলত কত টেঢ়ে টেঢ়ে।
অস্থি চর্ম বিষ্ঠা কে মূঁদে দুর গন্ধহি কে বেঢ়ে।
রাম ন জপহু কৌন ভ্রম ভূলে তুমতে কাল ন দূরে।
অনেক জতন কর ইহ তন রাখহু রহৈ অবস্থা পূরে॥
আপন কিয়া কছু ন হোবৈ কেয়া কো করৈ পরানী।
জানি ভলাবৈ সতি গুরু ভেঁটে একৌ নাম বখানী॥
বলুবা কে ঘরুআ মে বসতে ফুলবত দেহ অয়ানে।
কহু কবীর জিহ রাম ন চেত্যো বুড়ে বহুত সয়ানে॥

কবিরদাস মনে করতেন ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। ভক্তি ভিন্ন হরি দর্শন সম্ভব নয়। যারা

রাম নাম যপ করে না, তারা সোজা পথে জীবন অতিবাহিত করতে পারে না। তাদের ভালো হয় না। বহু জ্ঞানী মানুষ রামের বন্দনা না করায় বিপদে পড়ে নিজের জীবন নষ্ট করে ফেলে। তাই তিনি বলেন ভাবভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

* * *

ভলী ভঈ জু ভৈ পড়য়া, গঈ দশা সব ভূলি।
পালা গলি পাণী ভয়া, ঢুলি মিলিয়া উস কুল॥

এই দোহায় কবিরের ঈশ্বরভক্তির আত্ম নিবেদন রূপ প্রকাশ পেয়েছে। সমুদ্রের বুকে এক বিন্দু জল পড়লে যেমন, সেই জল সমুদ্রে মিশে যায়, ঈশ্বরে আত্ম নিবেদিত মানুষের অবস্থাও অনেকটা সেই রকম হয়।

* * *

অবধূ জোগী জ্যা তে ন্যারা।
মুদ্রা নিরতি সুরতি তরি সিংগী নাদন খণ্ডে ধারা॥
বসে গগন মে দুনী ন দেখৈ চেতনী চৌকী বৈধা।
চঢ়ি আকাস আসন নহী ছড়ে পীবৈ মহারস মীঠা॥
পরাট কন্হা মাঁহি, জোগী, দিল মে দরপন জোবৈ।
সহজ ইকীস ছহ সে ধাগা নিহুচল নীকৈ পীবে॥
ব্রহ্ম অগিনি মে কায়া জারৈ, ত্রিকুটী সংগম জাগে।
কহৈ কবীর সোঈ জোগেশ্বর, সহজ সুন্নি ল্যো লাগে॥

এই পদে কবিরদাস বলছেন, এই ধরনের যোগেশ্বর সম্পূর্ণ বাহ্য সাধনা ছেড়ে কেবল মনের সাধনায় যুক্ত থাকে। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা মনের চঞ্চলতাকে নষ্ট করে দেয়। সে যখন এমন করে তখন রামভক্তির যোগ্য পাত্র হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় এসে কবিরের যোগ সাধনায় ভক্তি ও যোগের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটে যায়।

* * *

হদে ছাঁড়ি বেহদি গয়া, হুবা নিরন্তর বাস।
কঁবল জো ফুল ফুল্যা বিন, কো নিরখৈ নিজ দাস॥
কবীর মন মধুকর ভয়া, রহ্যা নিরন্তর বাস।
কঁবল জু ফুল্যা জলহ বিন, কো দেখৈ নিজ দাস॥

এই অংশে কবিরদাস তাঁর প্রিয়তমার পরিচয় দিয়ে প্রিয়তমার সঙ্গে মিলনের বর্ণনা দিচ্ছেন। ঐ অতীত অসীম বস্তুকে তিনি তাঁর সীমার বাইরে গিয়ে দেখছেন। সেই

অসীম বস্তু একটা পদ্ম ফুলের মতো ফুটে উঠেছিল এবং তাঁর মন ভ্রমরের মতো ঐ ফুলের চারপাশে ঘুরছিল।

*　　　　*　　　　*

হরি জননী ম্যায় বালক তোরা।
কতহুঁ ন আগুন বকসহু মোরা॥
সুত অপরাধ করৈ দিন কেতে।
জননী কে চিত রহৈ ন তেতে॥

আমরা দেখেছি, কবিরদাস ভাবের আবেগ প্রভাবিত হয়ে 'সাহিব', 'গুলাম' ইত্যাদি প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করে তাঁর দ্বৈত ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। একই ভাবে বাৎসল্য ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে তিনি পরমাত্মাকে কোথাও পিতা এবং কোথাও মাতা মনে করে নিজেকে পুত্র রূপে পরিচয় দিয়েছেন।

*　　　　*　　　　*

রবত নেম করি কোঠড়ী বাঁধী,
বসতু অনুপ ন পাঈ।
কুঞ্জী কুলফ প্রাণ করি রাখে।
কনতে বার ন লাঈ॥
অব মন জগতু রহুরে ভাঈ।
গাফল হোইকে জনম গঁবাইয়ো॥
চোর মুসৈ ঘর জাঈ,
পঞ্চ পহরুআ দর মহি রহতে
তিনহ কা নঁহী পতিআরা।
চেতি সুচেতি চেত হোই রহু
তউ লৈ পরগাসু উজারা॥
নউ ঘর দেখি জো কামিনী ভূলী
বস্তু অনুপ ন পাঈ॥
কহৈ কবীর নবৈ ঘর মুসৈঁ
দসবেঁ তত্ত সমাঈ॥

সাধকের সাধন-অবস্থাকে কবিরদাস এই পদে ব্যবহৃত প্রতীকের সাহায্যে অত্যন্ত সরলভাবে স্পষ্ট করেছেন। এই পদে ব্যবহৃত 'কোঠরী' শরীরের, 'অনুপ বস্তু' আত্মার,

'কুঞ্জী কুলফ' প্রাণের, 'চোর' মায়ার, 'পঞ্চ পহরুআ' পঞ্চেন্দ্রিয়র, 'পরাগাম্প' জ্ঞানের, 'কামিনী' মায়াগ্রস্ত জীবের, 'নবৈ ঘর' শরীরের নয়টি দ্বারের 'দসবে' ব্রহ্মারন্ধ্রর এবং 'তত্ত' ব্রহ্মের প্রতীক।

*　　　*　　　*

এক বুঁদ, একৈ মল মূতরা, এক চরম এক গূদা
এক জ্যোতি থৈঁ সব উপজানী, কো বামন কো সূদা ॥

কবিরদাস মানুষের মধ্যে বিভেদের বিরোধী ছিলেন। কেবল জন্মগত কারণে কেউ নিম্ন বংশের-এ তত্ত্বের সত্যতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তিনি শূদ্র ও ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পাননি। তাঁর চোখে এরা দুজনেই সমান।

*　　　*　　　*

সব মদিমাতে কোউ ন জাগ।
সংগ হী চোর ঘর মুসন লাগ ॥
পণ্ডিত জন মাঁতে পঢ়ি পুরাঁন, জোগী মাতে ধিয়াঁনি।
সন্যাঁসী মাতে অহংমেব, তথা জু মাতে তপ কৈ ভেব ॥

কবিরদাস বাহ্য সাধনের বিরোধী ছিলেন। তাঁর এই বিরোধিতা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মনে করতেন, তপস্বী, সন্ন্যাসী এরা সবাই মদমত্ত, অজ্ঞানী। এরা নিজেদের নিয়েই আছে। এদের বিশেষ কোন জ্ঞান নেই। কাজেই তাঁর পরামর্শ হলো, এই সব মানুষদের খপ্পরে পড়ো না।

*　　　*　　　*

বিরহ ভুবংগম তন বসৈ, মন্ত্র ন লাগৈ কোয়।
রাম বিয়োগী না জিয়ৈ, জিয়ৈ তৌ বৌরা হোয় ॥

কবিরদাস বলছেন, বিরহ যখন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে তখন এমনই হয়। বিরহ বিষধর সাপের কামড়ের মতো। বিষধর সাপ একবার ছোবল মারলে যেমন সে বিষ কোন মন্ত্রবলে নামানো যায় না, তেমনি যে একবার রাম বিরহে পাগল হয়ে ওঠে, কোন ভাবেই তার পাগলামি দমন করা যায় না।

*　　　*　　　*

নৈনা অন্তরি আব তূঁ, জিউঁ হী নৈন ঝপেউ।
না হৌঁ দেখোঁ ঔর কুঁ, না তুঝ দেখন দেউঁ ॥

ভগবানের প্রতি আন্তরিক প্রেম থেকে কবিরদাস এই কথা বলছেন। তিনি বলছেন, তাঁর মন চায় ঈশ্বরকে তাঁর দু চোখের মধ্যে বন্ধ করে নিরন্তর তাঁকেই দেখেন। যাতে কবিরকে আর কারুকে দেখতে না হয় এবং অন্য কেউও যেন ঈশ্বরকে দেখতে না পায়।

* * *

কৈসে বহু কঞ্চন কে ভূষণ, য়ে কহি গালি তবাগিংগে।
অ্যায়সে হম লোক বেদ কে বিছুরে, সুন্নহি মাঁহি সমাহিংগে॥

কবিরদাস বেদান্তের চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বেদান্তবাদীদের একটি অতি জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত বিবর্তনবাদ দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই বিবর্তনবাদে বলা হয় যে মূল রূপে কোন প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই বাহ্য স্বরূপে পরিবর্তন ঘটান হয়। উপরোক্ত লাইন দুটি তারই প্রমাণ বহন করে।

* * *

খণ্ডিত মূল বিনাস, কহৌ কিম বিগতহ কীজৈ।
জ্যিউ জল সে প্রতিবিম্ব, তিউং সকল রামহিং জানীজৈ॥

কবির বেদান্ত মতকে অনুসরণ করেছিলেন। তার আর এক প্রমাণ হলো প্রতি-বিম্ববাদ অদ্বৈতবাদেরই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৃষ্টি ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব এবং বিম্ব সত্য নয়।

* * *

পৃথ্বী কা গুণ পানী সীখা, পানী তেজ মিলাবহিংগে।
সেজ পবন মিলি পবন সবদ মিলি, সহজ সমাধি লগাবহিংগে॥

কবিরদাস ব্রহ্মকে এই সৃষ্টির সূত্র বলে মনে করতেন। সাংখ্যরা বলতেন সৃষ্টির মূল কারণ সত্য ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি। এই প্রকৃতির বিকাশের সঙ্গেই সৃষ্টির বিকাশের স্বার্থ জড়িত। কবিরের ভাবনায় যে এই চিন্তা প্রভাব ফেলেছিল, তার প্রমাণ বহন করে এই অংশ।

* * *

কহৌ ভইয়া অম্বর কাসুং লাগা। কোঈ জানেগা জাননহার সভাগা।
অম্বর দীসৈ কেতা তারা, কৌন চতুর এয়সা চিতহন হারা॥

স্বাভাবিক মনুষ্য প্রবৃত্তি অনুযায়ী কবিরের মনেও সৃষ্টিকে দেখে তার রহস্য জানার ইচ্ছা হয়েছিল। সেই বাসনাই এই অংশে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তিনি সেই কৌতূহলই প্রকাশ করেছেন।

* • *

মায়া কী মল জগ জাল্যা, কনক কামিনী লাগি।
কহু কেঁৗ বিধি রাখিয়ে, রুঈ লপেটী আগি॥

কবিরদাস মায়ার বন্ধন-মুক্তি হবার জন্য মায়ার বিষমতা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, আগুন যেমন একবার তুলোকে জড়িয়ে ধরলে আর ছাড়তে চায় না, তেমনি মায়াও যাকে একবার জড়িয়ে ধরে তাকে সহজে ছাড়ে না। তাই তিনি মায়ার প্রভাব থেকে দূরে থাকতে বলছেন।

*   *   *

জো দরপন দেখ্যা চাহিয়ে, তৌ দরপন মাঁজত রহিয়ে।
জব দরপন লাগৈ কাঈ, তব দরসন কিয়া ন জাঈ॥

তিনি বলছেন মায়া অজ্ঞানতার আর এক রূপ। আয়নার ওপর ধুলো ময়লা পড়লে যেমন আয়নার মুখ দেখা যায় না, তেমনি আত্মার ওপর মায়ারূপী পর্দা পড়লে পরমাত্মা দর্শন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হয় না।

*   *   *

আঁওধা ঘড়া ন জল মে ডুবে, সূধা সূভর ভরিয়া।
জাকোঁ ইয়হ জগ ঘিন করি চালৈ, না প্রসাদি নিস্তরিয়া॥

মায়ার প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্ত থাকার জন্য মানুষকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলছেন, সংসার বিমুখ হয়ে থাকতে পারলেই মায়ার প্রভাব মুক্ত থাকা যায়। কলসি মুখ উলটো করে জলে ডোবালে ডোবে না। কিন্তু ঐ কলসিই আবার সোজা করে জলে ডোবালে ডুবে যায়। এইভাবে মানুষ সংসারে আসক্ত হলে মায়ার সমুদ্রে ডুবে যায়। কিন্তু সংসার বিমুখ হয়ে থাকতে পারলে মায়ার বন্ধন থেকে সে মুক্ত থাকতে পারে।

*   *   *

সেজেঁ রহু নৈন নহিঁ দেখোঁ,
ইয়হ দুখ কাসোঁ কহুঁ হো দয়াল॥
সাসু কী দুখী সসুর প্যারী, জেঠ কে তরসি ডরী রে।
ননদ সহেলী গরব গহেলী; দেবর কী বিরহ জরোঁ হো দয়াল॥
বাপ সাব কা করৈঁ লরাঈ, মায়া সদ মতিবালী।
সগৌ ভইয়া লৈ সূলি চঢ়িহুঁ, তব হ্বৈ হুঁ পীয়হি পিয়ারী॥

সোচি বিচারি দেখো মন মাহী ওসর অহৈ বনৌ রে।
কহৈ কবীর সুনহু মতি সুন্দারি, রাজা রাম রংলৌ রে ॥

কবিরদাস জানতেন মায়া পরিবর্তনশীল। মায়া সৃষ্ট হয় আবার নষ্ট হয়ে যায়। জীব এই মায়ার ভ্রমে পড়ে ভগবান থেকে বিমুখ হয়ে ওঠে। এই মায়ার ভ্রমে পড়ার জন্য মানুষকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। তিনি মনে করতেন মায়া দুঃখ দেয়। মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়া মানুষ সব সময় নিজের কথাই ভাবে। ঈশ্বর চিন্তা সে মাথাতেই আনে না। তাই কবির বলছেন, ঈশ্বরকে পেতে হলে মায়ার বাঁধন মুক্ত হতে হবে।

ইয়া মন্দির সহ কৌন বসাঈ, তা কা অন্ত কোউ ন পাঈ।
না ইহু গিরহী না ওদাসী। না ইহু রাজা না ভীখ মংগাসী ॥
না ইহু পিণ্ড ন রক্ত ন রাতী, না ইহু ব্রাহ্মণ না ইহু খাতী।
না ইহু তপা কহাবৈং সেখা, ন ইহ জীবৈ মরতা দেখা ॥
ইস মরতে কৌ জে কোঈ রোবৈ। জো রোইব সোঈ পতি ঘোবৈ।
কহৈ কবীর ইহু রাম কো অংসু, জস কাগদ পর মিটৈ ন মংসু ॥

কবিরদাস আত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্ন বলে মনে করতেন। আত্মার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি উপরোক্ত পদ লেখেন। তিনি মনে করতেন আত্মা পরমাত্মারই এক অংশ। পরমাত্মা থেকে আত্মা কখনো ভিন্ন হতে পারে না। তাঁর এই মনোভাব পরের লাইন দুটিতেও প্রকাশ পেয়েছে।

* * *

না ইহু মানস না ইহ দেউ, না ইহু জতি কহাবৈ সেউ।
না ইহু জোগী না অবধূতা, না ইহু মাঈ ন কাহু পূতা ॥

অর্থাৎ তিনি বলছেন, এই দেহের মালিক সেই পরমাত্মা ঈশ্বর। আত্মা ও পরমাত্মা দুয়েরই মালিক তিনি।

* * *

পকরি জীউ আন্যা দেহ বিনাসী, মাটী কো বিসমিল কিয়া
জ্যোতি সরূপ অনাহত লাগো, কহ হলালু কিউং কিয়া।

কবির কোথাও কোথাও আত্মাকে অমর বলে বর্ণনা করেছেন, আবার কোথাও ব্রহ্মের সমান আনন্দ স্বরূপ। ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ। তাই আত্মাও আনন্দ স্বরূপ। সেই

সঙ্গে আত্মা ব্রহ্মের ন্যায় অনাদি ও সনাতন। তাই এমন আত্মাকে খুন করা যায় না। সেজন্যই মুসলমানদের জীব হত্যার বিরোধিতা করে তিনি এই পদ লেখেন।

*　　　*　　　*

ভজি নারদাদি সুকাদি বন্দিত চরণ পংকজ ভামিনী।
ভজি ভজিংসি ভূষণ পিয়া মনোহর দো দেব সিরোবনী॥
বুধি নাভি চন্দন চরচিকা তন রিদা মন্দির ভীতরা।
রাম রাজসি নৈন বাণী সুজান সুন্দর সুন্দরা॥
বহু পাপ পরবত ছৈদনা ভৌ জাপি দুরপি নিবারণা।
কহৈ কবীর গোবিন্দ ভজি পরমানন্দ বন্দিত কারণা॥

কবির ভক্ত মানুষ। তাই তিনি তাঁর উপাস্যের মধ্যে সংসারের যাবতীয় গুণ অবলোকন করেন। তাঁর ভগবান সংবেদনশীল, করুণাময় ও তিন লোকের পীর। তাই কবির তাঁর বন্দনা করেন। এই বন্দনা সাকার ব্রহ্মের উপাসনাকারী ভক্তদের উপাসনার মধ্যে পড়ে। কবি তুলসীদাসও প্রায় এই একই শব্দাবলীর ব্যবহারযোগ্য সাকার ব্রহ্মের বন্দনা করেছেন।

*　　　*　　　*

সন্তো ধো কাঁসু কহিয়ে।
গুণ মে নিরগুণ নিরগুণ মে গুণ হ্যায়, বাট ছাঁড়ি কিউং বহিয়ে।
অজরা অমরা কথৈ সব কোঈ, অলখন কথকী জাঈ।
নাতি সরূপ বরণ নহীঁ জাকে, ঘটি ঘটি রহ্যো সমাঈ॥
প্যাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কথৈ সব কোঈ, বাকৈ আদি অরু অন্ত ন হোঈ।
প্যাণ্ড ব্রহ্মণ্ড ছোড়ি জে কথিয়ে, কহৈ কবীর হরি সোঈ॥

কবিরের ব্রহ্ম সম্পূর্ণ রূপে নিগুণ নয় আবার সগুণও নয়। এই দুই থেকেই ভিন্ন এবং অনির্বচনীয়। তিনি বলছেন, কবিরের ব্রহ্ম সর্বাতীত। তিনি বলেছেন, তাঁর এই ব্রহ্ম হিন্দুদের রাম, যোগীদের গোরখ ও মুসলমানদের খোদার থেকে ভিন্ন। তাঁর ব্রহ্ম সম্পূর্ণ পৃথক ও অনন্য।

*　　　*　　　*

জোগী গোরখ করৈ, হিন্দু রাম নাম উচ্চরৈ॥
মুসলমান কহৈ এক খুদাঈ, কবীর কা স্বামী ঘট-ঘট রহা সমাঈ॥

কবির যেমন তাঁর ব্রহ্মকে সর্বব্যাপী বলে বর্ণনা করেছেন, তেমনি আবার তাঁর

ব্রহ্মের স্বরূপকে বর্ণনা করতেও পারছেন না। তিনি বলছেন যোগীরা গোরখ করে, হিন্দুরা রাম রাম করে আর মুসলমানরা সদাই খোদার নাম ডাকে। তাঁর ব্রহ্ম সর্বব্যাপী হওয়ায় তিনি এঁদের সবার মধ্যেই অবস্থান করেন।

* * *

পূজা করূঁ ন নমাজ গুজারূঁ।
এক নিরাকার হিরদয় নমসকারূঁ॥

কবিরের ব্রহ্ম প্রধানত নিরাকার। তবুও মাঝে মাঝে তাঁর ব্রহ্ম আকার রূপে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছেন। তবে প্রধানত অব্যক্ত রূপে তাঁর ব্রহ্ম সামনে উপস্থিত হওয়ায় কবির তাঁকে মনে মনে নমস্কার করেন। তিনি স্থির করে উঠতে পারেন না যে, তাঁর দেবতা হিন্দু দেব দেবীর মতো, না কি মুসলমানদের খোদার মতো। এটা স্থির করতে পারেন না বলেই তিনি পূজা বা নামাজ কোনটাই করতে রাজি নন। তার চেয়ে তিনি এক নিরাকারকে মনে মনে বন্দনা করতে চান, নমস্কার করতে চান। মনে করেন সেটা করলেই তাঁর উচিত কাজ করা হবে।

* * *

অবধূ গগন মণ্ডল ঘর কীজৈ।
অমৃত ঝরৈ সদা সুখ উপজে, বংক নালি রস পীজৈ॥
মূল বাঁধি সর-গগন-সমানা, সুষমন যোঁ তন লাগী।
কাম-ক্রোধ দোর ভয়া পলীতা, তহাঁ জোগনী জাগী॥
মনরা জাই করীবে বৈঠা, মগন ভরা রসি লাগা।
কহৈ কবীর জিয় সংসা নাহীঁ, সবদ অনাহদ বাগা॥

সন্ত কবিরের উপর হঠযোগ সাধনার প্রভাব পড়েছিল। এই পদ তারই প্রমাণ বহন করে। তিনি বলছেন হঠযোগের মাধ্যমে সাধক আত্মাকে শূন্যে এবং শূন্যকে আত্মার মধ্যে মিলিয়ে দেয়। এই সময় তার অন্তর, বাহির দুটিই শূন্য হয়ে ওঠে। আসলে কিন্তু তার এই শূন্যতা অন্তরে পূর্ণতারই নামান্তর এবং বাইরেও সে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

* * *

সো জোগী জাকে মন মে মুদ্রা।
রাত দিবস ন করই নিদ্রা॥
মন মে আসন মন মে রহনা, মন কা জপ তপ মনসু কহনা।
মন মে খপরা, মন নে সীংগী, অনহদ মাদ বজাবৈঁ রংগী॥
পঞ্চ পরজারি ভসম কর ঝুকা, কহৈ কবীর সো লহসৈ লুকা॥

কবির বর্ণিত যোগীদের অবধূতের স্বরূপের বর্ণনা নাথপন্থীদের যোগীদের স্বরূপের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। যোগীরা কুন্ডল কিঙ্করী, মেখলা, সীঙ্গী, পৈতে, ধুঁধারী, রুদ্রাক্ষ, অন্ধারী, খপ্পর ও ঝোলা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কবির যোগীদের এই সমস্ত উপকরণের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি মনে করেন প্রকৃত যোগী এই সমস্ত বাহ্য আড়ম্বর গ্রহণ না করে, এগুলোকে মনের মধ্যে স্থান দেন।

* * *

ইহ মন সকতী ইহ মন সীব।
ইহ মন পাঁচ তত্ত্বো কা জীব।
ইহ মন জে উনমন রহৈ।
তো তীন লোক কী মাতা কহৈ॥

নাথপন্থীদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিও কবীরদাসকে প্রভাবিত করেছিল। সেই প্রভাবের প্রমাণ বহন করে উপরোক্ত কাব্য অংশটি। একদল বিশেষজ্ঞের মতে এই পদটির রচয়িতা কবিরদাস, আবার একশ্রেণীর বিশেষজ্ঞের মতে এই পদটির রচয়িতা গোরখনাথ। নাথপন্থরী শিবের উপাসক ছিলেন। তারা শিবকেই প্রধান বলে জানতেন। শরীর, মন, শক্তি সবকিছুই শিবের দান বলে মনে করতেন।

* * *

গোরখ-রাম একী নহিঁ উহবাঁ, ন বহাঁ বেদ বিচারা।
হরিহর ব্রহ্মা না শির-শক্তি, না বহ তিরথ-অচারা॥
মায় বাগ-গুরু জাকে নাহী, সো থোঁ দুজা কি অকেলা।
কহহিঁ কবীর জো অবকী বুঝৈ, সোঈ গুরু হম চেলা॥

নাথপন্থীদের আবার অবধূতও বলা হতো। অবধূতদের অন্তিম লক্ষ্য হলো মুক্তি। তারা দ্বৈত অদ্বৈতবাদের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত। কবিরদাসকেও এই ভাবনা প্রভাবিত করেছিল। তিনিও এই ভাবনা থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁর কবিতায় সেটাই প্রকাশ পেয়েছে।

* * *

অবধূ নিরঞ্জন জাল পসরা।
সরগ-পতাল জীব মৃত মণ্ডল, তীন লোক বিস্তারা॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু সিব প্রকট কিয়ো হ্যায়, তাহি দিয়ো সির ভারা
ঠাঁব-ঠাঁব তীরথ বৃত থাপ্যো, ঠ্যানো কো সংসারা॥

মায়া মোহ কঠিন বিস্তারা, আপু ভয়ো করতারা।
সত গুরু শব্দ কো চীহৃত নাহী কৈসো হোয় উবারা॥
জারি ভূঁজি কোহলা করি ডারে, ফির ফির লে অবতারা।
অমরলোক জহাঁ পুরুষ বিরাজে তিনকা মুঁদা দ্বারা॥
জিন সাহব সে ভয়ে নিরঞ্জন, সো তো পুরুষ হ্যায় ন্যারা।
কঠিন কাল তে ধাঁচা চাহো, গহো শব্দ টকসারা।
কহে কবীর অমর কর রাখো, মানে শব্দ হামারা॥

কবির তাঁর এই পদে নিরঞ্জনকে মহা ঠগ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর চোখে নিরঞ্জনেরা খুবই ভ্রষ্ট। কবিরের এমন ধারণা হবার পেছনে কারণ এটাই যে, তাঁর আমলে এসে নিরঞ্জনী সম্প্রদায় হয়তো ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। নাথপন্থী সাহিত্যে ব্রহ্মের প্রতিশব্দ রূপে নিরঞ্জন শব্দের ব্যবহার করা হয়েছিল। অনেকের মতে নিরঞ্জন মত নাথপন্থীদেরই একটি উপসম্প্রদায়। নিরঞ্জনকে পাবার জন্য শূন্যের ধ্যান প্রয়োজন। যেটা হঠযোগেরই নামান্তর। তিনি সাধকের নিরঞ্জনদের মিথ্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্য সতর্ক করে দিয়ে উপরোক্ত পদ লেখেন।

*　　　　*　　　　*

মোহি আগ্যা দঈ দয়াল, দয়া করি কাহু কুঁ সমঝাই।
কহ কবীর ম্যায় কহি-কহি হারয়ো, অব মোহি দোস ন লাই॥

কবিরদাস তাঁর রচনায় সকল ধর্মের, সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠানের ত্রুটির নিন্দা করেছেন। নিন্দা করে সব ধর্মের সার গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলি গ্রহণ করতে মানুষকে পরামর্শ দিয়েছেন। আর পরিশেষে কবিরদাস বলছেন তিনি এটা নিজের ইচ্ছেয় করেননি। ঈশ্বরের প্রেরণায় তিনি মানুষকে এই পথে চলতে বলছেন।

*　　　　*　　　　*

কাজী মুল্লাঁ ভ্রমিয়া, চল্য দুনী কৈ সাথি।
দিল তেঁ দীন বিসারিয়া, করদ লঈ জব হাথি॥
পণ্ডিত জন মাতে পঢ়ি পুরাণ, জোগী মাতে জোগী ধ্যান।
সন্যাসী মাতে অহমমেব, তপসী মাতে তপ কে ভেব॥

সমকালীন পরিস্থিতি দেখে কবির বুঝতে পেরেছিলেন মানুষ মাত্রেই এই ধর্মচারীদের পাল্লায় পড়ে ধর্মের স্বাভাবিক রূপকে ভুলে গেছে। তাই লোক কল্যাণের জন্য লোক, সমাজ ও ধর্মের মধ্যে পরিব্যাপ্ত মিথ্যা আড়ম্বরের অন্যতম প্রচারক হলেন পণ্ডিত ও মোল্লা। তাই তিনি এদের কারুকে মানতেন না।

*　　　　*　　　　*

ইক জগম ইক জটাধার, ইক অঙ্গ বিভূতি করৈ অপার।
ইক মুনিয়র বক মন হূঁ লীন, য়েয়সে হোত জগজাত খীন॥
ইক আরাধৈ সকতি সীব, ইক পড়জা দে দে বধৈ জীব।
ইক কুল দেব্যাঁ কো জপাহি জাপ, ত্রিভুনপতি ভূলে ত্রিবিধ তাপ॥
ইক পঢ়াহি পাঠ ইক ভুমৈ উদাস, ইক নগন নিরন্তন রহৈ তিবাস॥
ইক জোগজুগতি তন হোহি খীন, এয়সেঁ রামনাম সঙ্গ রহেন লীন।
ইক হূঁহি দীন ইক দেহি দান, ইক করৈ করৈ কপালী সুরা পান।
ইক তন্ত্র মন্ত্র ঔষধ বান, ইক সকল সিধ রাখৈ অপান॥
ইক তীর্থ ব্রত করি কায়া জীত, এয়সৈঁ রামনাম সে করৈ ন প্রীত।
ইক ধোম ঘোংটি তন হূঁহি স্যাম, য়ূঁ মুকতি নহীঁ বিনু রামনাথ॥
পণ্ডিতজন মাতে পঢ়ি পুরান, জোগী মাতে ধরি ধিয়ান।
সন্যাসী মাতে অহ্য মেব, তপা জু মাতে তপ কৈ ভেব॥
সব মদ মাতে কৌউ ন জাগ, সঙ্গহী চোর ঘর মুসন লাগ॥

কবিরদাসের এই দীর্ঘ পদ পাঠ করলে জানা যায় যে, তাঁর সমকালে হিন্দু ধর্মে বহু প্রকারের উপাসনা ও সাধন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এইসব পদ্ধতির মধ্যে অপরের প্রতি হিংসা এবং নিজ পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তিনি বলছেন, সেই সব উপাসক নিজ নিজ উপাসনার জয়গান প্রচারেই পাগল। তাঁরা ধর্মের প্রকৃত রূপ জানতেন না। তুলসীর মতো কবিরদাসও মনে করতেন, মুক্তির পথ একটাই এবং সেটি হলো রামনাম ভজনা।

* * *

দস সন্যাসী বারহ জোগী, চৌদহ শেখ বখান।
অঠারহ ব্রাহ্মণ অঠারহ জঙ্গম, শেখড়া জান॥

কবিরদাসের সমকালে ছিয়ানব্বইটির মতো বিভিন্ন সম্প্রদায়, উপসম্প্রদায় ছিল। হয়তো সে সময় প্রচুর বর্ণ বিরোধ ছিল। কিন্তু সাধারণ ভাবে ইতিহাস এটাই জানায় যে, সে সময় হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও তার উপসম্প্রদায়, শৈব সম্প্রদায়, স্মার্ত সম্প্রদায়, নাথ পন্থ, ইসলাম, সুফি ইত্যাদি বিভিন্ন ধার্মিক মত ও মতান্তর জনসাধারণকে নিজ নিজ পদ্ধতিতে প্রভাবিত করার চেষ্টা করত।

* * *

সেখ সবেরী বাহিরা, কেয়া হজ কাবৈ জাঈ।
জাকা দিল সবেত নহীং, তাকৌ কহাঁ খুদায়॥

কবিরদাস এই কাব্যখণ্ডে মুসলমানদের বাহ্য আড়ম্বরের নিন্দা করেছেন। তিনি মুসলমান ধর্মের ত্রুটির দিকগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছেন, মুসলমান মানুষগণ যেন এগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকেন। তিনি বলেন, যে মানুষ একই সঙ্গে হজ করে, কাবা গমন করে, সেই আবার কি করে গো হত্যা করে তা তাঁর বোধগম্য হয় না।

*　　　*　　　*

হেঁী বলি কব দেখোঁগী তোহি।
অহনিস আতুর দরসম কারনি, এয়সী ব্যাপী মোহি॥
নৈন হমারে তুমকোঁ চাহৈং, রতী ন মানৈ হারি।
বিরহ অগিনি তন অধিক জরা বৈ, এয়সী লেহু বিচারি॥
সুনহু হমারী দাদি গুসাঁঈ, অব জনি করহু অধীর।
তুম ধীরজ ম্যায় আতুর স্বামী, কাঁচৈ ভাঁড়ে নীর॥
বহুত দিনন কে বিছুরে মাধৌ, মন নহিং বাঁধে ধীর।
দেহ ছতাঁ তুম মিলহু কৃপা করি, আরতিবন্ত কবীর॥

এই কাব্য অংশে কবিরদাস অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় তাঁর বিরহ বেদনা প্রকাশ করেছেন। পণ্ডিতগণ বলেন কবিরদাসের কাব্যে জ্ঞান, বুদ্ধির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

*　　　*

সন্ত কবির

হিন্দী সাহিত্যে ভক্তি যুগকে 'স্বর্ণ যুগ' বলা হয়। এই স্বর্ণ যুগের অন্যতম রত্ন হলেন কবির। তাঁর জন্ম সন ও মৃত্যু সন নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বহু বিবাদ আছে। মোটামুটি ভাবে সর্বজনগ্রাহ্য তাঁর জন্ম সন ১৩৯৮ এবং মৃত্যু সন ১৫১৮। তাঁর জন্ম মৃত্যুর তারিখ নিয়ে যেমন বিবাদ আছে, তেমনি তাঁর জীবন কাহিনী নিয়েও বিবাদ আছে। নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। জনশ্রুতি হলো, তিনি এক ব্রাহ্মণ বিধবার সন্তান। বাল্যকালে তাঁর মা তাঁকে ত্যাগ করেন। ফলে প্রচলিত প্রথা মতো শিক্ষা দীক্ষা তিনি পাননি। নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'মসি কাগজ ছুয়ো নহী, কলম গাহো নহী হাথ।' অর্থাৎ কাগজ কলম, কালি, এসব তিনি স্পর্শ করেন নি।

ভক্তি কাব্যের নিগুর্ণ ধারার কবিদের মধ্যে কবিরের স্থান অনেক ওপরে। রহস্যবাদী কবীদের মধ্যে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রথম বলে মনে করা হয়। নিজের হাতে তিনি কিছুই লেখেন নি। তাঁর যতো বাণী পাওয়া যায়, তা সবই তাঁর শিষ্যদের লিখে রাখা ও সংগ্রহ করা। তাঁর রচনার মাধ্যমেই জানা যায়, তিনি ছিলেন গৃহস্থ এবং পেশায় তাঁতি।

কবিরদাসের গুরু ছিলেন আচার্য রামানন্দ। কবিরের অসীম ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি কবিরকে শিষ্য করে নেন। গুরু রামানন্দের বাণীকে তিনি নিগুর্ণ চেতনায় গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী; বহু শিষ্য পেয়েছিলেন এবং অতি সহজ সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। গুরুর প্রতি ছিল তাঁর অসীম ভক্তি। মানুষের প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা, সত্যের জয়গান ছিল তাঁর জীবনের নিত্য সঙ্গী। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মিথ্যা আড়ম্বরের বিরোধিতা করতে তিনি পিছপা হননি। তাঁর রহস্যবাদ গভীর জ্ঞান ও একমনে পাঠের বিষয়। তাঁর দোহা মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

কবিরের রচনাগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক ধরনের রচনা 'আধ্যাত্মিক রহস্যবাদে' পরিপূর্ণ। অপর শ্রেণীর রচনা 'নৈতিক প্রেরণাদায়ক'। তার রহস্যবাদ গভীর অর্থবহ এবং হিন্দু দর্শন আশ্রিত। তাঁর সময়ে সমাজে রীতি, নীতি তন্ত্র-মন্ত্র, জাত পাতের বিভেদ বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল। এসবের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেন এবং প্রকাশ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের নানাবিধ অবাস্তব অগ্রহণযোগ্য ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। কবিরের বাণী যে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, তার নাম বীজক। বিহারের সহগর নামক স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়।

* * *

মীরার পদাবলী

॥ ১ ॥

জগ মেঁ জীবণা থোড়া, রাম কুঁ্য ন কহরে জংজার ॥
মাত পিতা তো জন্ম দিয়োহৈ, মরম দিয়ো করতার ।
কইরে খাইয়ো কইরে খরচিয়ো, কইরে কিয়ো উপকার ॥
দিয়া লিয়া তেরে সংগ চলেগা, ঔর, নহী তেরী লার ।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, ভজ উতরো ভবপার ॥

—এ জগতে জীবন স্বল্প দিনের জন্য। হে নরপশু, তুই রাম নাম করছিস কেন? মা-বাবা জন্ম দিয়েছেন, কর্ম দিয়েছেন কর্তা। কারোকে খাইয়েছ, কারোর জন্যে খরচ করেছ; এসমস্ত কিছুই তোমার সঙ্গে যাবে না। যা দান করেছ, তা তোমার সঙ্গে যাবে, তাতেই তোমার লাভ। মীরার প্রভু গিরিধারী-নাগরকে ভজনা কর; অনায়াসে ভব-সাগর পার হয়ে যাবে।

*　　　*　　　*

॥ ২ ॥

মনখা জনম পদারথ পায়ো, ঐসী বহুরন আতী ॥
অব কে মোসর জ্ঞান বিচারো, রাম রাম মুখ গাতী ।
সত গুরু মিলিয়া সুঁজ পিছানী, ঐসা ব্রহ্ম মৈঁ পাতী ॥
যগুরা সুরা অমৃত পীরে, নিগুরা প্যাসা জাতী ।
মগন ভয়া মেরা মন সুখ মেঁ, গোবিন্দকাগুণ গাতী ॥
সাহব পায়া আদি অনাদি, নাতর ভর মেঁ জাতী ।
মীরা কহে ইক আস আপকী, ঔরাঁ সুঁ সকুচাতী ॥

—অমূল্য পদার্থ মানব-জীবন পেয়েছ; এমন জন্ম আর আসবে না। এই অবসরে জ্ঞান বিচার করে নাও, মুখ রাম নাম গান করুক। আমার প্রথমে সদ্‌গুরু মিলেছে,

পরে জ্ঞান লাভ করেছি ; এইভাবে আমি ব্রহ্মকে পেয়েছি। যার গুরু আছে সে স্বর্গের অমৃত পান করে ; যার গুরু নেই, সে পিপাসা নিয়েই যায়। গোবিন্দের গুণ-গান করতে করতে আমার মন সুখে মগ্ন হয়েছে। আমি অনাদি স্বামী পেয়েছি ; তা নাহলে আমাকে সংসারে যেতে হতো। মীরা বলছে, হে ভগবান, একমাত্র তুমিই আমার আশা-স্থল। অপরের কাছে আশা করতে সংকোচ বোধ হয়।

* * *

॥ ৩ ॥

মন রে পরসি হরিকে চরণ ॥
সুভগ সীতল কংবল কোমল, ত্রিবিধি জ্বালা হরণ।
জিন চরণ প্রহ্লাদ পরসে, ইংদ্র পদবী ধরণ ॥
জিন চরণ ধ্রুব অটল কীণে, রাখি অপণী সরণ।
জিন চরণ ব্রহ্মাণ্ড ভেট্যো, নখ শিখ সিরী ধরণ ॥
জিন চরণ প্রভু পরসি লীণো, তরী গোতম ঘরণ।
জিন চরণ কালী নাগ ন্যাথো, গোপি লীলা করণ ॥
জিন চরণ গোবরধন ধার্যো, ইংদ্র কো গর্ব হরণ।
দাসী মীরা লাল গিরিধর, অগম তারণ তরণ ॥

—যে চরণ প্রহ্লাদ স্পর্শ করেছেন, যে চরণ স্পর্শ করে ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব লাভ করেছেন, যে চরণ ধ্রুব অটলভাবে ধারণ করে আছেন, যে চরণ-স্পর্শে অহল্যা উদ্ধার পেয়েছেন, যে চরণ কালিয়-নাগকে বিধ্বস্ত করেছে, যে চরণ গোপীদের সঙ্গে লীলা করেছে, যে চরণ গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে ইন্দ্রের গর্ব চূর্ণ করেছে, হে মন তুই শ্রীহরির সেই সুন্দর, শীতল, কমল-কোমল, ত্রিবিধ জ্বালাপহারী চরণ স্পর্শ কর। মীরা এই অগম্য ভবসাগর-তরণের তরণী গিরিধারীলালের দাসী।

* *

॥ ৪ ॥

রাম নাম রস পীজে মনআঁ, রাম নাম রস পীজে।
তজ কুসংগ সতসংগ বৈঠ নিত, হরি চরচা সুণ লীজে ॥
কাম ক্রোধ মদ লোভ মোহ কূং, চিত সে বহায়দীজে।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, তাহি কেরংগ মেভীজে ॥

—হে মন, তুমি রামনামের রস পান কর, রামনাম-রস পান কর। কুসঙ্গ ত্যাগ

কর, নিত্য সৎসঙ্গ কর ও হরিকথা শ্রবণ কর। কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, মোহকে চিত্ত থেকে দূরে করে দাও, এবং মীরার প্রভু গিরিধারী নাগরের প্রেমে সিক্ত থাকো।

* * *

॥ ৫ ॥

মাঈ ম্হারী হরি ন বূঝি বাত।
পিংড মেং সে প্রাণপাপী, নিকস ক্যূঁ নহিং জাত ॥
রৈণ অংধেরী বিরহ ঘেরী, তারা গিণত নিস্ জাত।
লে কটারী কংঠ চীরূং, করূংগী অপঘাত॥
পাট ন খোল্যো, মূখা ন বোল্যো, সাঁঝ লগ পরভাত।
অবোলনা মেং অবধ বীতী, কাহে কী কূসলাত ॥
সূপণ মেং হরি দরস দীন্হোঁ, মৈংন জাণ্যো হরি জাত।
নৈন ম্হাঁরা উঘড়ি আয়া, রহী মন পছতাত ॥
আবণ অবেণ হোয় রহ্যোরে, নহিং আবণ কী বাত।
মীরা ব্যাকূল বিরহিণীরে, বাল জ্যোঁ বিল্লাত ॥

—মা, হরি আমার কথা বোঝেন না। আমার এ দেহ থেকে পাপী প্রাণ কেন বেরিয়ে যাচ্ছে না? অন্ধকার রাত; বিরহ আমাকে ঘিরে ফেলেছে; তারা গুণতে গুণতেই রাত কাটছে। আমার আর সহ্য হয় না; আমি ছুরি দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করব। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার অপেক্ষায় রইলাম, তুমি আমার ঘরের পরদা খুললে না, কথাও বললে না। সময় তো চলে গিয়েছে, এখন বল কেন তুমি আমার ওপর রাগ করেছ। হরি আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন; আমি জানতাম না, তিনি চলে যাচ্ছেন। আমার চোখ খুলল, দেখলাম হরি নেই। মনে মনে আপসোস করতে লাগলাম। তুমি আসবে আসবে করে আশায় কাটাচ্ছি; কিন্তু এখন দেখছি আসার কোনো কথাই নেই। বিরহিনী মীরা ব্যাকুল হয়ে বালকের মতো কাঁদছে।

*

॥ ৬ ॥

হে রী মৈং তো প্রেম দিবানী মেরা দরদ ন জাণে কোয়॥
সূলী উপর সেজ হমারী কিস বিধ সো ণা হোয়।
গগন মণ্ডল পৈ সেজ পিয়াকো, কিস বিধ মিলনা হোয়॥
ঘায়ল কী গত ঘায়ল জানৈ, কী জিন লাঈ হোয়।
জৌহরী কী গত জৌনরী জানৈ, কী জিন জৌহর হোয়॥

দরদ কী মারী বনবন ডোলূঁ বৈদ মিল্যা নাহিং কোয় ।
মীরা কী প্রভু পীর মিটেগী, জব বৈদ সঁবলিয়া হোয় ॥

—হে সখি, আমি তো প্রেম-পাগলিনী, আমার অন্তরের দরদ তো কেউ জানে না। শূলের উপর আমার বিছানা, আমি শুই কেমন করে? গগন-মণ্ডলের উপর আমার প্রিয়ের শয্যা, তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হবে কেমন করে? ব্যথিতের অন্তর-বেদনা ব্যথিতই জানে, আর জানে সে যে বেদনা দিয়েছে। জহুরীর অবস্থা জহুরীই জানে, আর জানে জহর। বিরহ-বেদনায় বনে বনে ছুটে বেড়াচ্ছে, কোনো বৈদ্যই মিলছে না। যে দিন শ্যাম বৈদ্য হয়ে আসবেন, সেই দিনই মীরার অন্তঃকরণের পীড়া সারবে।

*　　　*　　　*

॥ ৭ ॥

নৈ ণা মোরে বাণ পড়ী, সাঈং মোহিং দরস দিখাঈ ॥
চিত্ত চড়ী মেরে মাধুরি মূরত, উর বিচ আন অড়ী ।
কৈ সে প্রাণ পিয়া বিনু রাখূঁ, জীবন মূর জড়ী ॥
কব কী ঠাঢ়ী পংথ নিহারূঁ, অপনে ভবন খড়ী ।
মীরা প্রভু কে হাথ বিকানী, লোক কহে বিগড়ী ॥

—স্বামী, আমার নয়নে বাণ পড়েছে, আমি অন্ধ হয়েছি, এই চোখ দিয়ে তো আর তোমাকে দেখতে পার না। তুমি এখন আমার চিত্তে চড়ে, তোমার মধুর মূর্তি আমার হৃদয়ের মধ্যে এনে দেখাও। তুমি যে আমার জীবনের মূল শিকড়; তোমাকে না দেখে আমি প্রাণ রাখব কেমন করে? নিজের ভবনে খাড়া হয়ে আমি তোমার পথ চেয়ে আছি। মীরা তো তার প্রভুর হাতে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে, লোকে বলে মীরা বিগড়ে গেছে।

*　　　*　　　*

॥ ৮ ॥

জোগিয়া তু কব রে মিলেগো আঈ ।
তেহেরি কারণ জোগ লিয়ো হৈ, ঘর ঘর অলখ জগাঈ ।
দিবস ন ভূখ রৈণ নাহিং নিদ্রা, তুঝ বিন কছু ন সুহাঈ ।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, মিল করতপত বুঝাঈ ॥

—যোগী, তুই কবে এসে আমার সঙ্গে মিলবি? তোর জন্যেই তো যোগ নিয়ে ঘরে ঘরে 'অলখ' 'অলখ' করে চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছি। দিনে আমার খিদে নেই, রাতে ঘুম নেই।

তোকে না পেয়ে আমার যে কিছুই ভালো লাগছে না। মীরার প্রভু গিরিধারী এসে আমার এ তাপ নিবারণ করবেন।

*   *   *

॥ ৯ ॥

তুমহরে কারণ সব সুখ ছোড়্য়া, অব মোহিঁ কুঁ্য তর সাবো।
বিরহ বিথা লাগী উর অংদর, সো তুম আয় বুঝাবো ॥
অব ছোড়্য়াঁ নাহিঁবনৈ প্রভুজী, হঁস কর তুরত বুলাবো।
মীরা দাসী জনক জনম কী, অংগ সূঁ অংগ লাগাবো ॥

—তোমার জন্যই তো আমি সব সুখ ছাড়লাম; এখনও আমাকে লোভ দেখিয়ে রাখছ কেন। বিরহ বেদনা আমার হৃদয়ের ভেতর লেগেছে, তুমি এসে সে ব্যথা দূর কর। এখন তো আর আমাকে ছেড়ে থাকলে চলবে না; প্রভু তুমি শীঘ্র এসে হেসে আমাকে ডেকে নাও। মীরা যে, জন্মান্তরে তোমার দাসী। তার অঙ্গের সঙ্গে তোমার অঙ্গ স্পর্শ করাও।

*   *   *

॥ ১০ ॥

পিয়া ইতনী বিনতী সুণ মোরী, কোই কহিয়ো রে জায় ॥
ঔরন সূঁ রস বতিয়াঁ করত হো, হম সে রহে চিত চোরী।
তুম বিন মেরে ঔর ন কোঈ, মেঁ সরণাগত তোরী।
আবণ কহ গয়ে অজহূঁন আয়ে, দিবস রহে অব থোরী।
মীরা কহে প্রভু কব রে মিলোগে, অরজ করূঁ কর জোরী ॥

—সখি তোমরা কেউ গিয়ে তাকে আমার এই কথাটি বলে এসো—হে প্রিয় তুমি আমার এই মিনতিটুকু শোনো। অপরের সঙ্গে তুমি রসরঙ্গে কথা বল, আর আমার কাছ থেকে তোমার মন চুরি করে রাখ? তুমি ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই, আমি যে তোমারই শরণাগত! আসব বলে চলে গেলে, আজও এলে না; দিনের আর অল্পই বাকি আছে। মীরা করজোড়ে প্রার্থনা করে বলছে, 'হে প্রভু, তোমার সঙ্গে কবে আমার মিলন হবে?'

*   *   *

॥ ১১ ॥

জোগী মত জা, মত জা, মত জা, পায় পরূঁ মৈঁ চেরী তেরী হোঁ ॥
প্রেম ভগতি কো পৈঁড়োহী ন্যারো, হম কুঁ গৈল বতা জা।
অগর চন্দন কী চিতা রচাউঁ, অপনে হাথ জলা জা ॥
জলবল ভঈ ভস্ম কী ঢেরী, অপনে অংগ লগা জা।
মীরা কহে প্রভু গিরিধর নাগর, জোত মেঁ জোত মিলা জা ॥

—যোগী, যাস নি, যাস নি তোর পায়ে পড়ি তুই যাস নি, আমি যে তোর দাসী। প্রেম ভক্তির পথ অতি বিষম; আমি কোন্ পথে যাব বলে দিয়ে যা। আমি আমার জন্য অগুরু-চন্দনের চিতা প্রস্তুত করি, তুই নিজের হাতে আমাকে সেই চিতায় জ্বালিয়ে যা; যখন সব জ্বলে-পুড়ে ভস্মের ঢিবি হবে, তখন সেই ছাই তুই নিজের অঙ্গে লাগিয়ে যা। মীরা বলছে, হে গিরিধারী নাগর তোমার নিজের জ্যোতিতে আমার জ্যোতি মিশিয়ে দাও।

*　　　*　　　*

॥ ১২ ॥

মেরে প্রীতম প্যায়ে রাম নে, লিখ ভেজূঁরী পাতী ॥
স্যাম সনেসা কবহূঁন দীন্‌হো, জান বূঝা গূঝা বাতী।
ঊঁচী চঢ় চঢ় পংথ নিহারূঁ, রোয় রোয় আঁখিয়ঁ রাতী ॥
তুম দেখ্যাঁ বিন কল ন পরত হৈ, হিয়ো ফটত মোরী ছাতি।
মীরা কহে প্রভু কব রে মিলোগে, পূর্ব্ব জনম কে সাথী ॥

—আমার প্রিয়তম রামকে চিঠি লিখে পাঠাবো। শ্যাম আমার অন্তরের গোপন কথা জেনেও কোনো দিন একটা খবরও দিলেন না। আমি উঁচুতে চড়ে চড়ে (ছাতের ওপর উঠে) শ্যামের পথের দিকে চেয়ে থাকি; কেঁদে কেঁদে আমার চোখ লাল হয়ে উঠেছে। তোমাকে না দেখতে পেয়ে, আমার কিছুই ভালো লাগছে না; আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মীরা বলছে, তোমায় আমায় মিলন কবে হবে? আমি যে তোমার পূর্বজন্মের সাথী।

*　　　*　　　*

॥ ১৩ ॥

বারী বারী হো রাম হূঁ বারী, তুম আজ্যো গলী হমারী।
তুম দেখ্যাঁ বিন কল ন পড়ত হৈ, জোউঁ বাট তুমারী ॥

কুণ সখী সুং তুম রংগ রাতে, হম সুং অধিক পিয়ারী।
কিরপা কর মোহিং দরসন দীজ্যো, সব তকসীর বিসারী ॥
তুম সরণাগত পরক দয়ালা, ভবজল তার মুরারী।
মীরা দাসী তুম চরণ ন কী, বার বলিহারী।

—ধন্য ধন্য হে রাম, তুমিই ধন্য! একবার তুমি আমার এই পথে এস। তোমাকে না দেখে, আমার কিছুই ভালো লাগছে না। তোমার জন্য আমি পথে দাঁড়িয়ে আছি। আমার চেয়ে কোন্ প্রিয়তর সখীর প্রেমে তুমি মত্ত আছ? তুমি কৃপা করে আমার সমস্ত অপরাধ ভুলে, একবার আমায় দেখা দাও। হে মুরারী, তুমি শরণাগতের প্রতি পরম দয়ালু, আমাকে তুমি ভব জল থেকে উদ্ধার কর। মীরা তোমারই চরণের দাসী। বারে বারে আমি বলি, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য!

॥ ১৪ ॥

দরস বিন দুখন লাগে নৈন।
জব সে তুম বিছরে মেরে প্রভুজী, কব হুঁন পায়োঁ চৈন ॥
সবদ সুনত মেরী ছতিয়াঁ কংপৈ, মীঠে লগে তুম বৈন।
এক টকটকী পংথ নিহারুঁ, ভঈ ছমাসী রৈন ॥
বিরহ বিথা কাসুঁ কহুঁ সজনী, বহগই করবত ঐন।
মীরা কে প্রভু কব রে মিলোগে, দুখ মেটন সুখ দেন ॥

—তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমার চোখ দুটি কষ্ট পাচ্ছে। তুমি যেদিন থেকে আমার কাছ থেকে পৃথক হয়েছ, সেদিন থেকে আর আমি আরাম পাই না। একমাত্র তোমার কথাই আমার মিষ্টি লাগে; অন্য কোনো শব্দ শুনলে বুক আমার কেঁপে ওঠে। এক দৃষ্টিতে আমি তোমার পথের দিকে চেয়ে আছি; এক এক রাত্রি আমার ছ'মাস বলে মনে হচ্ছে। সজনী, আমার বিরহ-ব্যথা কাকে জানাব? বিরহ করাতের মতো আমার হৃদয় ছেদন করছে। দুঃখদায়ী, সুখদায়ী, মীরার প্রভু, কবে তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হবে?

*　　*　　*

হো জী মহারাজ ছোড় মত জাজ্যো ॥
মৈ অবলা বল নাহিং গোসাঈ, তুমহিং মেরে সিরতাজ।
মৈ গুণহীন গুণ নাহিং গুসাঈং, তুম সমরথ মহারাজ।

রাবলী হোই য়ে কিন রে জাউঁ, তুম হো হিবড়া রো সাজ।
মীরা কে প্রভু ঔর ন কোঈ, রাখো অবকে লাজ ॥

—মহারাজ, আমাকে ছেড়ে যেও না। গোঁসাই, আমি তো অবলা, আমার কোনো বল নেই ; তুমি যে আমার শিরোভূষণ। গোঁসাই, আমি গুণহীন, কোনো গুণই আমার নেই তুমি তো সর্বশক্তিশালী! আমি তো তোমার, এখন কার কাছে যাবো? তুমি যে আমার হৃদয়ের অলংকার! আর কেউ তো মীরার প্রভু নয় ; এখন তুমি তার লজ্জা রক্ষা কর।

* * *

॥ ১৬ ॥

অব মৈঁ সরণ তিহারী জী, মোহীঁ রাখো কৃপানিধান ॥
অজামীল অপরাধী তারে, তারে নীচ সদান।
জল ডুবত গজরাজ উবারে, গণিকা চঢ়ী বিমান ॥
ঔর অধম তারে বহুতেরে, ভাখত সংত সুজান।
কুবজা নীচ ভীলনী তারী, জানৈ সকল জহান ॥
কহঁ লগি কহুঁ গিনত নহিঁ আরৈ, থকি রহে বেদ পুরাণ।
মীরা কহৈ মৈঁ সরণ রাবলী, সুনিয়ো দোনোঁ কান ॥

—কৃপানিধান, এখন আমি তোমারই শরণ নিলাম, আমাকে রক্ষা কর। অপরাধী অজামীলকে তুমি রক্ষা করেছ, নীচ জাতীয় সদনাকে ত্রাণ করেছ, গজরাজ গ্রাহগ্রস্থ হয়ে জলে ডুবতে বসেছিল—তাকে তুমি উদ্ধার করেছ, গণিকাকে রথে চড়িয়ে স্বর্গে পাঠিয়েছ। সাধুরা বলেন আরও অনেক অধমকে উদ্ধার করেছ। আমি আর কত বলবো, গুণে শেষ করা যায় না। বেদ-পুরাণ তোমার অধম-তারণের কথা বলতে বলতে হার মেনেছে। মীরা বলছে তুমি দু'কান দিয়ে শোন, আমি তোমারই শরণ নিলাম।

* * *

॥ ১৭ ॥

মেরা বেড়া লগায় দীজো পার, প্রভু জী অরজ করুঁ ছূঁ।
য়া ভর মেঁ মৈঁ বহু দুখ পায়ো, সংসা সোগ নিবার।
অষ্ট করম কী তলব লগী হৈ, দূর কর দুখ পার ॥
য়ো সংসার সব বহ্যো জাত হৈ, লখ চৌরাসী ধার।
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর, অবাগমন নিবার ॥

—প্রভু, তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, তুমি আমায় নৌকায় পার করিয়ে দাও। এ জগতে আমি অনেক দুঃখ পেলাম ; আমার সংসার-শোক নিবারণ কর। আমার অষ্ট কর্মের ফল আমাতে লেগেই রয়েছে। হে দুঃখহারি, তুমি আমার দুঃখ দূর কর। এই সংসার চুরাশি লক্ষ ধারায় বয়ে চলেছে। হে মীরার প্রভু গিরিধারী, তুমি এই ভব-সংসারে আমার এই গমনাগমন নিবারণ কর।

*　　　*　　　*

॥ ১৮ ॥

মীরা কো প্রভু যাচী দাসী বনাস।
ঝূঠে ধংধো সে মেরা ফংদা ছুড়াও ॥
লুটে হী লেত বিবেক কা ডেরা।
বুধি বল যদপি করূঁ বহুতেরা ॥
হায় রাম নাহিঁ কছু বস মেরা।
মরত হূঁ বিবস প্রভু ধাও সবেরা ॥
ধর্ম্ম উপদেশ নিত প্রতি সুনতী হূঁ।
মন কুচাল সে ভী ডরতী হূঁ।
সদা সাধু সেবা করতী হূঁ।
সুমিরণ ধ্যান মেঁ চিত ধরতী হূঁ ॥
ভক্তি মার্গ দাসী কো দিখাও।
মীরা কো প্রভু সাচী দাসী বনাও ॥

—প্রভু, তুমি মীরাকে তোমার প্রকৃত দাসী তৈরি করে নাও। অনিত্য কর্মের জন্য যে আমার নিত্য প্রয়াস, তা দূর করে দাও। আমি অনেক চেষ্টা করলেও আমার বুদ্ধি আর বল বিফল হচ্ছে, বিবেক লুণ্ঠিত হচ্ছে। হায় রাম, কিছুই আমার বশ নয়। আমি অবশ হয়ে মরছি। প্রভু, তুমি শীঘ্র ছুটে এস। প্রতিদিনই ধর্মোপদেশ শ্রবণ করছি, রোজ সাধুসেবা করছি, তোমার ধ্যানও করছি, কিন্তু তবু আমার মনের কুগতি আর দূর হচ্ছে না, আমি তাই ভয় পাচ্ছি। প্রভু, মীরাকে তুমি ভক্তি মার্গ দেখিয়ে দাও আর তাকে তোমার প্রকৃত দাসী তৈরী করে নাও।

*　　　*　　　*

॥ ১৯ ॥

তুম সুনো দয়াল ম্হাঁরী অরজী ॥
ভৌ সাগর মেঁ বহী জাত হূ, কাঢ়ো তো থাঁরী মরজী।

যো সংসার সগো নাহিঁ কোঈ, সাচা সগা রঘুবরজী ॥
মাত পিতা ঔর কুটুঁব কবীলো, সব মতলবকে গরজী।
মীরা কো প্রভু অরজী সুন লো, চরণ লগাও থারী মরজী ॥

—দয়াল, তুমি আমার প্রার্থনা শোনো। এই ভবসাগরে আমি ভেসে যাচ্ছি, দয়া করে আমাকে তুমি উদ্ধার কর। সংসারে আমার প্রকৃত আত্মীয় কেউই নেই, একমাত্র রঘুবরই আমার প্রকৃত আত্মীয়। মা, বাবা, আত্মীয় কুটুম্ব, সকলেই আপন আপন মতলবের গরজে সম্বন্ধ পাতায়। হে প্রভু, তুমি মীরার প্রার্থনা শোনো; তাকে দয়া করে চরণে স্থান দাও।

* * *

॥ ২০ ॥

ফাগুন কে দিন চার রে, হোলী খেল মনা রে।
বিন করতল পখাবজ বাজে, অনহত কী ঝনকার রে।
বিন সুরুরাগ ছতী সুঁগাবে, রোম রোম রঁগ সার রে।
সীল সংতোষ কী কেসর ঘোলী, প্রেম প্রীতি পিচকার রে ॥
উড়ত গুলাল লাল ভয়ে বাদল, বরসত রংগ অপার রে।
ঘটকে পট সব খোল দিয়ে হৈ, লোক লাজ সব ডার রে ॥
হোলী খেল প্যারী পিয় ঘর আয়ে,
সোঈ প্যারী পিয় প্যাম রে।
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর, চরণ কঁবল বলিহার রে ॥

—মন, ফাল্গুন মাসের চার দিন হোলি খেলা কর। আমার এ হোলি খেলাতে করতাল ও পাখোয়াজ ব্যতিরেকেই অনাহত ধ্বনির ঝঙ্কার হয়, রাগ ও সুর অভাবেও রোমে রোমে ছত্রিশ রাগিনীর আলাপ হয়। আমি শীল ও সন্তোষের রং গুলেছি ও প্রেম প্রীতির পিচকারি করেছি। আমার লাল আবিরে সমস্ত মেঘ লাল হয়েছে, অনন্ত রং বর্ষণ করছে। আমি দেহের ভেতরের সমস্ত পরদা খুলে দিয়েছি, লোকলজ্জা ত্যাগ করেছি। যে স্ত্রী হোলি খেলবার জন্য স্বামীর প্রিয়, মীরার প্রভু গিরিধারী-নাগরের চরণ কমলই ধন্য।

* * *

॥ ২১ ॥

বরষে বদরিয়া সাবন কী, সাবন কী মন ভাবন কী ॥
সাবন মেঁ উমগ্যো মেরো মনবা, ভনক সুনী হরি আবন কী।

উমক ঘুমড় চহুঁ দিস সে আয়ো, দামিন দমকে ঝর লাবন কী ।।
নন্হী নন্হী বুঁদন নেহা বয়সে, সীতল পবন সোহাবন কী ।
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর, আনন্দ মঙ্গল গাবন কী ।।

—শ্রাবণে মেঘ থেকে অবিশ্রান্ত বর্ষণ হচ্ছে। প্রিয়ের জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়েছে। এই শ্রাবণে মন আমার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, আমি হরির আগমনের শব্দ অল্প অল্প শুনতে পাচ্ছি। চার দিক থেকে ঘনঘটায় মেঘ এসে জমেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝড় উঠবে, থেকে থেকে মেঘ থেকে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়ছে, ঠাণ্ডা বাতাস সোহাগভরে আমাকে স্পর্শ করছে। সমস্ত জগৎ মীরার প্রভু গিরিধারী-নাগরের আগমনে আনন্দ-মঙ্গল গীত গাইছে।

* * *

॥ ২২ ॥

রে পপইয়া প্যারে কব কৌ বৈর চিতারো ।।
মৈং সূতী ছী অপনে ভবন মেং, পিয় পিয় করত পুকারো ।
দাধ্যা উপর লূন লাগায়ো, হিবড়ে করবত সারো ।।
উঠি বৈঠো বৃচ্ছ কী ডালী বোল বোল কংঠ সারো ।
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর, হরিচরণাঁ চিত ধারো ।।

—প্রিয় পাপিয়া, তুই আবার কোন্ কালের শত্রুতা সাধন করছিস? আপন ভবনে আমি শুয়ে আছি, কেন তুই 'পিয়,' 'পিয়' করে চিৎকার করে আমার প্রিয়ের কথা মনে জাগিয়ে দিচ্ছিস? একে তো আমি বিরহ-ব্যথায় অস্থির, তুই কেন আবার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছিস? আমার হৃদয়ে যে করাত চালাচ্ছিস্! তুই গাছের ডালে বসে ডেকে ডেকে গলা ফাটাচ্ছিস কেন? মীরার প্রভু গিরিধারী নাগর হরির চরণে চিত্তকে অর্পণ কর।

* * *

॥ ২৩ ॥

বাদল দেখ ঝরি হো স্যাম, মৈং বাদল দেখ ঝরী ।।
কালী পীলী ঘটা উমংগীং, বরস্যো এক ধরী ।
জিত জাউং তিত পানিহি পানি, হুঈ সব ভোম হরী ।।
জা কা পিব পরদেস বসত হৈ, ভীজে বার খরী ।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, কী জ্যো প্রীত খরী ।।

—শ্যাম, মেঘ দেখে তোমার কথা মনে পড়ে আমার চোখ দিয়ে জল ঝরছে। কালো আর হলুদ রঙের মেঘের ঘনঘটা, এক নাগাড়ে বৃষ্টি পড়ছে। যেখানেই যাই সেখানেই কেবল জল; সমস্ত ভূমি সবুজ হয়ে গেছে। প্রিয় যার পরদেশে বাস করে, এসময় সে বাইরে দাঁড়িয়ে ভেজে। মীরার প্রভু গিরিধারী তুমি শীঘ্র এসে আমার প্রীতি উৎপাদন কর।

*   *   *

॥ ২৪ ॥

পিয়া তৈঁ কহাঁ গয়ো নেহড়া লগায়।
ছাঁড়ি গয়ো অব কঁহ বিসাসী, প্রেম কী বাতী বরায় ॥
বিরহ সমঁদ মেঁ ছোড় গয়া ছো, নেহ কী নাব চলায়।
মীরা কহে প্রভু কব রে মিলোগে, তুম বিন রহ্যো ন জায় ॥

—প্রিয়, আমার মাঝে প্রেমের সঞ্চার করে, তুমি কোথায় গেলে? বিশ্বাসঘাতক, প্রেমের বাতি জ্বালিয়ে এখন আমাকে ছেড়ে কোথায় গেলে? আমাকে প্রেমের নৌকোয় চড়িয়ে অবশেষে বিরহ-সমুদ্রে ঠেলে দিলে? মীরা বলছে, হে প্রভু তুমি কবে এসে মিলবে? আমি যে তোমার বিরহে থাকতেই পারছিনে।

*   *   *

॥ ২৫ ॥

নৈনা লোভী রে, বহুরি সকে নহিঁ আয়।
রোম রোম নখ সিখ সব নিরখত, ললচ রহে ললচায় ॥
মৈঁ ঠাঢ়ী গৃহ অপনে রী, মোহন নিকসে আয়।
বদন-চন্দ পরকাসত হেলী, মন্দ মন্দ মুসুকায় ॥
লোক কুটংবী বরজ বরজহী, বতিয়া কহত বনায়।
চংচল চপল অটক নহিঁ মানত, সর হথ গয়ে বিকায় ॥
ভলী কহো কোই বুরী কহো মৈঁ, সব লঈ সীস চঢ়ায়।
মীরা কহে প্রভু গিরিধর কে বিন, পল ভর রহ্যো ন জায় ॥

—নয়ন, তুই বড়ো লোভী; একবার সেরূপ দেখলে তুই আর ফিরে আসতে পারিস না। আপাদ মস্তক প্রতিটি রোম পর্যন্ত নিরীক্ষণ করেও, লালসা তোর আর মেটে না। আমি নিজ গৃহেই আছি, এমন সময় মোহন বেরিয়ে এলেন। সখি, তাঁর চাঁদের মতো মুখ

ফুটে উঠল, তিনি আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসলেন। আত্মীয়-স্বজন সকলেই আমাকে নিষেধ করে নানা কথা আমায় বানিয়ে বানিয়ে বলল—আমার চঞ্চল নয়ন কিন্তু বাধা মানল না। আমি কি করব, আমি যে পরের হাতে নিজকে বিকিয়ে দিয়েছি। কেউ আমায় ভালো বলে, কেউ বলে মন্দ। সকলের কথা আমি মাথা পেতে নিই। মীরা বলে, প্রভু গিরিধারীকে ছাড়া এক মুহূর্তেও সে থাকতে পারছে না।

* * *

॥ ২৬ ॥

বসো মেরে নৈঁনন মেঁ নংদলাল ॥
মোহনী মূরতি, সাঁবরি সূরতি বনে নৈন বিসাল।
অধর সুধা রস মুরলী রাজিত, উর বৈজংতী মাল ॥
ছুদ্র ঘংটিকা কটি কটি সোভিত, নূপুর সব্দ রসাল।
মীরা প্রভু সংতন সুখদাঈ, ভক্ত বছল গোপাল ॥

—নন্দলাল, আমার নয়নে এসে বাস কর। তোমার বিশাল নেত্র ও শ্যামসুন্দর মূর্তি কি সুন্দর! তোমার অধরে সুধা ও মুরলী, গলায় বৈজয়ন্তী মালা, কটিতটে ছোট ছোট ঘণ্টিকা শোভা পাচ্ছে; তোমার চরণের নূপুর-নিক্কণ বড়োই মধুর। মীরার প্রভু ভক্তবৎসল গোপাল, সাধুদের সুখদায়ক।

* * *

॥ ২৭ ॥

স্যাম মো সূঁ এঁডো ডোলে হো।
ঔরন সূঁ খেলে ধমার, ম্হা সূঁ মুখ হূঁ ন বোলে হো ॥
ম্হারী গলিয়াঁ না ফিরে, বা কে আঁগণ ডোলে হো।
ম্হারী অংগুলী না ছুবে, বা কী বহিয়াঁ মোরে হো ॥
ম্হারে অঁচরা না ছুবে, বা কো ঘূঁঘট খোলে হো।
মীরা কে প্রভু সাবরো, রংগ-রসিয়া ডোলে হো ॥

—শ্যাম আমাকে ছেড়ে অন্যস্থানে গিয়ে বিহার করছেন! ধামার তালে অপরের সঙ্গে নেচে নেচে খেলা করেন, আর আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেন না! আমার পথে পর্যন্ত আসেন না, আর ওদের প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়ান। আমার আঙুল পর্যন্ত ছোঁন না, আর ওদের হাত ধরে বেড়ান! আমার আঁচল পর্যন্ত স্পর্শ করেন না, আর ওদের ঘোমটা খুলে আদর করেন। হায়, মীরার প্রভু শ্যাম রঙ্গরসে মত্ত হয়ে অন্যত্র বিহার করছেন।

* * *

॥ ২৮ ॥

জাবাদে রী জাবাদে জোগী কিসকা মীত ॥
সদা উদাসী মোরী সজনী, নিপট অটপটী রীত।
বোলত বচন মধুর সে মীঠে, জোরত নাহী প্রীত ॥
হূঁ জাণূ যা পাব নিভেগী, ছোড় চলা অধ বীচ।
মীরা কহে প্রভু গিরিধর নাগর, প্রেম পিয়ারা মীত ॥

—সখি, ওকে যেতে দাও, যেতে দাও। যোগী কোনকালে কার মিত্র হয়ে থাকে! সজনি, ওরা সদাই উদাসীন, ওদের স্বভাব আগাগোড়াই এলোমেলো। ওরা মধুর চেয়ে মিষ্টি কথা বলে কিন্তু কখনও কারো প্রেমে আবদ্ধ হয় না। আমি জানতাম আমার সঙ্গে সে শেষ পর্যন্ত এক ভাবেই কাটাবে, কিন্তু মাঝপথে সে আমায় ছেড়ে গেল। মীরা বলছে, একমাত্র গিরিধারী-নাগরই আমার প্রেমিক, প্রিয় বন্ধু।

* * *

॥ ২৯ ॥

রাণাজী মৈঁ গিরিধর রে ঘর জাউঁ।
গিরিধর ম্হারো সাচো প্রীতম, দেখত রূপ লুভাউঁ ॥
রৈন পড়ে তব হী উঠ জাউঁ, ভোর ভয়ে উঠ আউঁ।
রৈন দিনা বা কে সংগ খেলূঁ, জ্যোঁ রীঝে জ্যোঁ বিঝাউঁ।
জো বস্ত্র পহিবারে সোঈ পহিরূঁ, জো দে সোঈ খাউঁ।
মেরে উনকে প্রীত পুরাণী, উন বিন পল ন রহাউঁ ॥
জহঁ বৈঠারে জিত হী বৈঠূঁ, বেচে তৌবিক জাউঁ।
জন মীরা গিরিধর কে উপর, বার বার বল জাউঁ ॥

—রানা আমি গিরিধারীর ঘরে যাব। গিরিধারীই আমার প্রকৃত প্রিয়, তাঁর রূপ আমার মনলোভা। রাত এলেই আমি চলে যাব, সকাল হলেই উঠে আসব। দিনরাত তার সঙ্গেই খেলা করব। সে যাতে প্রীত হয় আমি তা করব; যে কাপড় পরাবে তাই পরব, যা দেয় তাই খাব। আমার সঙ্গে তার পুরানো দিনের প্রীতি, তাকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্তও থাকতে পারব না। আমাকে সে যেখানে বসাবে, সেখানেই বসব, যদি আমায় বিক্রি করে, বিক্রীত হব। মীরার প্রাণ এখন গিরিধারীর উপরেই। তাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ।

* * *

সদ্‌গুরুর অনুগ্রহে সাধন ভজন করে মীরা ত্রিতাপ-জ্বালা থেকে অব্যাহতি লাভ করেছিলেন এবং চরম আত্মজ্ঞান লাভ করে বলেছিলেন—ভবব্যাধির চিকিৎসার নিমিত্ত সদ্‌গুরুর তুল্য আর বৈদ্য নেই, আমি সেই গুরুর আশ্রয়েই থাকব।

মীরার পদাবলী 'চেতাবনী কা অংগ,' 'উপদেশ কা অংগ', 'বিরহ ঔর প্রেম কা অংগ' এবং 'বিনতী ঔর প্রার্থনা কা অংগ'—মূলত এই চারি অংগ বা ভাগে বিভক্ত। এছাড়া 'মীরা ঔর কুটম্বিয়োঁ কী কহা সুনী' নামেও একটি ভাগ আছে। কোনো কোনো পদ কোন্ কোন্ রাগ-রাগিনীতে গীত হবে তার নির্দেশও দেওয়া আছে—যেমন রাগ সাবণ, সোরট প্রভৃতি। আবার কয়েকটি পদে তাঁর সাধন-প্রণালীর সংকেত পরিদৃষ্ট হয়। প্রতি অংগের বা ভাগের কিছু কিছু পদ এখানে সংকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগের হিন্দীভাষা আর আজকের হিন্দী ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্য। তাছাড়া মীরার রচিত পদগুলিতে গুজরাতি, মাড়োয়ারি, সিন্ধী প্রভৃতি ভাষার শব্দাবলীর যথেচ্ছ প্রয়োগও পরিলক্ষিত হয়।

পদগুলি পড়ার সময় মনে রাখতে হবে যে বাংলা ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে হিন্দুস্থানী উচ্চারণের অনেক ভেদ আছে। হিন্দী ভাষায় 'স' এর উচ্চারণ হবে 'S' এর মতো। হিন্দী 'স্যাম' শব্দের উচ্চারণ হবে 'Syam'। 'য'-এর উচ্চারণ 'য়' এর মতো। হিন্দী ভাষায় 'য' ও 'য়' পৃথক বর্ণ নেই, তাই তাদের স্থানে 'জ' ও 'য' ব্যবহৃত হয়। যেমন, বাংলায় আমরা লিখি 'যম', হিন্দীতে লিখতে হবে 'জম'। হিন্দীতে লেখা য' কে 'য়'-এর মতো পড়তে হয়। যেমন 'যহ' লেখা থাকলে 'য়হ' পড়তে হবে। বর্গীয় 'ব' ও অন্তস্থ 'ব' পৃথক ও তাদের উচ্চারণের পার্থক্য আছে; কিন্তু আমরা সাধারণতঃ উভয় 'ব'-কেই একভাবেই উচ্চারণ করি। 'য' ফলাকে 'ইয়' ভাবে পড়তে হবে। যেমন 'কু্যঁ' শব্দকে, 'কিয়ু' উচ্চারণ করতে হবে। 'হৈ' শব্দকে অনেকটা 'হ্যায়' এর মতো উচ্চারণ করতে হবে। 'ম্হাকো', 'ম্হারে' প্রভৃতি শব্দকে 'হাম্‌কো', 'হামারে' প্রভৃতি ভাবে, 'কহা' শব্দকে 'কিয়া' বা 'কেয়া ভাবে উচ্চারণ করতে হবে। 'হ্য' এর উচ্চারণ 'হিয়' এর মতো হবে যেমন 'রহ্যো' শব্দের উচ্চারণ হবে 'রহিয়ো'। 'ণ'-কে 'ড়'-এর মতো ও 'ষ' কে 'খ'-এর মতো উচ্চারণ করা উচিত।

পদগুলির বিভিন্ন ছন্দ আছে। ছন্দ অনুসারে পড়তে না পারলে, ছন্দোভঙ্গ হবে; পদগুলি মিষ্টি লাগবে না। 'ি' 'ী', 'ু', 'ূ', 'ই', 'ঈ', 'উ', 'ঊ' প্রভৃতিকে হ্রস্ব ও দীর্ঘ করে উচ্চারণ করলেই অনেকটা ছন্দ অনুসারে পড়া হবে।

২৩. হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সাধক ও সাধিকা ("৫৪ জন সাধকের জীবনের বিচিত্র অলৌকিক কাহিনী")—ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য—৪৫ টাকা

২৪. 'চাণক্য শ্লোক' সহ ৭০০ প্রবাদ ও খনার বচন ঃ কবিরের দোহাঁ ঃ মীরার পদাবলী—৪০ টাকা

২৫. শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কাহিনী অলংকরণ ঃ পূর্ণেন্দু পাত্রী—২২ টাকা

২৬. হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী—৪৪ টাকা

২৭. কুইজ কনটেস্ট—৩২ টাকা
(কুইজ ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের জন্য)

২৮. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রূপকথা—৪০ টাকা

২৯. এশিয়ার রূপকথা—১৮ টাকা

৩০. ইউরোপের রূপকথা—১৮ টাকা

৩১. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্প—৫০ টাকা

৩২. সান্ত্বনার শত রান্না—সান্ত্বনা পাণ্ডে (রায়)—১৫ টাকা

৩৩. অঙ্কের ম্যাজিক ম্যাজিকের অঙ্ক
—সত্যরঞ্জন পান্ডা, এম. এস. সি.—১০ টাকা

৩৪. চিরকালীন উপকথা—২০ টাকা
—উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

৩৫. যাঁদের ভুলি নাই—তুষারকান্তি পাণ্ডে—২০ টাকা

৩৬. Word Book (তিনটি ভাষায়)—১৮ টাকা

প্রাপ্তমনস্ক ও বয়স্কদের জন্য গ্রন্থসম্ভার

৩৭. এ সার্টেন স্মাইল—অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়
—ফ্রাঁসোয়াজ সাঁগো—১৬ টাকা

৩৮. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আদিরসের গল্প—৪৬ টাকা

৩৯. বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প—৪৬ টাকা

৪০. সংস্কৃত আদিরসের কাহিনী—৪৬ টাকা

৪১. পৃথিবীর সেরা শৃঙ্গার কাহিনী—৪৬ টাকা

৪২. শ্লীল-অশ্লীল (বৃহদায়তন)—১০০ টাকা